ভারতবর্ষের ইতিহাস

রোমিলা থাপার

ভারতবর্ষের ইতিহাস

১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ

রোমিলা থাপার



ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস

হিমায়েতনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাংগালোর ৫৬০ ০০১
হিমায়েতনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
জামাল রোড, পাটনা ৮০০ ০০১
এস, সি, গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬ ০০১

বঙ্গানুবাদ : কৃষ্ণা গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক :

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর :

হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

সের্গেই-কে

স্বীকৃতি

উদ্‌ধৃতি মুদ্রণের অনুমতির জন্য আমি নিম্নলিখিতদের কাছে কৃতজ্ঞ :

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অনুমতি দিয়েছেন 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা', 'সাউথ ইণ্ডিয়ান ইনসক্রিপশনস' এবং 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া রিপোর্ট' থেকে অংশ উদ্‌ধৃত করবার জন্য। কিতাব মহল (হোলসেল ডিভিশন) প্রাইভেট লিমিটেড অনুমতি দিয়েছেন এলিয়ট ও ডাউসনের 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স্ ওন হিস্টোরিয়ানস' থেকে উদ্‌ধৃতি ব্যবহারের জন্য। অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন অনুমতি দিয়েছেন সিউএল-লিখিত 'এ ফরগট্‌ন এমপায়ার' নামক গ্রন্থ থেকে অংশ উদ্‌ধৃত করবার জন্য।

সূচীপত্র

মানচিত্র

রেখাচিত্র

মুখবন্ধ

ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের জন্য এ বই নয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁদের সাধারণ আগ্রহ ও কৌতূহল আছে, এবং যাঁরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক, এই বই তাঁদের জন্যই।

প্রথম খণ্ডে ভারতের ইতিহাস শুরু হচ্ছে ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan) সভ্যতার বিবরণ দিয়ে। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক কাল এবং আদিযুগের ইতিহাস নিয়ে এর আগেই একটি মূল্যবান বই পেলিকান সিরিজে বেরিয়ে গেছে—স্টুয়ার্ট পিগটের 'প্রি-হিস্টরিক ইণ্ডিয়া'। সুতরাং একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমান খণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত এই উপ-মহাদেশের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। তাই ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দকেই শেষ সীমা ধরা হল। অবশ্য উপমহাদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই তারিখটিকে সীমা ধরা হয়তো যথার্থ হবে না, কারণ তার পূর্ববর্তী যুগের ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগ অব্যাহতভাবে এগিয়ে গেছে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও। কিন্তু ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-ভারতে মুঘলদের আগমনের সূচনা এবং তারা (অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে) ভারতে ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ধারণে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

যাঁরা এই বইএর পাণ্ডুলিপি পড়ার কষ্ট স্বীকার করে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশাম, শ্রী এ. ঘোষ, শ্রী এস. মাহ্‌দি ও আমার পিতৃদেবকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। মানচিত্র-গুলির জন্য আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াকেও আমার ধন্যবাদ।

রোমিলা থাপার

১

প্রাক্-পরিচয়

অনেকদিন পর্যন্ত ইয়োরোপীয়দের কাছে ভারতবর্ষ মহারাজা, সাপুড়ে আর দড়ির খেলার দেশ বলে পরিচিত ছিল। ভারতীয় বিষয়মাত্রই তাদের কাছে রোমান্টিক ও মোহময় মনে হতো। কিন্তু সম্প্রতি দু-তিন দশক ধরে ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে মহারাজা, সাপুড়ে ও দড়ির খেলার কুহকী অস্পষ্টতা পিছনে ফেলে ভারত এক জীবন্ত স্পন্দিত ভূখণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করেছে। মহারাজারা আজ দ্রুত অবলুপ্তির পথে। দড়ির খেলা অলীক মায়া ছাড়া কিছু নয়। রয়ে গেছে শুধু সাপুড়েরাই— একদল অপুষ্ট, দুঃস্থ লোক যারা পেটের দায়ে সাপ ধরে তাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলে, আর দুটো পয়সার লোভে বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলায় যাতে কোনোরকমে নিজের, পরিবারের এবং সাপের ভরণপোষণ হয়।

ইয়োরোপের কল্পনায় ভারত চিরদিন ছিল এক অত্যাশ্চর্য দেশ যেখানে অজানা ধনসম্পদ, অলৌকিক ঘটনাবলী আর বহু জ্ঞানীলোকেদের সমাবেশ। যেখানে নাকি পিঁপড়েরা মাটি থেকে সোনা খুঁড়ে বার করে, নগ্ন দার্শনিকরা বনে জঙ্গলে বাস করেন। প্রাচীন গ্রীকদের ভারত সম্বন্ধে ধারণা থেকেই এইসব উদ্ভট কল্পনার উৎপত্তি— যা বহু শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এই ধারণা ভেঙে না দেওয়ার বদান্যতা দেখাতে যাওয়া মানে কতকগুলি অবাস্তব কিংবদন্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে জিইয়ে রাখা।

অন্য যে-কোনো প্রাচীন সভ্যতার মতোই ভারতেও ধনসম্পদ অল্প কিছু লোকের কাছে সীমাবদ্ধ ছিল। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপেও আগ্রহ ছিল সামান্য লোকেরই, যদিও এসবে আস্থা ছিল অধিকাংশ মানুষের। অন্য সভ্যতা হলে হয়তো দড়ির ম্যাজিককে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ বলে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হতো, কিন্তু ভারতে কৌতূহল ও উদার কৌতুকের মনোভাব নিয়ে তাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিগত স্থৈর্যের মূলে রয়েছে শয়তান-সম্পর্কিত ধারণার অনুপস্থিতি।

বহু শতাব্দী ধরেই ভারত বলতে বৈভব, যাদুবিদ্যা, আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে ছবি তৈরি হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তার পরিবর্তন শুরু হল। তখন ইয়োরোপ আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে আর ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি-আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ অনাগ্রহে পর্যবসিত হয়েছে। নতুন ইয়োরোপ যেসব গুণকে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করতে শিখল, তারা দেখল ভারতের কাছে তার কোনোটাই নেই। ভারতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তাকে বাহ্যত বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। ভারতীয় সভ্যতাকে বদ্ধ ও নিশ্চল বলে অভিহিত করে অত্যন্ত অবজ্ঞা করা হল। যা-কিছুই ভারতীয়, সে সম্পর্কে মেকলের যে তাচ্ছিল্য, তা থেকে এই

মনোভাবকে বোঝা যায়। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে কেবল মহারাজা আর সুলতানদের শাসন ধরে নিয়ে তাকে প্রজাতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচার বলে অগ্রাহ্য করা হল। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে এ হল প্রায় ভয়ংকরতম পাপ।

এ সত্ত্বেও অল্প কিছু কিছু ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের মধ্যে এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন দর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁরা ভারতকে আবিষ্কার করলেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির অনাধুনিকতা ও উপযোগবাদের বিরোধী দিনগুলিকে বেশি করে জোর দিলেন এবং ভারতে ধর্মের তিনহাজার বছরের ধারাবাহিকতার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। তাঁদের ধারণা হল যে ভারতীয় জীবনযাত্রা অধ্যাত্মবাদ ও দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব দিয়ে এত বেশি প্রভাবিত যে দৈনন্দিন পার্থিব খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার এতে কোনো অবকাশ নেই। জার্মান রোমান্টিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে প্রবল সমর্থক। কিন্তু মেকলের তাচ্ছিল্যসূচক মনোভাব ভারতের যা ক্ষতি করে, এই প্রবল সমর্থন তার চেয়ে কিছু কম ক্ষতিকর নয়। অনেক ইয়োরোপীয়ের কাছে ভারত হয়ে উঠল এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় দেশ যেখানকার অতি সাধারণ কাজকর্মকেও তাঁরা প্রতীকের আবরণে মুড়ে দেখতে লাগলেন। তথাকথিত আধ্যাত্মিক প্রাচ্যজগৎ সম্বন্ধে ধারণার শুরু এখানেই, এবং যেসব ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবী নিজেদের জীবন-রীতি থেকে পলায়নের পথ খুঁজছিলেন ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের মানসিক আশ্রয়স্থল। মূল্যবোধের দুটি ভাগ তৈরি হল— ভারতীয় মূল্যবোধকে বলা হল 'দার্শনিক' আর ইয়োরোপীয় মূল্যবোধকে অভিহিত করা হল 'জাগতিক' বলে। অথচ ভারতীয় সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব তথাকথিত দার্শনিক মূল্যবোধগুলিকে মিলিয়ে নেবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই হল না (হলে বোধ হয় তার ফল কিছুটা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াত)। গত একশো বছরে একশ্রেণীর ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রাও এই ধারণাকেই লালন করেছেন এবং ব্রিটিশ কারিগরি উৎকর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষমতার জন্য ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটাই হল সান্ত্বনা।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের আবিষ্কার আর ইয়োরোপের কাছে সেই আবিষ্কারের পরিচিতির কৃতিত্ব হল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে যেসব জেসুইটরা ছিলেন, তাঁদের আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্‌স ও চার্লস উইলকিন্‌স। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী লোকদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারততত্ত্ববিদ্যার ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও অন্যান্য আরো কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা হল। বহু ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ভারততত্ত্ববিদ্যায় আগ্রহ দেখালেন, আর এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— এফ্‌. ম্যাক্সমুলার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ এবং প্রধানত এঁদের মধ্য থেকেই এসেছিলেন ভারত-ইতিহাসের প্রথম অ-ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা। সুতরাং প্রথমদিকের এইসব ইতিহাসকে বলা যায় 'শাসকদের ইতিহাস'। রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণই ছিল

এইসব ইতিহাসের মূল বিষয়। রাজারাই ছিলেন ভারত-ইতিহাসের প্রধান নায়ক, আর তাঁদের ঘিরেই বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণ। অশোক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা আকবরের মতো রাজাদের বাদ দিলে আর-সব ভারতীয় রাজারা একটা গতানুগতিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে গেলেন— তাঁরা স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও প্রজা-কল্যাণে উদাসীন। মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেল যে, শাসনের ব্যাপারে এই উপমহাদেশের যে-কোনো রাজার চেয়ে ব্রিটিশদের শাসন অনেক উঁচুদরের।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যেসব ভারতীয় ঐতিহাসিক ছিলেন তাঁদের ওপর ভারত-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যার প্রভাব পড়ে। তাঁদের লেখা প্রামাণ্য ইতিহাসগুলির মূল বিষয় হল রাজবংশের ইতিহাস ও রাজাদের বিবরণ। কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশটির একটি অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিকই হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন বা ঐ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন, প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে স্বর্ণযুগ ছিল এবং প্রাচীনকালেই ছিল ভারত-ইতিহাসের প্রকৃত গৌরবময় অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতীয় জনগণের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবেই এই অভিমতকে দেখতে হবে।

এরই সঙ্গে আর একটি আপত্তিকর ব্যাপারেরও প্রভাব পড়েছিল প্রাচীন ভারতের প্রথম ইতিহাস রচনার ওপর। যেসব ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক এ সময়কার ইতিহাস লিখছিলেন, তাঁরা সকলেই গড়ে উঠেছিলেন ইয়োরোপের প্রাচীন আদর্শে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাই হল মানুষের মহত্তম কীর্তি। অতএব যে-কোনো নতুন আবিষ্কৃত সভ্যতাকেই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করা হতো এবং তুলনায় হীনতর মনে করা হতো। যদি বা সেসব সভ্যতার কোনো বৈশিষ্ট্যকে আলাদাভাবে প্রশংসার যোগ্য বলে মনে হতো তবে চেষ্টা করা হতো যদি কোনোমতে তাকেও গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করা যায়। ভিনসেণ্ট স্মিথ, যাঁকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বলে বহুদিন ধরে গণ্য করা হয়েছে, তিনিও এই দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। এক জায়গায় তিনি অজন্তার একটি বিখ্যাত বৌদ্ধকেন্দ্রের রঙিন দেওয়াল-চিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যের এক সাসানিয়ান রাজদূতের আগমনই ঐ ছবির বিষয়। শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক কোনো কারণেই এর সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক ছিল না। তাও তিনি লিখলেন :

> ছবিটি ভারত ও পারস্যের মধ্যে এক অসাধারণ রাজনৈতিক সম্পর্কের দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য— কিন্তু এছাড়াও এর গুরুত্ব হল শিল্প-ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট দিক্‌দর্শকরূপে। অজন্তার কয়েকটি প্রধান গুহাচিত্রের অঙ্কনকাল নির্ধারণে এই চিত্রটি সাহায্য করেছে এবং এই নির্ধারিত মান অনুযায়ী অন্যান্য ছবির কাল নিরূপণ করাও সম্ভব হয়েছে। এই ছবিটি থেকে আর একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়— অজন্তা অঙ্কনশৈলী প্রথমত পারস্য থেকে এবং মূলত গ্রীস থেকেই আহরিত।[১]

স্বভাবতই ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা এরকম বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন। প্রমাণ করার চেষ্টা চলল যে ভারত গ্রীস থেকে সংস্কৃতির কোনো অংশ গ্রহণ করেনি। অথবা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও গ্রীক সংস্কৃতির সমান্তরাল অস্তিত্ব ছিল, ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই গ্রীক সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক সভ্যতাই যে তার নিজস্ব বিস্ময়, একথা তখনো পর্যন্ত ইয়োরোপীয় বা ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করতেন্ না। কোনো সভ্যতাকে তার নিজের গুণানুসারেই বিচার করার ধারা শুরু হয়েছিল আরো অনেক পরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন প্রথম ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের সম্পর্কে এলেন ও তার অতীত সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, তাঁদের তথ্য সংগ্রহের সূত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। কেননা, এঁরাই ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃতাশ্রয়ী ঐতিহ্যের একমাত্র স্বীকৃত অভিভাবক। তাঁদের মতে এই ঐতিহ্য সংরক্ষিত ছিল সংস্কৃত আকর গ্রন্থগুলির মধ্যে এবং এগুলিতে ব্যুৎপত্তি ছিল কেবল তাঁদেরই। অতএব কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ বিভিন্ন পুঁথিপত্র বা সূত্র থেকেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা হল। প্রাচীন বইপত্রের অনেকগুলিই মূলত ধর্মগ্রন্থ এবং স্বভাবতই ধর্মীয় উদ্দেশ্য অতীতের বিবরণকে প্রভাবিত করে। এমনকি অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রচনা, যেমন আইন-সম্বন্ধীয় বই 'ধর্মশাস্ত্র'— তারও রচয়িতা ছিলেন ব্রাহ্মণরাই। সুতরাং রচয়িতাদের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা ছিল সমাজে উচ্চপদস্থদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের উপর ততটা দৃষ্টি না দিয়ে এইসব গ্রন্থে অতীতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল শুধু ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেমন, জাতিভেদ প্রথাকে বর্ণনা করা হয়েছে সমাজের দৃঢ় স্তরবিন্যাস হিসেবে। বলা হয়েছে, এই প্রথা একেবারে প্রাচীনকালেই শুরু হয়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা পালনের মধ্যে নানারকম অদল-বদল ঘটে। কিন্তু প্রাচীন আইনগ্রন্থ রচয়িতারা এসব কথা স্বীকার করতে চাননি।

পরবর্তী যুগে ইতিহাস রচনার সময়কালে আরো নানা জায়গা থেকে পাওয়া বিভিন্ন রকম তথ্য ব্যবহারের সুযোগ থাকায় অতীতের আরো যথাযথ বর্ণনা সম্ভব হয়েছে। এতে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের রচিত তথ্যের কয়েকটি বিষয়ের যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়েছে, তেমনি অন্যান্য বিষয়গুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করারও সুযোগ মিলেছে। শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্যের ওপর এবার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল। বিদেশী পর্যটকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন গ্রীক, ল্যাটিন, চীনা ও আরবী ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিবরণে। খনন-কার্যের ফলে অতীতের অনেক ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কার শুরু হল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত তথ্যসম্ভার বেড়ে গেল সিংহল ও চীনে পালি অনুশাসনের আবিষ্কারের ফলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে আরবী ও ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যকে এবার উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হল। আগে কিন্তু এগুলিকে পশ্চিম-এশিয়ার ইস্লামিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই গণ্য করা হতো।

প্রথম দিককার ইতিহাস রচনায় যে কেবল রাজবংশের ইতিহাসের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হতো, তার মূলে ছিল একটি ধারণা — প্রাচ্যের দেশগুলিতে দৈনন্দিন শাসনের কাজেও রাজার ক্ষমতাই ছিল সর্বোচ্চ। অথচ আসলে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দৈনন্দিন কাজকর্মের ভার প্রায় কখনোই কেন্দ্রীভূত ছিল না। একান্তই যা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য, সেই জাতিভেদ প্রথা রাজনৈতিক ও পেশাগত কাজকর্মেরও অঙ্গীভূত ছিল। তার ফলে যে-সমস্ত কাজকর্ম 'প্রাচ্যদেশীয় স্বেচ্ছাচার'-এর পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারত, তা কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতার গতিপ্রকৃতির হদিশ পেতে গেলে কেবল রাজবংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে চলবে না। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমবায় সঙ্ঘ ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণও প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব অল্পদিন হল এই গবেষণার প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে এখনো দু-এক দশকের গভীর অনুসন্ধান দরকার। আপাতত রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎপাদনের উৎসগুলি সম্পর্কে কেবল ইঙ্গিত দেওয়াই সম্ভব।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার আর একটি কারণ হল একটি ধারণা যে, প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কখনো বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভারতীয় সংস্কৃতি বহু শতাব্দী ধরেই অপরিবর্তিত ও জড়বৎ, এই বিশ্বাসও জন্ম নেয় এই ধারণা থেকে; এদেশের সংস্কৃতি স্থাণু, কারণ ভারতীয়রা জাড্যগ্রস্ত এবং ভারতীয়দের জীবনদর্শন বিষাদাচ্ছন্ন ও অদৃষ্টবাদী। সন্দেহ নেই, এ সবই অতিশয়োক্তি। জাতিভেদ প্রথা, ভূমিব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের সামান্য বিশ্লেষণ করলে এ প্রমাণ হয়ে যেত যে, ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠন, আর যাই হোক, মোটেই স্থিতিশীল ছিল না। যদিও একথা সত্য যে কিছু কিছু স্তরে তিন হাজার বছর ধরে একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বয়ে এসেছে, কিন্তু তাকে নিশ্চল বা স্রোতহীন ভাবলে ভুল হবে। হিন্দুরা গায়ত্রীমন্ত্র* জপ করে আসছে তিন হাজার বছর ধরে। কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণের প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি মোটেই অপরিবর্তিত থাকেনি। আশ্চর্য লাগে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যেমন সেখানকার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারা আবিষ্কারের ওপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হয়েছিল, এশিয়ার ইতিহাস অনুসন্ধানের সময় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। ভারতীয় ইতিহাস যেন বিভিন্ন রাজবংশের নামাঙ্কিত কয়েকটি সময়চিহ্নের সমষ্টিমাত্র। ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও তাঁদের রচনায় একই পদ্ধতির অনুসারী হলেন। অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে অন্য সমস্ত বিষয়ই উপেক্ষিত হয়েছিল। ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের উপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক রচনায় এই সমস্ত তথ্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে।

* ঋগ্বেদের এই স্তোত্র রচিত হয়েছিল সূর্যদেবতা সবিতৃকে নিবেদন করে। হিন্দুশাস্ত্রে এটি হল সবচেয়ে পবিত্র স্তোত্র।

রাজবংশের বিবরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় ভারতীয় ইতিহাসকে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে— প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগ শুরু হয়েছে আর্য সভ্যতার আগমনের সঙ্গে (পরবর্তী কালের রচনা অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার বিবরণ থেকে শুরু)। এই যুগের শেষ হয়েছে ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারতে তুর্কী আক্রমণের সময়। এখান থেকে শুরু মধ্যযুগ, আর তা গিয়ে শেষ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশদের আগমনের সময়। যুগ-বিভাগের এই রীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আবার একটা ভ্রান্ত সমীকরণ সৃষ্টি করা হয় যাতে প্রাচীন যুগকে হিন্দু ও মধ্যযুগকে মুসলমান বলে চিহ্নিত করা হল, কেননা প্রাচীন যুগে অধিকাংশই ছিল হিন্দু রাজবংশ, আর পরের যুগের বেশির ভাগই মুসলমান রাজবংশ। দুই যুগকে আলাদা করে দেখানোর জন্যে মুসলিম সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-গুলিকে প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলে জোর করে দেখানো হল। এই বিভেদের যুক্তি হিসেবে ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের রচনা ও মুসলিম রাজাদের সভাসদদের রচিত ধারা-বিবরণীর উল্লেখ করা হল।

বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় এবং অভারতীয় ঐতিহাসিকেরা উভয়েই এই হিন্দু ও মুসলমান যুগবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিভাগ শুধু যে ভ্রান্ত তাই নয়, এর ভিত্তি সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। দুই যুগের এরকম নামকরণ থেকে যেমন মনে হয়, ভারতবর্ষে ধর্ম কখনোই ঐতি-হাসিক পরিবর্তনের তেমন প্রধান কারণ ছিল না, ধর্ম ছিল নানা কারণের একটি মাত্র। ইদানীংকালে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে অন্যভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা হয়েছে যাতে বিভাগের ভিত্তি আগের মতো অযৌক্তিক না হয়। (বিভ্রান্তি এড়াবার জন্যে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যুগবিভাগের নামকরণ পরিহার করা হয়েছে।)

উপমহাদেশের ভৌগোলিক গঠনের প্রভাবও ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চার উপর খানিকটা পড়েছে। উত্তর ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে সহজেই বড় বড় রাজ্য-স্থাপনা সম্ভব হয়েছে। উপমহাদেশের দক্ষিণাংশের উপদ্বীপ অঞ্চলটি পাহাড়, মালভূমি আর নদী উপত্যকায় খণ্ড-বিখণ্ডিত। এই বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক গঠনের জন্যে উত্তরের সকল অঞ্চলের তুলনায় এখানে রাজনৈতিক একতা কিছুটা কম। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উত্তরের অপেক্ষাকৃত বড় বড় রাজ্যগুলি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইতিহাসের যে সময়ে বড় বড় রাজ্য ছিল, সে সময়কে বলা হয়েছে 'স্বর্ণযুগ', আর যে সময়ে ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যের ছড়াছড়ি, ঐতিহাসিক সে সময়কে বলেছেন 'অন্ধকার যুগ'। উপদ্বীপ অঞ্চলের ইতিহাসের দিকে ঐতিহাসিকরা নজর দিয়েছেন কেবল বড় আয়তনের সাম্রাজ্যের সময়টুকুতেই। অমনোযোগের আর একটি কারণ হল, উত্তরাঞ্চল ও উপদ্বীপ অঞ্চলের রাজনৈতিক কৌশল ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই ধরনের ছিল না। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলির শক্তির পরিচয় ছিল রাজ্যের সীমানা বিস্তারের মধ্যে। রাজস্ব আদায় হতো কেবল স্থলভূমি থেকেই। যে-কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই

এগুলো সহজবোধ্য ব্যাপার। অপরদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির গঠনের ব্যাপারে তাদের নৌশক্তির হিসেব নেওয়াও প্রয়োজন। তার ওপর ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের হিসেব-নিকেশ পুরো ব্যাপারটা উত্তরাঞ্চলের তুলনায় বেশ জটিল।

ইতিহাস রচনার পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আগেকার ঐতিহাসিকদের রচনার কোনো মূল্যই নেই। তাছাড়া এখানে তাঁদের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কটাক্ষপাতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির যে অসম্পূর্ণতা, তা অনেক সময়ই তাঁদের যুগেরই অসম্পূর্ণতা। কেননা, যে-কোনো ঐতিহাসিকই কিছুটা নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর নিজের যুগের প্রতিনিধি। তাঁদের রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁরা ভারত-ইতিহাসের একটা ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছেন। তার সঙ্গে পাওয়া গেছে একটা নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক ধারা-বিবরণী। এর ওপর ভিত্তি করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনা হলে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ ও বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়ে উঠবে।

অতীতে ভারতবিদ্ ঐতিহাসিকদের মুলত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ হিসেবে গণ্য করা হতো। তখনকার দিনে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা এশিয়া মহাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতেন। আর অন্তত সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে তাঁদের লেখা সুদূরের রহস্যে আবৃত। ইয়োরোপে ও ভারতে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কিত উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যানধারণা এখন পাল্টে গেছে। বর্তমান জগতে ইতিহাসকে প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চা হিসেবে না ধরে সামাজিক বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এই নতুন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভারতের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যেসব নতুন নতুন প্রশ্ন উঠছে তা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের মনে আসেনি। পার্থক্যটা হল প্রধানত ঐতিহাসিক গুরুত্বের। রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাজবংশগুলির পর্যালোচনা এখনো ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। তবে এর সঙ্গে এখন মিলিয়ে দেখা হচ্ছে আরো অন্যান্য বিষয় যা একটি জাতি ও তার সংস্কৃতি গঠনের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব-পূর্ণ। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আবার এ দুটির প্রভাব পড়েছে সামাজিক সম্পর্কের ওপর। কোনো ধর্মীয় আন্দোলনে যদি অনেক লোক অংশগ্রহণ করে, তাহলে আন্দোলনের আকর্ষণের সঙ্গে এইসব মানুষদের কোথাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা নতুন ভাষা ও সাহিত্য তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন তা সমাজের মানুষের কোনো গভীর প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, কারণ সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারত-ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক নায়ক-দের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা বিশ্লেষণ করলেই ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব শেষ হবে না—জানা দরকার এত শতাব্দী ধরে কেন ভারতের মানুষ তাঁদের ভাবনাচিন্তাকে গ্রহণ, বর্জন বা পরিমার্জন করে এসেছেন।

এই বইতে এসব প্রশ্নগুলিকে উত্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনে যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক

প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে এবং যেসব ঘটনা এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে চিহ্নিত করে দেখানো। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা বা নিশ্চিতভাবে এর গুণাগুণ নিয়ে মন্তব্য করার ঝোঁককে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তেমন কোনো চেষ্টা করলে তা অর্থহীন মামুলি মন্তব্যে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এটি মূলত কোনো রাজনৈতিক ইতিহাস নয়। রাজবংশের কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে কেবল সময়ের হিসেব রাখার সুবিধের জন্যে। অর্থনৈতিক গঠন, পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব ও উন্নতি ইত্যাদি : কয়েকটি বিষয়ের ক্রমবিবর্তনের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি ছক ও বিন্যাস ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়েছে। এই বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই ছক ও বিন্যাসের বিবরণ এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য সাধ্যমতো বিশ্বাসযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে।

সম্প্রতি দুই কারণে প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো তথ্য-সমৃদ্ধ হয়েছে। এক, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজকে অধ্যয়নের নূতন পদ্ধতির উদ্ভব এবং দুই, প্রত্নবিদ্যালব্ধ প্রমাণ ও নিদর্শন ইতিহাস রচনায় বহুল-ভাবে ব্যবহার। প্রথম পদ্ধতিটির গুরুত্ব এই যে, ভারতের অতীত ইতিহাসকে বুঝতে পারার নতুন নতুন পথের সম্ভাবনা এ থেকে খুলে যাবে। তাছাড়া এভাবে যেমন নতুন প্রশ্ন উঠবে তার উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই ভারত-ইতিহাসের প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব হয়ে উঠবে। কয়েক ধরনের গবেষণার কাজে এই পদ্ধতির সার্থক ব্যবহার ইতিমধ্যেই হয়েছে। সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বিচার সম্বন্ধেও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এটি অবশ্য পুরনো অভ্যাসমতো কোনো একটি বিশেষ সংস্কৃতির মাপ-কাঠিতে অন্যান্যগুলির মান নির্ধারণের চেষ্টা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই ইয়োরোপীয় সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্ক ব্লকের (Marc Block) আলোচনা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বই হয়ে উঠতে পেরেছে।

জরীপ, নিরীক্ষণ ও খননের সাহায্যে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব উপাদান কেবল যে পুঁথিবদ্ধ সাক্ষ্যগুলিকেই সত্য বলে সমর্থন করেছে তা নয়, ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসের বহু ফাঁকও পূরণ করতে সাহায্য করেছে। ভারতের প্রাক্-ইতিহাস সম্পর্কে গত পনেরো বছরে যা তথ্য পাওয়া গেছে তা পরবর্তী যুগের সংস্কৃতির বিন্যাসের ভিত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক চিত্র সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা থাকলেও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বুঝতে সুবিধে হয়।

এখনো পর্যন্ত যা জানা গেছে, ভারতে মানুষের গতিবিধির সন্ধান মিলেছে খ্রীস্টপূর্ব চার লক্ষ থেকে দু'লক্ষ বছর আগে দ্বিতীয় হিমযুগের সময়ে। তখন প্রস্তর হাতিয়ারের ব্যবহার হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর দীর্ঘদিন ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পালা চলে। কিন্তু শেষদিকে বিবর্তনের গতি কিছুটা দ্রুত হয়ে চমকপ্রদ সিন্ধু-সভ্যতায় জন্ম হয়। ইদানীংকালে যাকে বলা হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা,

আনুমানিক সময় তখন ২৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে বালুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে—নাল সংস্কৃতি। এবং সিন্ধুনদের অববাহিকার পশ্চিমে মকরাণ উপকূলের কুল্লি সংস্কৃতি এর উদাহরণ। আর পাওয়া যাবে, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের নদীগুলির তীরে তীরে কয়েকটি গ্রাম্য গোষ্ঠীর মধ্যে।

পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সমভূমি, উত্তর রাজস্থান এবং পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। এটি অবশ্য একান্তভাবেই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা আর ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র ছিল মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা শহর দুটি।* দুই শহরের বিরাট ও সুনির্মিত শস্যভাণ্ডার দেখে মনে হয়, শহরগুলির খাদ্যের যোগান আসত দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে। অর্থাগমের আর একটি সূত্র ছিল উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে ফলাও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশ ও মেসোপটেমিয়ার লোকেদের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক যোগসূত্র।

শহরগুলিতে অত্যাধুনিক নগর-পরিকল্পনার নমুনা দেখা গেছে। প্রতি শহর বিভক্ত ছিল দুই অংশে— একটি সুরক্ষিত প্রাকারযুক্ত দুর্গের মতো অংশ যেখানে অবস্থিত ছিল নগরজীবন ও ধর্মীয় সংস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলি ; অন্য অংশে নাগরিকরা বাস করতেন।

হরপ্পা সভ্যতার নানা অবশিষ্টের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল শীলমোহরগুলি। ছোট, চ্যাপ্টা, চৌকো বা আয়তক্ষেত্রাকার এই শীলমোহরগুলির উপর মানুষ বা পশুর মূর্তি খোদাই করা আছে। তার সঙ্গে কিছু লেখা। এই লেখাগুলির পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। আশা হয়, পাঠোদ্ধার করা গেলে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। যে দুহাজার শীলমোহর পাওয়া গেছে, এগুলিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবহৃত নিজস্ব অভিজ্ঞান বা মুদ্রা বলে মনে করা হয়। অথবা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে যেসব শস্যসামগ্রী আনা হতো, তার সঙ্গেও হয়তো এদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।

হরপ্পা সভ্যতা ও পরবর্তী আর্য-সভ্যতার মধ্যে যে কোনো ধারাবাহিকতা থাকতে পারল না তার কারণ হল, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির লোকেদের সিন্ধু-উপত্যকায় আগমন। ১৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই হরপ্পা সভ্যতার দিন ফুরিয়ে এসেছিল। এরপরে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ ইরাণ থেকে ইন্দো-আর্যরা এসে পড়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতিতে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যের আমদানি করল। ভবিষ্যতেও উপমহাদেশের এই অঞ্চলটির সঙ্গে সিন্ধুনদী ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর ও পশ্চিম দিকের অংশের যোগাযোগ বজায় ছিল। এই ভূখণ্ডটি অনেক সময় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে

* ইদানীংকালের খননকার্যের ফলে আরো কয়েকটি শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন সিন্ধুতে কোট ডিজি, রাজস্থানে কালিবঙ্গান, পাঞ্জাবে রূপার এবং গুজরাতে একটি বন্দর লোথাল। কিন্তু আগেকার শহর দুটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

জড়িয়ে পড়ত এবং সেখানকার সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যেত। এইভাবেই পশ্চিম-ভারতের যোগাযোগ রইল পশ্চিমের সামুদ্রিক অঞ্চল, পারস্য উপসাগরীয় ও লোহিত সাগরীয় অঞ্চলগুলির সঙ্গে।. সিন্ধু উপত্যকা ও গাঙ্গেয় সমভূমির পরবর্তী ক্রমবিবর্তনের পার্থক্যের এই হল কারণ।

আরো পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় মানুষের ছোট ছোট বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মানুষেরা ছিল শিকার ও কৃষিকাজের মাঝামাঝি একটা স্তরে। পাথর ও তামার তৈরি নানা জিনিস আর গৈরিকবর্ণ নিম্নস্তরের মৃৎপাত্র এরা ব্যবহার করত। ইন্দো-আর্যেরা যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এসে পৌঁছল, তখন তারা সম্ভবত এই মানুষগুলিরই দেখা পেয়েছিল। কেননা, ধূসর রঙ করা যেসব মৃৎপাত্রের সঙ্গে ইন্দো-আর্যদের যোগ আছে বলে আজকাল অনুমান করা হয়, সেগুলি মাটির এমন সব স্তরে পাওয়া গেছে যার নীচের স্তরে কোথাও কোথাও আগেকার গৈরিক রঙের মৃৎপাত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্র খুঁজে পাওয়া গেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিম অংশে। মনে হয় এগুলির ব্যবহার ছিল ১১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। যেসব জায়গায় প্রাচীনতর নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার কোনো কোনো স্থানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে লোহা। ভারতের প্রথম লোহা ব্যবহারের সময়কে এতদিন মোটামুটি ৮০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ বলে ধরা হতো। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে কিন্তু সেই তারিখকে আরও প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে। ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্রের অঞ্চলগুলিতে কৃষিজীবী মানুষের বাস ছিল বলে মনে হয়। তারা গবাদি পশু ও ঘোড়া পালন করত। সাধারণভাবে তামার ব্যবহারও এরা জানত। হরপ্পা সভ্যতার অঞ্চলে ঘোড়ার কিন্তু একেবারেই কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই আবার বলা হয় ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্রের অঞ্চলগুলি সম্ভবত আর্য-সভ্যতারই অংশ। এই অঞ্চলগুলি থেকে এ যাবৎ যা- সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে বেদ ইত্যাদি গ্রন্থে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা বর্ণনা পাওয়া যায়, তার বেশ মিল লক্ষণীয়।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে ছোট ছোট চকমকি পাথরের তৈরি হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরে ব্রোঞ্জ যুগে তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের একত্র ব্যবহারেরও নিদর্শন আছে। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অপেক্ষাকৃত উচুমানের কারিগরিবিদ্যার কাছে এরা হার মানে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্রমশ লোহার ব্যবহার থেকে।

তাছাড়া উত্তরাঞ্চলের পালিশ করা কালো মৃৎপাত্রেরও ব্যবহার এখানে দেখা যায়। এ দুটি বস্তুই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর থেকে বোঝা যায়, আর্যরা ক্রমশ দক্ষিণদিকে এগিয়ে আসছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছিল। এরপর বহু শতাব্দী ধরে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধনের যে ভূমিকা দাক্ষিণাত্য নিয়েছিল, তারই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এই সময়। দাক্ষিণাত্যে কেবল যে উত্তরের আর্য-

সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল তাই নয়, ৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ডেকান মালভূমির দক্ষিণদিকের কয়েকটি জায়গার সঙ্গে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম অঞ্চলের প্রাচীন বৃহৎ প্রস্তরযুগীয় মেগালিথিক সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল।

দক্ষিণ ভারতের (মাদ্রাজ, কেরল ও মহীশূর) বৃহৎ প্রস্তরযুগীয় (মেগালিথিক) সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মেগালিথিক সভ্যতার রীতিমতো মিল পাওয়া গেছে। মনে হয়, পশ্চিম এশিয়া থেকেই দক্ষিণ ভারতে এই সভ্যতার আগমন ঘটেছিল। প্রাচীন যুগের এই যোগাযোগ বজায় ছিল প্রায় আধুনিক-কাল পর্যন্ত।

দক্ষিণ-ভারতীয় মেগালিথ বা সমাধি স্মৃতিসৌধগুলি ছিল পাহাড় থেকে কাটা পাথরের কবর অথবা গোলাকার ঘেরা জায়গার মধ্যে আয়তাকার প্রস্তরনির্মিত শবাধার। এইসব শবাধার কখনো কখনো মাটি দিয়েও তৈরি হতো। এর মধ্যে থাকত হাড়গোড় আর প্রধানুযায়ী কিছু জিনিসপত্র (যেমন একটি বিশেষ ধরনের লাল-কালো রঙের পাত্র)। এইসব স্মৃতিসৌধগুলি যেখানে পাওয়া গেছে, তার কাছাকাছি ছিল উর্বর ও পুকুরের জলে সেচ হওয়া জমি। ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী এই মেগালিথিক সভ্যতার পর থেকেই শুরু হয় দক্ষিণ-ভারতের ঐতিহাসিক যুগ।

এইসব বিভিন্ন সভ্যতার লোকদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক ধরনের ছিল না। জাতিবিদ্যাগত অনুসন্ধানে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান ছয়টি জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে প্রাচীন হল নেগ্রিটো। তারপর এল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড। এরপর মঙ্গোলয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান। এর পরবর্তীরা আর্য-সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হরপ্পা অঞ্চলে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মেডিটেরেনিয়ান, আলপাইন ও মঙ্গোলয়েড মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয়, এই সময়ে উল্লিখিত প্রথম পাঁচটি জাতি ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর লোকেদের। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত। এর উদাহরণ পাওয়া গেছে কয়েকটি আদিম উপজাতির মুণ্ডাভাষার মধ্যে। মেডিটেরেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির প্রধান যোগ ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে। মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোকের প্রধান বাসভূমি ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলগুলিতে। এদের ভাষার সঙ্গে চীন-তিব্বতীয় (Sinc-Tibetan) ভাষাগোষ্ঠীর সাদৃশ্য আছে। এদেশে সবচেয়ে শেষে যে জাতিগোষ্ঠীর আগমন, আমরা তাদের সাধারণভাবে আর্য বলে অভিহিত করি। প্রকৃতপক্ষে 'আর্য' শব্দটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম, এটি আদৌ কোনো জাতিগত বিভাগের নাম নয়। সুতরাং আর্যদের আগমনের উল্লেখ করাটা সেদিক থেকে ভ্রান্তিমূলক। অবশ্য এই ভুল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গবেষণার ব্যাপারে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে এখন আর্যদের 'আর্যভাষাভাষী জাতি' বলে অভিহিত করতে যাওয়াটা অকারণ পাণ্ডিত্য জাহির করা হয়ে যাবে। ভারতে প্রাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাদের জাতিগত সত্তা নিরূপণ করা যায় না।

এই উপমহাদেশের বিভিন্ন যুগের জনসংখ্যা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক হিসাব করা হয়েছে। তবে এই হিসেব নিতান্তই আনুমানিক। একটি হিসেব অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উপমহাদেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি ১০ লক্ষ বলে ধরা হয়েছে।* উত্তর-ভারতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তিসংখ্যা সম্পর্কে গ্রীক বিবরণে যা বলা হয়েছে সেটাই হল এই হিসেবের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু এও সম্ভব যে, গ্রীক লেখকেরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়িয়ে দেখিয়েছেন। কেননা, তাহলে বোঝানো যাবে, গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত অভিযান চালাতে গেলে আলেকজাণ্ডারকে কত বিরাট এক সামরিক শক্তির সম্মুখীন হতে হতো। এই ১৮ কোটি ১০ লক্ষ লোকের হিসেব কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। ওই সময়ের জনসংখ্যা ১০ কোটি বা তার কিছু কম ধরলে তা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি।† ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় প্রথম লোকগণনা হয়েছিল ১৮৮১ সালে। তখন লোকসংখ্যা হয়েছিল ২৫ কোটি ৩০ লক্ষের কিছু বেশি।

ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের এইসব জনগোষ্ঠী ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পটভূমিতে আর্য-ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল উত্তর প্রান্তে। ভারতীয় সভ্যতায় তাদের প্রভাব পড়ল পরবর্তী যুগে।

২

আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব

প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের প্রথম রাজা হলেন স্বয়ম্ভু মনু (স্বয়ং উৎপন্ন মনু)। মনুর জন্ম পিতামহ ব্রহ্মা থেকে। মনু ছিলেন উভলিঙ্গ। তাঁর শরীরের স্ত্রী অংশে দুটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মালো। আবার এদের থেকে এল আরো অনেক মনু। তার মধ্যে পৃথু একজন, তিনি হলেন জগতের প্রথম প্রকৃত স্বীকৃত রাজা। তার নাম থেকেই পৃথিবী নামের উৎপত্তি। তিনি বন কেটে বসত গড়লেন, চাষ করে শস্য ফলালেন, গো-পালন শুরু করলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন করলেন। এইভাবে মানুষের স্থিতিশীল জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। এইসব মানুষের মধ্যে দশম মনু সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর শাসনকালেই পৃথিবীতে সেই বিধ্বংসী প্লাবন আসে যাতে সমস্ত সৃষ্টি ডুবে যায় এবং প্রাণে বাচেন কেবল তিনিই। ভগবান বিষ্ণু আগেই মনুকে প্লাবন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই মনু একটা নৌকো তৈরি করে নিজের পরিবার ও সাতজন প্রাচীন ঋষিকে নিয়ে তার ওপর আশ্রয় নিলেন। বিষ্ণু নিজে একটি বিরাট মাছের রূপ ধারণ করলেন। মাছের সঙ্গে নৌকো বেঁধে দেওয়া হল, আর মৎস্যরূপী বিষ্ণু প্লাবনের জল সাঁতরে নৌকো টেনে নিয়ে এলেন এক পর্বতচূড়ায়। প্লাবনের জল নেমে যাওয়া পর্যন্ত সবাই ওখানে নিরাপদে রইলেন। সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি হল মনুর পরিবার থেকে। মনুর নয় পুত্র— বড়টি উভলিঙ্গ, তার দুই নাম— ইল ও ইলা। এই পুত্র থেকেই উদ্ভব হয় দুই প্রধান রাজবংশের— ইল থেকে সূর্যবংশ ও ইলা থেকে চন্দ্রবংশ।

পুরাণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে এই কাহিনীই পাওয়া যায়। প্লাবন এসেছিল বহু হাজার বছর আগে। পুরাণ অনুযায়ী মনুর বংশতালিকা মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতের নায়করা মনুরই বংশধর। তারপর ঐতিহাসিক যুগের সূচনার পরেও পুরাণে এই রাজবংশের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। (প্রথাগতভাবে ধরে নেওয়া হয়, মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল ৩১০২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে।) রাজবংশের বিবরণে কোনো ফাঁক নেই এবং বোঝা যায় অনেক সাবধানে ও ভেবেচিন্তেই এই পরম্পরা রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিযুগের আলোচনার ব্যাপারে যদি প্রাচীন সাহিত্যই একমাত্র সূত্র হতো, তাহলে আলোচনা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ হতো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর এক ধরনের ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল এবং দেখা গেল তার সঙ্গে প্রাচীন উপাদানের গরমিল হচ্ছে। ভাষাবিজ্ঞানের প্রসারের মধ্য দিয়ে এইসব নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ ও অন্যান্য জায়গায় উনবিংশ শতাব্দীতে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার রীতিমতো উন্নতি ঘটেছিল। ভারতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে সংস্কৃত ভাষার গঠন ও ধরনের

সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাটিনের রীতিমতো মিল রয়েছে। এ থেকে উৎপত্তি হয় এক থিয়োরি : ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির এক মূল ভাষা ছিল, যা আর্যভাষাভাষী উপজাতির পূর্বপুরুষরাও ব্যবহার করতেন। ইন্দো-ইয়োরোপীয়রা নির্গত হয়েছিলেন ক্যাস্পিয়ান সাগর ও দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চল থেকে। তারপর এঁরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়লেন পশুচারণ ভূমির খোঁজে। তাঁরা এলেন গ্রীস ও এশিয়া মাইনরে, ইরাণ ভারতবর্ষে। তখন এদের বলা হল আর্য। বৈদিক সাহিত্য ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আরো খুঁটিয়ে দেখে স্থির হল যে, মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের কোনো সময়ে আর্যদের আগমনের সময় থেকেই ভারত-ইতিহাসের শুরু।

কিন্তু অতীতের এই সযত্ন অঙ্কিত ছবি আবার সংশোধন করতে হল বিংশ শতাব্দীতে এসে। ১৯২১-২২ সালে প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাক্-আর্য সভ্যতা বা সিন্ধু-সভ্যতার সন্ধান পেলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তার দুই নগরকেন্দ্র, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা। এই আবিষ্কারের পর থেকে বোঝা গেল, ইতিহাসের প্রাচীন বিবরণটি নেহাতই পৌরাণিক। হরপ্পা সভ্যতার তারিখ হল, আনুমানিক ৩০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। মনুর বংশধর ও হরপ্পা সভ্যতার একই সঙ্গে অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, দুই সংস্কৃতির ধারা একেবারে বিপরীতমুখী।

সুতরাং প্রাচীনকাল সম্পর্কে দু'ভাবে জানা যায়। ঐতিহাসিক সূত্র, যার ভিত্তি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও বৈদিক সাহিত্য। অপরটি পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যগত সূত্র— যার ভিত্তি হল পুরাণ। পুরাণের রচনাকাল কিন্তু বেদের পরে। প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিক কালানুক্রম হবে এইরকম—খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে সিন্ধু-সভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে। ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্যদের আগমনের সময় সিন্ধু-সভ্যতা লুপ্তপ্রায়। আর্য বা ইন্দো-এরিয়ানরা ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের বংশধর। এরা কিছুকাল ব্যাকট্রিয়া ও উত্তর-ইরাণীয় মালভূমিতে বসবাস করছিল। কিন্তু ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারা হিন্দুকুশ পর্বতমালার গিরিপথ দিয়ে উত্তর-ভারতে আসে। এরা ছিল মূলত গো-পালক জাতি। তাই পশুচারণ ভূমির সন্ধানে প্রথমে এরা পাঞ্জাবের সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে তারপর জঙ্গল পরিষ্কার করে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বসতি স্থাপন করে। আগেকার সিন্ধু-সভ্যতার লোকদের* মতো এদেরও অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে কৃষিভিত্তিক হয়ে

* আর্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্রের সংস্কৃতির সঙ্গে একটা সম্ভাব্য-সম্পর্কের কথা মনে হয়। ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিমদিকে এবং এগুলি ১১০০ থেকে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের। সবচেয়ে প্রাচীনটি হল ১০২৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ বা তার ১১০ বছর কমবেশি সময়কার। আলিগড়ের আত্রানজী খেরা থেকে পাওয়া এই জিনিসগুলির প্রাচীনত্ব নির্ণীত হয়েছে কার্বন-১৪ পরীক্ষার সাহায্যে। এই সংস্কৃতির লোকেরা ছিল কৃষিজীবী এবং ঘোড়া ও আরো কয়েকটি পশুপালন করত। এরা ডালপালা দিয়ে তৈরি ঘরে বাস করত। দেওয়ালে রঙ মাখানো জ্যাবড়া ছবি থাকত। এরা তামা এবং কয়েক জায়গায় লোহারও ব্যবহার জানত। বৈদিক সূত্রে যে ধরনের সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এই বিবরণের বেশ মিল আছে।

উঠল। এই সময়েই ঋগ্‌বেদের* (প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য) শ্লোকগুলি স্মৃতিবদ্ধ ও সংগ্রহ করা শুরু হয়।

পুরাণে বর্ণিত কাহিনীগুলি সংগৃহীত হয়েছিল অনেক শতাব্দী পরে (৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। সেজন্যই এখানেলিপিবদ্ধ বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে বলে এগুলি সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। 'মনু' নামটি থেকে মানব (অর্থাৎ মানবজাতি) শব্দের উৎপত্তি। রাজা পৃথুর বনজঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ-আবাদের পত্তনের কাহিনীর মধ্যে গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলে প্রথমদিকের আর্যদের বসতি স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্লাবনের কাহিনীর কথা পড়লে তার সঙ্গে ব্যাবিলোনীয় উপকথার মিল মনে পড়ে। হিব্রুরাও তাদের নোয়ার নৌকোর কাহিনী রচনা করেছেন এই উপকথা থেকেই। এ কাহিনীর ভারতীয় ভাষ্য প্রসঙ্গে মনে হয়, আর্যরা যখন ইরাণের সমভূমি ছেড়ে চলে আসেনি তখন ব্যাবিলোনীয়দের কাছে এই প্লাবনের কাহিনী শুনে থাকতে পারে। অথবা হয়তো ব্যাবিলোনীয়দের কাছ থেকে সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা কিংবদন্তীরূপে কাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং পরে তাদের কাছ থেকে পরবর্তী সভ্যতার লোকেরা কাহিনীটি গ্রহণ করে। আর একটি সম্ভাবনা হল, মেসোপটেমিয়ার প্লাবনের অস্পষ্ট স্মৃতির সঙ্গে সিন্ধুনদের বারংবার প্লাবনের কথা মিশ্রিত হয়ে ব্যাবিলনের কাহিনী ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নতুন করে রচিত হয়। পুরাণসমূহ শেষবারের মতো সংশোধিত ও সম্পাদিত হচ্ছিল, তখনকার ভারতীয় রাজারা নিজেদের সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বংশধর বলে দাবি করতেন। সুতরাং এসবের সঙ্গে প্রাচীনতম নৃপতিদের যোগাযোগ প্রমাণ করার চেষ্টাই স্বাভাবিক।

আমাদের ইতিহাসের প্রাচীনতম সাহিত্যিক সূত্র হল ঋগ্‌বেদ। এর কিছু কিছু অংশ রচিত হয়েছিল ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বে। অবশিষ্ট বৈদিক সাহিত্য— সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ-এর পরবর্তী কালের রচনা। আর্য জীবনধারা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ রচিত হয়েছে এগুলির ওপর নির্ভর করে। দুই মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সময়কাল হল ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু যেহেতু আমরা যে অংশগুলি পড়ি তা খ্রীস্টোত্তর প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেজন্যে বর্ণিত সময় সম্পর্কে বিবরণগুলি নির্ভরযোগ্য, এমন আশা করা চলে না। মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে ঐতিহাসিকতার মর্যাদা দিতে হলে এগুলিকে সমর্থন করার মতো আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ চাই।†

* ঋগ্‌বেদে আছে ১০২৮টি শ্লোক এবং সেগুলি বিভিন্ন আর্য-দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত। বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারই শ্লোকগুলির রচয়িতা। এতে ঘটনাবলীর ক্রমিক বিবরণ নেই, কিন্তু আর্যদের জীবনধারার বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, কেননা এতে যে যুগের বর্ণনা আছে রচনাকালও সেই যুগেরই।

† এই সময়কার ধ্বংসাবশেষের খননকার্যের ফলে কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া সম্ভবও হচ্ছে। যেমন, মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডব ও কৌরব রাজাদের রাজধানী হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষের

যে আকারে মহাভারত আমাদের হাতে পৌঁছেছে তাকে পৃথিবীর দীর্ঘতম কাব্য বলা যায়। ভূমির অধিকার নিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তা নিয়েই মহাকাব্যের বিস্তার। দিল্লীর উত্তরের উর্বর ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি হল এর ঘটনাস্থল। কৌরবরা হল ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র। তাঁদের রাজধানী হস্তিনাপুরে। পাণ্ডবেরা পাঁচভাই ছিলেন পাণ্ডুর সন্তান। এঁরা কৌরবদের খুড়তুত ভাই। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে রাজ্যশাসনে অনধিকারী ছিলেন। তাই পাণ্ডবরাই কুরু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। ক্রুদ্ধ কৌরবরা ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডবদের দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন। সংঘর্ষ এড়াবার আশায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দু'ভাগ করে একভাগ পাণ্ডবদের দিয়ে দিলেন। তাঁরা দিল্লীর কাছাকাছি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু কৌরবরা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানালেন। পাণ্ডবরা হেরে গিয়ে তাঁদের ভাগের রাজ্যটি হারালেন। তবু একটা আপস সমাধানে ঠিক হল যে, পাণ্ডবরা তেরো বছরের জন্যে দেশত্যাগী হলে তারপর রাজ্য ফিরে পাবেন। পাণ্ডবরা ফিরে এসে রাজ্য দাবি করলে কৌরবরা তখন আর তাতে রাজি হলেন না। তখন পাণ্ডবরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কুরুক্ষেত্রের সমভূমিতে আঠারোদিন ব্যাপী এই যুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ ঘটল। তারপর পাণ্ডবরা অনেকদিন শান্তিতে রাজ্য শাসন করে তাঁদের এক পৌত্রকে রাজ্যভার দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করলেন।

মূলত মহাভারত হয়তো স্থানীয় একটি সংঘর্ষের বিবরণ মাত্র ছিল। কিন্তু এ কাহিনী চারণ কবিদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং মহাভারতের পরিণত আকারে আমরা দেখি এর উত্তরণ ঘটেছে একটি বিশাল যুদ্ধে, যাতে অংশ গ্রহণ করে ভারতের সমস্ত জাতি উপজাতি। যদিও মহাভারতের রচনাকার হিসেবে এক ব্রাহ্মণ কবি ব্যাসের নাম করা হয়, প্রকৃতপক্ষে মহাভারত কোনো একজন লোকের রচনা নয়। শুধু যুদ্ধের কাহিনী নয়, তার সঙ্গে এসেছে আরো নানা কাহিনী (তার অনেকগুলির সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্কই নেই) এবং নানান প্রক্ষিপ্ত অংশ— যেগুলি নিজস্ব কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং তাতে অন্যানা বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশও কম। এর মূল রচয়িতা হিসেবে কবি বাল্মীকির নাম করা হয়। রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর সময়কাল সম্ভবত আরো পরে, কেননা এর ঘটনাস্থল মহাভারতের ঘটনাস্থল থেকে আরো পূর্বদিকে উত্তর প্রদেশের পূর্ব অংশে।

কোশল রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাম বিবাহ করেন বিদেহ রাজকুমারী সীতাকে। রামের বিমাতার ইচ্ছে ছিল নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসানো। কৌশলে তিনি

খননকার্য হয়েছে কিছুকাল আগে। দেখা গেল, এর কিছু অংশ ৮০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের গঙ্গার বন্যায় ধুয়ে ভেসে গেছে। পুরাণেও এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হস্তিনাপুরের রাজাদের সপ্তম বংশধরের রাজত্বকালে এই বন্যা এসেছিল। সেই অনুযায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মোটামুটি সময় হল ৯০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য: হস্তিনাপুরে ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্রের সংস্কৃতির শেষচিহ্ন পাওয়া গেছে যে স্তরে, বন্যার চিহ্নও ঐ একই স্তরে দেখা গেছে।

রাম, সীতা ও আর এক ভাই লক্ষ্মণকে চোদ্দ বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। এরা তিনজনে উপদ্বীপভাগের বনাঞ্চলে চলে গিয়ে ঋষিদের মতো থাকতে লাগলেন। কিন্তু লঙ্কার (শ্রীলঙ্কার) রাক্ষসরাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। তখন রাম বানরদের নেতা হনুমানের সাহায্যে এক সেনাদল গঠন করলেন। রাবণের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধের পর রাবণ ও তাঁর সেনাদলের বিনাশ হল ও সীতা উদ্ধার পেলেন। নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্যে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল। অবশেষে রামের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটল। চোদ্দ বছর শেষ হলে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কোশল রাজ্যে ফিরে এলেন। বিপুল সংবর্ধনার মধ্যে রামের রাজ্যাভিষেক হল। তাঁর রাজত্বকাল কাটল সমৃদ্ধি আর ন্যায়বিচারের মধ্য দিয়ে। এখনো 'রামরাজ্য' বলতে এক আদর্শ রাজ্যের কল্পনা করা হয়। উপদ্বীপ অঞ্চল অতিক্রম করে রামের শ্রীলঙ্কা বিজয়ের কাহিনী হল আসলে আর্যদের উপদ্বীপ অঞ্চলে ক্রম প্রবেশের বর্ণনা। আর্যদের দক্ষিণমুখী যাত্রার ঐতিহাসিক সময় ধরা হয় প্রায় ৮০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। সুতরাং প্রকৃত রামায়ণের রচনাকাল তার অন্তত পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে। রচনাকালকে আরো প্রাচীন বলেও মনে করা যেতে পারে, যদি রাম ও রাবণের যুদ্ধকে আসলে গাঙ্গেয় উপত্যকার কৃষিজীবী ও বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিবাসী শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারী এই দুই মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ বলে ধরে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালের কোনো সংকলয়িতা হয়তো এই ঘটনাকে আরো দক্ষিণে স্থানান্তরিত করে তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার উল্লেখ জুড়ে দিয়েছেন।

ঋগ্‌বেদের সময়কার আর্যদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় মেলে বিভিন্ন নদীর উদ্দেশ্যে রচিত শ্লোকের মধ্যে। মনে হয় ঋগ্‌বেদের সময়ে আর্যরা পাঞ্জাবে ও দিল্লীর দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু পূর্বাভিমুখী যাত্রা তখনো শুরু হয়নি। পরবর্তী বৈদিক সূত্রগুলি সম্ভবত মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সমসাময়িক। এর মধ্যে ভারতবর্ষের ভূগোল সম্পর্কে আরো বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় আছে। তাতে দুটি সমুদ্র, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমির উল্লেখ দেখা যায়।

এখনকার তুলনায় তখনকার কালে আবহাওয়া ছিল আরো বৃষ্টিবহুল। বর্তমানের বিস্তৃত সমভূমিতে ও মরু-অঞ্চলে তখন ছিল বনভূমি। প্রথম কয়েকশো বছরে আর্যদের বিস্তার ঘটেছিল ধীরগতিতে। পাথর, ব্রোঞ্জ ও তামার কুঠারের সাহায্যে জঙ্গল পরিষ্কার চলছিল। প্রায় ৮০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত লোহার ব্যবহার ঘটেনি। হস্তিনাপুরের খননকার্য থেকে মনে হয়, ৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের সময় লৌহবস্তুর ব্যবহার ছিল। লোহার উন্নত ধরনের হাতিয়ার দিয়ে তাদের প্রভাব বিস্তারের গতি বাড়তে লাগল। এতে জমির কাজের ওপর চাপ কমে গেল এবং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার অবসর পাওয়া গেল। ৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ও তার পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচনাই তার প্রমাণ।

ঋগ্‌বেদের সময়ের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় শ্লোকগুলির মধ্যে। দশ রাজার যুদ্ধের বর্ণনায় এবং অন্যান্য বৃত্তান্তে উপজাতিগুলির সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলে ভারত-উপজাতিদের রাজা ছিলেন সুদাস। তাঁর

প্রধান পুরোহিত বিশ্বামিত্র যুদ্ধাভিযান করে রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করেন। কিন্তু রাজা চাইলেন বিশ্বামিত্রকে সরিয়ে অধিক শাস্ত্রজ্ঞ বশিষ্ঠকে পুরোহিতের পদ দিতে। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র দশটি উপজাতিকে সম্মিলিত করে রাজা সুদাসকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু জয় হল রাজা সুদাসেরই। গবাদি পশু অপহরণ ও ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ থেকে প্রায়ই উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হতো।

কিন্তু উপজাতিগুলির মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের অনার্য অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের বিরোধ চলছিল। আর্যরা এই শত্রুদের অত্যন্ত হীনচোখে দেখত। এবং এদের 'পনি' ও 'দাস' বলে অভিহিত করত। গোরু ছিল আর্যদের প্রধান সম্পদ আর পনিরা ছিল গবাদি পশু অপহারক। সেজন্যে প্রায়ই উপদ্রব লেগে থাকত। উপরন্তু পনিরা অদ্ভুত সব দেবতার উপাসনা করত। দাসদের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল আরো দীর্ঘায়িত, কারণ তারা এ ভূখণ্ডের আরো স্থায়ী বাসিন্দা। তবে যুদ্ধে আর্যরাই যে বিজয়ী হয়েছিল তা পরিষ্কার। কেননা, পরে 'দাস' শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়াল গোলাম। গায়ের কালো রঙ ও নাক-মুখের ভোঁতাভাবের দরুন দাসদের নিচুশ্রেণী বলে ধরা হতো। আর্যদের গায়ের রঙ ছিল ফরসা ও নাক-চোখ তীক্ষ্ণ। উপরন্তু দাসদের ভাষা ছিল ভিন্ন (তাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ আর্যদের বৈদিক সংস্কৃত ভাষাতেও ঢুকে পড়ে। এছাড়া আগন্তুকদের তুলনায় দাসদের জীবনযাপনের রীতিও ভিন্ন ছিল। আর্যদের আগমন ছিল কারো কারো মতে একটি পশ্চাদাভিমুখী ঘটনা, কেননা হরপ্পার নগর-সভ্যতা আর্যদের সভ্যতা থেকে অনেক উন্নত ছিল। ফলে উত্তর-ভারতে পুনর্বার যাযাবর ও কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটে এবং বিবর্তনের ফলে নতুন করে দ্বিতীয়বার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা স্থাপিত হয়।

আর্যরা যখন এসেছিল তখন তারা ছিল অর্ধ-যাযাবর গো-পালক। গোপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। গোধন দিয়েই মূল্য নিরূপিত হতো এবং সম্পত্তি হিসেবে গবাদি পশুই সবচেয়ে মহার্ঘ ছিল। গোরুর উল্লেখ তখনকার ভাষার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে 'গোবিষ্ঠি' শব্দটির প্রাথমিক অর্থ যদিও ছিল গো-ধন অনুসন্ধান, কালক্রমে অর্থ হয়ে দাঁড়াল— যুদ্ধ করা। অর্থাৎ, গোরুচুরি নিয়ে প্রায়ই উপজাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হতো। গোরুকে সম্ভবত লোকেরা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতীকী প্রাণী হিসেবে গণ্য করে ভক্তি করত। বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়া মঙ্গলজনক বলে ধরা হলেও অন্য সময়ে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ বিবেচিত হতো। গো-ধনের অর্থনৈতিক মূল্য গো-ভক্তির প্রগাঢ়তা বাড়াতেও সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে গোরুকে পবিত্র বলে পুজা করার আপাতযুক্তিহীন মনোভাবের জন্ম হয়েছিল বোধহয় এইভাবেই। আর্যরা আর যেসব জন্তু-জানোয়ার পালন করত, তার মধ্যে প্রধান ছিল ঘোড়া। যাতায়াতের জন্যে ঘোড়ার প্রয়োজন হতো। যুদ্ধে ঘোড়াই ছিল গতির উৎস। উপরন্তু দেবতা ও মানুষের রথ টানত এই ঘোড়াই। বন্য জন্তুর মধ্যে বাঘের চেয়ে সিংহের সঙ্গেই আগে পরিচয় হয়েছিল। হাতি সম্বন্ধে কৌতূহল-মিশ্রিত বিস্ময় ছিল। একে বর্ণনা করা হতো হস্তবিশিষ্ট

জন্তু বলে—'মৃগহস্তিন', অর্থাৎ হাতির শুঁড়ের উল্লেখ করা হয়েছে হাত বলে। সাপকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করা হতো, যেমন অধিকাংশ আদিম জাতিই মনে করত। অবশ্য সাপের সঙ্গে শক্তিরও একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত সাপের উপাসক শক্তিশালী 'নাগ' উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর।

উপজাতিগুলি স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস শুরু করায় জীবিকা-রীতিতে কিছুটা পরিবর্তন এল। গো-পালনের বদলে এরা এবার চাষবাসে মন দিল। বিশেষত, লোহার ব্যবহার জানবার পর জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে আগুনেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল এবং কিছু-কিছু জঙ্গল যে আগুন দিয়েও পুড়িয়ে ফেলা হয় তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য আর্যদের জীবনে কাঠ এত প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল বলে মনে হয় আগুন দেওয়ার চেয়ে কাঠ কেটেই বন পরিষ্কার করা হতো বেশি। প্রথমে জমি ছিল গ্রামের সকলের সম্মিলিত সম্পত্তি। তারপরে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব বাঁধন আলগা হয়ে গেলে পরিবার-গুলির মধ্যে জমি ভাগ হয়ে গেল। এভাবেই উৎপত্তি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির। অতঃপর শুরু হল মালিকানা, জমিবিরোধ ও উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা। কৃষিকাজে মনোনিবেশ করার পর নতুন নতুন জীবিকারও সৃষ্টি হল। সূত্রধরদের সমাজে বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো, কেননা তারা যে কেবল রথই তৈরি করত তাই নয়, লাঙলও তৈরি করতে জানত। বন থেকে অনায়াসে কাঠ পাওয়া যেত বলে সূত্রধরের জীবিকা বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে। সুতরাং এই পেশার সামাজিক মর্যাদাও ছিল উঁচু। গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় লোকেরা ছিল ধাতুশিল্পীরা, তারা তামা, ব্রোঞ্জ ও লোহা নিয়ে কাজ করত। আর ছিল মৃৎশিল্পী, তন্তুজীবী, নলখাগড়া ও বেতের জিনিস তৈরির কারিগরের দল।

চাষবাস থেকে এল ব্যবসা-বাণিজ্য। গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বদিক বরাবর জঙ্গল পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নদীপথই প্রধান বাণিজ্যের রাস্তা হয়ে দাঁড়াল। নদী-তীরবর্তী বসতিগুলি ছিল পণ্য বিক্রয়ের বাজার, ধনবান ভূমিজীবীরা অন্যান্য লোক নিয়োগ করত তাদের জমিতে চাষ করার জন্যে। অবসর ও সম্পদের দাক্ষিণ্যে তারাই হল বণিক সম্প্রদায়। সুতরাং সমাজের ভূম্যধিকারী শ্রেণী থেকেই এল ব্যবসায়ী শ্রেণী। প্রথমদিকে ব্যবসা ছিল আঞ্চলিক এবং আর্যরা তখনো সুদূরপ্রসারী বাণিজ্যের কথা ভাবেনি। অথচ ঋগ্‌বেদে যে জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে তাও নিশ্চয় সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক নয়। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিম এশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তবে হয়তো এই বাণিজ্য প্রধানত উপকূলবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে আর্য অর্থনীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর্যদের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কারিগরিবিদ্যার দরুন বাণিজ্য সীমিত ছিল নিকটবর্তী অঞ্চলেই। বিনিময় প্রথার সাহায্যেই ব্যবসা চলত তখন। বড় বড় কেনাবেচার ব্যাপারে গোরুকেই মূল্যমান ধরা হতো। এর ফলে ব্যবসার পরিধি বিস্তার ছিল কঠিন। মূল্যমান হিসেবে 'নিষ্ক' শব্দটিরও প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে একটি

স্বর্ণমুদ্রাকেও এই নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু প্রথম যুগে সম্ভবত এই শব্দটি কেবলই সোনার বিশেষ একটি মাপ বোঝাতো।

শাসন পরিচালনার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত কথা ও কাহিনী থেকে আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠনের উন্মেষের সন্ধান পাওয়া যায়। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তারা নিজেরা একত্র হয়ে নেতা হিসেবে একজন রাজা নির্বাচন করল। ফলে শেষপর্যন্ত জয় হল দেবতাদেরই। এইরকম আরো নানা প্রচলিত কাহিনী থেকে রাজা সম্পর্কিত ধারণার উৎপত্তির সূত্র পাওয়া যায়। উপজাতিগুলি ছিল গোষ্ঠীপতি দ্বারা শাসিত। গোষ্ঠীপতি গোড়ায় কেবল উপজাতির নেতাই ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ যখন প্রতিরক্ষার প্রয়োজন বাড়ল, গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে যে যুদ্ধপটু ও প্রতিরক্ষায় দক্ষ তাকেই গোষ্ঠীর নেতা নির্বাচন করা হল। ক্রমে ক্রমে নেতারা রাজাদের মতো বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে নিজেদের জন্যে গ্রহণ করল। রাজশক্তির দ্রুত বিস্তারকে অবশ্য সীমাবদ্ধ রাখা হল দুটি উপজাতীয় সমাবেশের সাহায্যে—'সভা' ও 'সমিতি'। এ দু'টির সঠিক কাজ যে কি ছিল তা জানা যায়নি। সম্ভবত 'সভা' ছিল উপজাতীয় বয়োবৃদ্ধদের সমাবেশ ও 'সমিতি'তে গোষ্ঠীর সমস্ত লোকেরাই সমবেত হতো। যেসব উপজাতিদের কোনো নির্বাচিত রাজা ছিল না, এই সমাবেশগুলিই শাসন নির্বাহ করত। এইরকম সভা-শাসিত উপজাতিদের সংখ্যাও কিন্তু কম ছিল না। রাজ্যগুলির ভৌগোলিক পরিধি ছিল স্বভাবতই সীমিত, কেননা তখনো পর্যন্ত রাজারা আসলে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীনেতা মাত্র।

প্রথমযুগে বৈদিক রাজারা ছিলেন প্রধানত সামরিক নেতা। যুদ্ধে দক্ষতা ও গোষ্ঠীর রক্ষাকার্যে সাফল্যের ওপরই তাঁর রাজা থাকা না-থাকা নির্ভর করত। তিনি স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার গ্রহণ করতেন। কিন্তু জমির ওপর তাঁর কোনো অধিকার ছিল না এবং নিয়মিত কোনো করও তিনি পেতেন না। যুদ্ধ বা গো-হরণ থেকে যা পাওয়া যেত তার একটা অংশ তাঁর প্রাপ্য ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল সামান্যই, কেননা পুরোহিতদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপও ছিল। কিন্তু রাজার ওপর ক্রমশ দেবত্ব আরোপ করায় এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। পরবর্তী যুগের কাহিনী থেকে জানা যায়, সে সময়ে বিশ্বাস ছিল যুদ্ধজয়ের জন্যে দেবতারাই রাজা নির্বাচন করতেন। এবং নির্বাচিত রাজা কিছু বিশিষ্ট ভগবদ্দত্ত গুণের অধিকারী বলে গণ্য হতেন। এইভাবে নশ্বর মানুষের ওপর স্বর্গীয় গুণ ও লক্ষণ আরোপিত হল। মানুষ ও দেবতার যোগসূত্র ছিলেন পুরোহিতরা। তাঁরা রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপের জন্য বিশেষ পশুবলির বিধান দিলেন। রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদেরও একটা বিশেষ স্থান ও ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। রাজা ও পুরোহিতদের পারস্পরিক নির্ভরতা শুরু হল এভাবেই। এবার ঝোঁক দেখা গেল রাজার পদকে বংশানুক্রমিক করে তোলার, 'সভা' ও 'সমিতি'র ভূমিকারও স্বাভাবিক পরিবর্তন এল। রাজার স্বেচ্ছাচার এই সমাবেশ দু'টি সংযত করতে পারলেও রাজাই হলেন প্রকৃত শাসনকর্তা।

একটা প্রাথমিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটল। রাজাই অবশ্য তার মূল কেন্দ্র। উপজাতীয় রাজ্যে (রাষ্ট্রে) থাকত বিভিন্ন উপজাতি (জন), উপজাতিগোষ্ঠী (বিশ) এবং গ্রাম। এর কেন্দ্র ছিল পরিবার (কুল) এবং পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষ ব্যক্তিই ছিলেন পরিবারের প্রধান (কুলপা)। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা ও গোষ্ঠীর প্রবীণরা রাজাকে সাহায্য করতেন। রাজার দু'জন ঘনিষ্ঠ সহায়ক ছিলেন, পুরোহিত ও সেনানী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি। পুরোহিত ধর্মীয় কাজ ছাড়াও জ্যোতিষী ও পরামর্শদাতার কাজও করতেন। গুপ্তচর, সংবাদ-সংগ্রাহক এবং দূত— এদের সকলকে নিয়ে ছিল রাজার অনুচরদের বৃত্ত। পরবর্তীকালে রাজার সহায়ক-গোষ্ঠী আর একটু বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রথচালক, কোষাধ্যক্ষ, গৃহস্থালির তত্ত্বাবধায়ক ও দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থাপক। রাজা এবং প্রজা উভয়েরই জুয়াখেলায় রীতিমতো আগ্রহ ছিল।

আর্যরা যখন প্রথম ভারতে আসে, তাদের মধ্যে তিনটি সামাজিক শ্রেণী ছিল— যোদ্ধা বা অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত ও সাধারণ মানুষ। জাতিভেদ সম্পর্কে তেমন কোনো সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। একজন লিখে গেছেন, 'আমি একজন কবি, আমার বাবা চিকিৎসক, আর মার কাজ হল শস্যদানা পেষণ।' পেশা পুরুষানুক্রমিক ছিল না এবং তিন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ছিল অবাধ। এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজনও নিষিদ্ধ ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে সুবিধের জন্যেই এই শ্রেণীবিভাগ। বর্ণভেদ (শ্রেণীভেদ নয়) প্রথম দেখা দিল যখন আর্যরা দাসদের নিজেদের সামাজিক গণ্ডির বাইরে গণ্য করতে শুরু করল। দাসদের সম্পর্কে আর্যদের একটা ভয় ছিল এবং তাছাড়া দাসদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটলে আর্যদের নিজস্ব সত্তার অবসান ঘটবে, এ আশঙ্কাও ছিল। দাসদের গায়ের রঙ কালো ও তাদের সংস্কৃতি ভিন্ন হওয়ায় প্রভেদটা হল প্রধানতই বর্ণগত। সংস্কৃত ভাষার বর্ণ শব্দটির অর্থ হল রঙ। এইযুগে বর্ণভেদের ব্যাপারে গায়ের রঙের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে উত্তর-ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতিতে এই ধারণা অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল। সুতরাং প্রথমে প্রভেদ ছিল আর্য ও অনার্যদের মধ্যে। আর্যরা ছিল দ্বিজ (প্রথম জন্মের পরও তাদের দ্বিতীয় জন্ম হতো উপনয়নের সময়)। আর্যদের মধ্যে ছিল ক্ষত্রিয় *(যোদ্ধা ও অভিজাত সম্প্রদায়), ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) ও বৈশ্য (কৃষিজীবী), চতুর্থ বর্ণ ছিল শূদ্র, অর্থাৎ দাস ও আর্য-দাস মিশ্র সম্প্রদায়।

কার্যত বর্ণভেদ সমাজকে অবিভাজ্য চার অংশে মোটেই ভাগ করেনি। ব্রাহ্মণরা প্রথম তিনটি বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকেদের সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন পেশার মধ্যে মিলন ও সমন্বয় অনিবার্য ছিল এবং এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ শুরু হয়। কিন্তু চতুর্থ বর্ণটির ভিত্তি ছিল সম্ভবত জাতি এবং পেশা (পরবর্তীকালেও এইভাবেই উদ্ভব হয়েছিল জাতিচ্যুতদের। তাদের এতই নিচু

* প্রথমদিকের লেখায় যোদ্ধা ও অভিজাতদের 'রাজন্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যবহার শুরু হয় আরো পরবর্তীকালে। বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে এখানে কেবল 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি ব্যবহৃত হবে।

হিসেবে দেখা হতো যে কয়েক শতাব্দী পরে তাদের স্পর্শকেও অপবিত্র বলে গণ্য করা হল) কোনো পেশার বর্ণগত মর্যাদা দীর্ঘদিন পরে পরিবর্তিতও হতো। ক্রমে ক্রমে আর্য-বৈশ্যরা ব্যবসায়ী ও জমির মালিক হয়ে উঠল। অপরদিকে শূদ্ররা কিছুটা মর্যাদা পেয়ে হয়ে দাঁড়ালো কৃষিজীবী (ক্রীতদাস হিসেবে নয়)। দাসদের ওপর আর্যদের কর্তৃত্ববিস্তার তখন সম্পূর্ণ। ওদিকে শূদ্ররা কৃষিজীবীর সম্মান পেলেও তাদের দ্বিজত্ব দেওয়া হল না। সেজন্যে বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তাদের অংশ-গ্রহণের অধিকার জন্মাল না। ফলে তারা তাদের নিজস্ব দেবতার পুজো শুরু করল। এই ধরনের সামাজিক বিভাগের ফলে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে নতুন নতুন জাতিগোষ্ঠীকে গ্রহণ করতে অসুবিধে হয় না। নতুবা যারা এল তাদের আলাদা একটি উপবর্ণে চিহ্নিত করা হতো। সেভাবে সবাই বৃহত্তর বর্ণবিভাগের অন্তর্গত হয়ে পড়ত। বর্ণ বিভাগের মধ্যে নতুন উপবর্ণের মর্যাদা নির্ভর করত তার পেশার ওপর, কখনো বা সামাজিক স্তরের ওপর।

বর্ণপ্রথার পেছনে আরো কারণ ছিল। শূদ্ররা যেভাবে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হয়েছিল সেটাও এই কারণগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। যাযাবর পশুচারণের জীবন থেকে স্থিতিশীল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনের পর শ্রমবিভাগ আর্যসমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে নতুন নতুন জনবসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্ম হল। তারা জিনিসপত্র সরবরাহ ও বিনিময় করত। স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাজকর্মের ভাগাভাগি হয়ে গেল। কৃষিজীবীরা বন পরিষ্কার করে নতুন চাষের জমি তৈরি করত, আর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জনবসতির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করত। ব্যবসায়ীরা আসত অবস্থাপন্ন ভূস্বামীদের মধ্য থেকে, কারণ তারাই টাকাকড়ির লেনদেন ভালো বুঝত। পুরোহিতরা বরাবরই আলাদা একটা সম্প্রদায়। যোদ্ধা-দের নেতা ছিলেন রাজা। এদের ধারণা ছিল, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করাই তাদের একমাত্র কাজ এবং এর ওপরই তাদের গোষ্ঠীর ভালোমন্দ নির্ভর করছে। ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে ছিলেন রাজা। তারপরই বর্ণপ্রথার উপরের শ্রেণীতে স্থান পেল যোদ্ধারা (ক্ষত্রিয়), তার পরের স্থান পুরোহিতদের (ব্রাহ্মণ)। এরপর সমৃদ্ধ ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা (বৈশ্য) ও অবশেষে কৃষিজীবী (শূদ্র)।

সমাজের এই বিভাগের গুরুত্ব ও উচ্চ বর্ণের অসীম ক্ষমতার তাৎপর্য সম্পর্কে পুরোহিতরা সহজেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। তারা কৌশলে বর্ণবিভাগের উচ্চতম স্থানটি আদায় করে নিল। যেহেতু তারাই কেবল রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ (রাজার পক্ষে তা এতদিনে আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল) করতে পারে, তাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তারাই হয়ে উঠল। বর্ণবিভাগকে তারা এবার ধর্মীয় স্বীকৃতি দিল। বর্ণবিভাগের পৌরাণিক উৎপত্তি সম্পর্কে ঋগ্‌বেদের শেষের দিকে একটি স্তোত্র পাওয়া যায় :

যখন দেবতারা বলিদানের জন্যে উৎসর্গ হিসেবে মানুষকে বেছে নিলেন··· যখন তাঁরা মানুষকে বিভক্ত করলেন, কতখণ্ড হয়েছিল মানুষের শরীর? কি নাম

দেওয়া হল তার মুখকে, তার বাহুকে, তার জঙ্ঘা ও পদযুগলকে? ব্রাহ্মণ হল তার মুখ, বাহু দিয়ে এল যোদ্ধা। বৈশ্য হল তার জঙ্ঘা, পদযুগল থেকে এল শূদ্র। উৎসর্গের দ্বারা দেবতারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলেন, এভাবেই প্রথম ধর্মের সূচনা হল। এর পর দেবতারা দ্যুলোকে গমন করলেন, এখানেই শাশ্বত আত্মা এবং দেবতাগণ বিরাজ করেন।[১]

বংশানুক্রমিকতা এসে যাওয়ার ফলে বর্ণভেদ প্রথা প্রবল স্থায়ী হয়ে দাঁড়ালো। সমবেত ভোজন সম্পর্কে যে আদিম নিষেধ প্রচলিত ছিল তা এখন বর্ণভেদ প্রথা-সম্পর্কীয় একটি নিয়মে এসে দাঁড়ালো। এর থেকে এল বিয়ে নিয়ে নানা বাধা-নিষেধ এবং নিজস্ব বর্ণের ভেতরে ও বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ক নিয়মকানুন। বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তি ও প্রচলন কেবল চারটি প্রধান বিভাগের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। আসল ছিল পেশাগত বিভাগ অনুসারে অসংখ্য উপবর্ণের অস্তিত্ব। শেষপর্যন্ত উপবর্ণই (জাতি বা আক্ষরিক অর্থে জন্ম) হিন্দুসমাজের প্রাত্যহিক জীবনধারায় মূল বর্ণবিভাগের চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করল। বর্ণ সেখানে একটা তত্ত্বনির্ভর মূল কাঠামো মাত্র। উপবর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল কর্মবিভাগ ও অর্থনৈতিক নির্ভরতা। বর্ণবিভাগ যখন বংশানুক্রমিক হয়ে উঠল এবং পেশার ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, কোনো উপবর্ণভুক্ত লোকের পক্ষে উচ্চতর বর্ণে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সম্পূর্ণ উপবর্ণটির পক্ষে হয়তো উঁচুদিকে ওঠা সম্ভব ছিল, যদি উপবর্ণের সমস্ত লোক স্থান ও পেশা পরিবর্তন করত। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর একমাত্র পথ ছিল বর্ণভেদ প্রথায় অবিশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়া। এই ধরনের সম্প্রদায়ের উদ্ভব শুরু হল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে।*

সমাজের ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে হতো গ্রাম। সম্ভবত, প্রথম দিককার গ্রামের পরিবারগুলি পরস্পরের আত্মীয় ছিল। বৃহদাকার পরিবারে তিনপুরুষের লোকজন একই সঙ্গে বাস করত। বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না, এবং জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেবার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বরপণ ও কন্যাপণ দুইই চালু ছিল। আর্য পরিবারে ছেলের জন্ম বিশেষভাবে কাম্য ছিল, কেননা বহু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে পুত্রের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। মেয়েরা মোটামুটি স্বাধীন ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, প্রাচীন গ্রীকরা যেমন দেবীদের ক্ষমতা ও শক্তির আকর হিসেবে কল্পনা করেছিল, ভারতীয় আর্যরা তা কখনো করেনি। আর্যদেবীরা ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ও ঘরোয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীরা প্রতীক আত্মোৎসর্গের অনুষ্ঠান করত। এই অনুষ্ঠান কেবল অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিনা, তা জানা যায় না। পরের যুগে স্বামীর চিতায় বিধবাদের আত্মোৎসর্গের প্রথা এসেছিল সম্ভবত এই অনুষ্ঠানের সূত্র ধরেই। বৈদিক যুগে সতীপ্রথা যে নিতান্তই প্রতীকী ছিল তার প্রমাণ হল বৈদিক সাহিত্যে বিধবাদের

* বর্ণভিত্তিক সমাজের বিবর্তন ঘটেছিল স্বভাবতই খুব ধীরে ধীরে। সহজ করার জন্যে, পুরো ব্যাপারটা এখানে খুব স্বল্প পরিসরে বোঝানো হয়েছে।

পুনর্বিবাহের উল্লেখ। এই বিয়ে হতো সাধারণত স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে। পুরুষ ও মেয়েদের বহুবিবাহ অজানা না হলেও একবিবাহই ছিল সাধারণ প্রচলিত রীতি। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ ছিল। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যৌন-সম্পর্কের ব্যাপারে আর্যদের আতঙ্কিত মনোভাব ছিল (যদিও দেবতাদের মধ্যে তেমন সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়)। বলা হয় বিশ্বের আদিযুগীয় দুই যমজ থেকেই সমগ্র মানবজাতীর উৎপত্তি। কিন্তু মৃত্যুর দেবতা যমকে যখন তার বোন যমী প্রেম নিবেদন করেন, যম তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে অনাচারের কাহিনী জড়িত থাকায় মনে হয় যে, এই প্রথা সম্পর্কে মনোভাব ছিল মৃত্যুভয়ের সমতুল্য।

পরিবারের লোকজন তাদের গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে একই গৃহের মধ্যে বাস করত। পরিবারের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হতো। কাঠের কাঠামোর উপর বাড়ি তৈরি হতো। চারকোণে চারটি থাম ও তার উপর আড়াআড়ি বরগার চারিদিক ঘিরে ঘরের দেওয়াল তৈরি হতো। নলখাগড়ার দেওয়ালের ভিতর ভরে দেওয়া হতো খড়। বাঁশের লম্বা লম্বা টুকরোর উপর খড় বিছিয়ে দিয়ে তৈরি হতো ঘরের ছাদ। পরবর্তী শতাব্দীতে আবহাওয়া অনেক শুকনো হয়ে গেলে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘর তৈরি শুরু হয়। প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল দুধ, ঘি, শাকসব্জি, ফল ও যব। কোনো ধর্মীয় উৎসব বা অতিথি সমাগমের সময় খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন হতো। ষাঁড়, ছাগল ও ভেড়ার মাংস, আর মাদকদ্রব্য হিসেবে সুরা বা মধুর ব্যবস্থা থাকত।

লোকের পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধে ছিল। অধিকাংশ লোকই কেবল দেহের নিম্নাংশের জন্যেই পোশাক ব্যবহার করত। কিংবা, ঢিলে আলখাল্লা। কিন্তু নানান গড়নের গয়নার খুব প্রচলন ছিল। লোকে গয়না ভালোও বাসত। অবসর কাটত, নাচ, গান, বাজনা ও জুয়াখেলার মধ্য দিয়ে। আরো উৎসাহীরা রথের দৌড়ের ব্যবস্থা করত। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ থেকেই আর্যদের গান-বাজনা সম্পর্কে আগ্রহের কথাটা বোঝা যায়। ঢোল, বীণা ও বাঁশির ব্যবহার ছিল খুব। পরে এলো করতাল ও তারের বাজনা। সামবেদ গানের জন্য শব্দ, সুর ও মাত্রা সম্পর্কে যা নির্দেশ পাওয়া যায়, তা সংগীত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। সপ্তসুরের কথাও আর্যরা জানত। জুয়াখেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। জুয়াড়ীরা হেরে গিয়ে কপাল চাপড়াত, কিন্তু খেলা ছাড়ত না। বৈদিক শ্লোকগুলি থেকে পাশার বিষয়ে ও খেলার নিয়মকানুন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। রথের দৌড় ছিল বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাপার এবং বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবেও রথের দৌড়ের ব্যবস্থা ছিল। হালকাভাবে তৈরি দু'ঘোড়ায়-টানা এই রথগুলিতে ছ'জন মানুষ বসতে পারত এবং এর চাকাগুলি ছিল শলাকাবিশিষ্ট।

হরপ্পার লোকেদের নিজস্ব বর্ণমালা থাকলেও আর্যরা কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত লিখতে জানত না। সম্ভবত ৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগে বর্ণমালা আবিষ্কার হয়নি, কেননা লেখার ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে। ভারতে লেখার প্রথম যেসব নমুনা পাওয়া গেছে (৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের সময়, সম্রাট অশোকের

শিলালিপি), তা দেখে মনে হয়, এই লিপি আসিরীয়দের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বৈদিকযুগের প্রথমদিকে শিক্ষা ছিল মৌখিক। সেযুগের একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়— বর্ষার সময় ব্যাঙরা যেমন একত্র হয়ে একে অপরের ডাকে প্রতিধ্বনি তুলে ডাকতে থাকে, ছাত্ররা তেমনি শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তুলে নিজেরাও আবৃত্তি করে। মুখস্থ করার কিছু-কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। বৈদিক যুগের পরের দিকে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্যপালন আবশ্যিক হয়ে গেল। শহর থেকে দূরে গুরুর কাছে গিয়ে ছাত্ররা কয়েক বছর থাকত ; উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও বলা হল, সমস্ত 'দ্বিজ' বর্ণভুক্ত লোকরাই বেদ পড়তে পারে, প্রকৃতপক্ষে কেবল ব্রাহ্মণরাই বেদশিক্ষার অধিকারী ছিল। অঙ্ক, ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঋগ্‌বেদের কিছু-কিছু শ্লোকে আনুষ্ঠানিক নৃত্য ও কথোপকথন আবৃত্তির উল্লেখ আছে। একে নাটকের আদিমরূপ হিসেবে ধরা যায়। চারণকবিদের কাহিনী, যার থেকে মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়, তাও নাটকের রূপে উপস্থিত করার সুযোগ ছিল।

কোনো নির্দিষ্ট আইনবিষয়ক সংস্থা এসময়ে ছিল না। প্রথাই ছিল আইন। রাজা ও প্রধান পুরোহিত সম্ভবত সমাজের কিছু-কিছু বয়োবৃদ্ধ লোকদের সাহায্যে বিচারের কাজ করতেন। বিভিন্ন ধরনের চুরি, বিশেষত গোরুচুরিই ছিল প্রধান অপরাধ। নরহত্যার ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পরিজনকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মূল্য ধরে দেবে (যে প্রথাকে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা বলত 'ওয়েরগেল্ড'—wergeld) এবং সাধারণত একশো গোরু দিয়ে এই ক্ষতিপূরণ করা হতো। মৃত্যুদণ্ডের চিন্তা আরো পরে এসেছে। বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যেও বিচার সম্পন্ন করা হতো। যেমন, উত্তপ্ত কুঠারে জিভ ঠেকিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে বলা হতো। বৈদিক যুগের পরের দিকে জমির অধিকারগত বিরোধ ও উত্তরাধিকার সমস্যারও উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ সন্তানের উত্তরাধিকার লাভের নিয়মের উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু সে প্রথা বেশিদিন চলেনি। এই সময়েই বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার ছায়াপাত ঘটল— উচ্চবর্ণের অপরাধীরা লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হতো।

বর্ণভেদ প্রথার মতো ধর্মীয় উপাসনাও আরম্ভে আর্য ও অনার্য—দুই ভিন্ন আচার অনুসরণ করে। দুয়েরই কিছু-কিছু চিহ্ন এখনকার হিন্দুধর্মে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো নিয়ম নিজস্ব আকারে টিকে গেছে, অন্যগুলি মিলে মিশে গেছে। হরপ্পার লোকের উর্বরা সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে উপাসনা করত—মাতৃদেবীর, ষাঁড় বা শৃঙ্গবিশিষ্ট দেবতার এবং বিশেষ কয়েকটি পবিত্র গাছের। হিন্দুধর্মে এখনো এসবের পুজো হয়। বেদভিত্তিক ব্রহ্মণ্য উপাসনার পদ্ধতি ছিল আরো বিমূর্ত। ফলে অল্পলোকই তাতে আকৃষ্ট হতো। ভারতীয় সংস্কৃতির দার্শনিক ও তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে যদিও এই পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল, কার্যত অধিকাংশ লোকই সাদামাটা পার্থিব পদ্ধতিতেই পুজো করতে চাইত। ঋগ্‌বেদের শ্লোকের মধ্যে আর্যদের ধর্মচর্চার আদিরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের ধর্ম পরবর্তী যুগের হিন্দু-

ধর্মকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করলেও দুটির পার্থক্যও কিন্তু সুস্পষ্ট।

আর্যদের সর্বপ্রথম ধর্মীয় ধারণা ছিল আদিম সর্বপ্রাণবাদী, অর্থাৎ তাদের চারদিকের যে-সমস্ত প্রাণী বা শক্তিকে তারা বুঝতে পারত না বা নিয়ন্ত্রণও করতে পারত না, তাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করে পুরুষ বা স্ত্রী দেবতা হিসেবে গণ্য করা হতো। ইন্দ্র ছিলেন আর্যকল্পনায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ— শক্তির দেবতা, যুদ্ধে অজেয়, অসুর-বিধ্বংসী এবং প্রয়োজনমতো জনপদ বিনাশে উদ্যত। বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে আর্যদের কাছে অপরাহত সমস্ত শক্তির বিজেতা বলে মনে করা হতো। আগুনের দেবতা অগ্নি* সম্পর্কেও নানা প্রশস্তি করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিগৃহে অগ্নির স্থান ছিল খুব উচ্চে। বিবাহ অনুষ্ঠানে অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী রাখা হতো। আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মে সেই প্রথা চলে আসছে। পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্নিকে পবিত্রতম মনে করে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো। দেবতা ও মানুষের মধ্যে আগুনই ছিল যোগসূত্র। প্রাচীনতম দেবতাদের প্রারম্ভিক কল্পনা খুঁজে পাওয়া যায় ইন্দো-ইয়োরোপীয় অতীতে। ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের মুখ্য দেবতা ছিলেন 'দ্যৌস' (জিউস), কিন্তু বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে তাঁর স্থান অতটা উঁচু ছিল না। অন্য উপাস্য দেবতা ছিলেন সূর্য, সবিতৃ (এই সৌর দেবতার উদ্দেশ্যেই গায়ত্রীমন্ত্র নিবেদিত), সোম (সোমরস নামক উত্তেজক পানীয়ের দেবতা) এবং বরুণ (ইউরেনাস এঁর সঙ্গে তুলনীয়), যেন এক জ্যোতিষ্মান্ দেবতা যিনি স্বর্গে দৃপ্তরূপে বিরাজিত। মৃত্যুর দেবতা যমেরও একটা বিশেষ স্থান ছিল। এছাড়া সৌরজগতে আরো বহু আকার ও প্রকৃতির দিব্যজীব বাস করত— গন্ধর্ব, অপ্সরা, মরুৎ ইত্যাদি! যখন খুশি এদের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলাও যেত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি গৌণ অংশ ছিল মানুষের তৈরি কোনো জিনিসের অর্চনা। বলিদানের বিভিন্ন অস্ত্র ও অনুষঙ্গের মধ্যে যে দৈবশক্তির বাস, তাকে উদ্দেশ্য করেও স্তোত্ররচনা হতো, যেমন বলির বেদী। তাছাড়া সোমরসের গাছ ছেঁচবার পাথর, লাঙল, যুদ্ধাস্ত্র, ডঙ্কা, হামান, নুড়ি ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও স্তোত্র ছিল।

আর্যদের ধর্মীয় আচারের প্রধান অঙ্গ ছিল বলিদান। গৃহপুজায় বলির উপচার হতো ছোটখাট; কিন্তু মাঝে মাঝে বৃহৎ বলিদানের আয়োজন হতো এবং তাতে শুধু গ্রামের লোকই নয়, গোটা উপজাতির লোকই অংশ নিত। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে দেবতাদের আশীর্বাদ ছিল প্রয়োজনীয় আর আর্যদের বিশ্বাস ছিল বলি দিয়ে অর্চনা করলেই দেবতারা খুশি হয়ে অনুগ্রহ করবেন। দেবতারা অদৃশ্যরূপে যুদ্ধে অংশ নিতেন বলে বিশ্বাস ছিল। বলিদান ছিল একটি গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। কিন্তু বলিদানের পরে যে অবাধ আনন্দ-উৎসব, ভোজ ও সোমরস পান চলত, তার মধ্যে সামাজিক বাধানিষেধ থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ উচ্ছল প্রাণশক্তি প্রকাশের একটা পথ খুঁজে পেত।

আদিমকালে বলিদান সংক্রান্ত যেসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তার ওপর ভিত্তি

* অগ্নি শব্দটির সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় ল্যাটিন শব্দ 'ইগনিয়াস' এর সঙ্গে। এর অর্থও আগুন

করেই আর্যদের বলিদানের রীতিনীতির উদ্ভব হয়েছিল। আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। তা থেকেই 'ব্রাহ্মণ' কথাটি এসেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মের মতোই রহস্যময় ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী, সেই ব্রাহ্মণ। (কোনো কোনো লেখক এর সঙ্গে আদিম মানুষের 'মানা' সম্বন্ধে ধারণার যোগ খুঁজে পান।) আর একটি স্বীকৃত ধারণা ছিল, ঈশ্বর পুরোহিত ও উপচার কয়েক মুহূর্তের জন্যে অভিন্নতা অর্জন করে। স্বভাবতই বলিদানের অনুষ্ঠান পুরোহিত্রের ও রাজার প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলেছিল, কেননা পুরোহিতের সাহায্য ছাড়া বলিদান সম্ভব ছিল না এবং রাজার ধনসম্পদ ও বলিদানের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। বলিদানের অনুষ্ঠান থেকে প্রসঙ্গত অন্য কয়েকটি বিষয়ে চর্চা আরম্ভ হয়। বলিদানের জায়গায় বিভিন্ন উপকরণ রাখবার সঠিক ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্যে বিস্তারিত আঙ্কিক হিসেবের দরকার হতো। এ থেকে অঙ্কের চর্চা বাড়ল। আবার ঘনঘন বলিদানের জন্যে পশুর দৈহিক গঠনতন্ত্র সম্পর্কে রীতিমতো জ্ঞানার্জনে সুবিধে হল। তার ফলে বহুদিন পর্যন্ত শারীরবৃত্তি বা রোগ-নিরূপণ বিদ্যার চেয়ে দৈহিক গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান অনেক বেশি অগ্রসর ছিল।

মহাকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে আর্যদের জ্ঞান ও ধারণা ছিল সীমাবদ্ধ। যেমন সৌরমণ্ডলের মধ্যে কোথাও একটা বিরাট ত্যাগ ও বলিদানের ফলস্বরূপ পৃথিবীর উৎপত্তি এবং আরো নিয়মিত বলিদানের মধ্যেই পৃথিবীকে লালন করতে হবে, এই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসও সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়নি কারণ বৈদিকযুগের শেষভাগে রচিত সৃষ্টিস্তোত্রে বিশ্বসংসারের জন্ম সম্বন্ধে সংশয় দেখা যায় এবং অসীম শূন্যতার মধ্য থেকে সৃষ্টির উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

> শূন্যতা অথবা অস্তিত্ব কিছুই তখন ছিল না, বায়ু ছিল না— তার অন্তরালে অন্তরীক্ষ ছিল না। কে উহা আচ্ছাদিত করে কোথায় কার কাছে রাখে? অসীম অগাধ বারিধি ছিল কি, যার গভীরতা অনন্ত? কে জানে, কে বলতে পারে কোথা থেকে কবে সৃষ্টির উৎপত্তি? দেবতারাও এসেছেন সৃষ্টির পরে, তাই কোথা থেকে সৃষ্টির শুরু তা সবার অজানা।[২]

মৃতদেহ কবরও দেওয়া হতো, দাহও করা হতো। তবে প্রথমদিকে কবর দেওয়াই ছিল প্রথা। ইয়োরোপীয় ব্রোঞ্জ-যুগের কবরের মতো। দেখা যায়, উঁচু ঢিবির চারিদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে আর একটি বড় দণ্ড উঁচু করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। পবিত্রতার সঙ্গে আগুনের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর কবরের চেয়ে মৃতদেহ দাহই বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল।* ক্রমশ কবর দেওয়ার প্রথা প্রায় উঠেই গেল।

* দাহ করার প্রথা কার্যত অনেক সুবিধাজনক ও স্বাস্থ্যসম্মত হলেও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রথার প্রবর্তন তেমন সুখের ব্যাপার নয়। কবর এবং কবরের অলংকরণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী। মিশরীয় ও চীনদের মতো ভারতীয়রাও যদি তাদের মৃতদেহ কবর দিত তাহলে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরো নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হতে পারত।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা অনুযায়ী পরলোকে পাপীরা শাস্তি আর পুণ্যবানরা পুরস্কার লাভ করত। পাপীদের স্থান হতো নরকে—সেটা ছিল বরুণ দেবের রাজত্ব। এর সঙ্গে গ্রীকদের 'হেডিস'-এর তুলনা করা যায়। যারা পুরস্কার পাবার তারা যেত পিতৃলোকে (যার সঙ্গে তুলনীয় গ্রীকদের কল্পিত ইলিসিয়াম)। শেষদিকের কোনো কোনো স্তোত্রে metempsychosis—অর্থাৎ উদ্ভিদরূপে মানুষের পুনর্জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মার মানবদেহে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ধারণা তখনো তেমন স্পষ্ট হয়নি। শেষপর্যন্ত জন্মান্তরবাদ যখন প্রচলিত হল তখন স্বভাবতই তার থেকে আর একটি ধারণার উৎপত্তি হয়: পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে আত্মারা পরে জন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। এ থেকে এলো কর্মবাদ, যা পরের হিন্দুধর্মের সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। কর্মবাদের সাহায্যে জাতিভেদ প্রথারও একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে উঠল। উচ্চ বা নিম্নবর্ণে জন্ম নির্ভর করত পূর্ববর্তী জন্মের কর্মফলের ওপর। এর ফলে মানুষ জন্মান্তরে সামাজিক উন্নতির আশা করতে শিখল। কর্মবাদ সম্পর্কিত নিয়মকানুন ক্রমশ ধর্মের বৃহত্তর ধারণার মধ্যে নিহিত হল। 'ধর্ম' শব্দটি অন্যভাষায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। এর অর্থ হল স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের পালন— অন্তত বর্তমান প্রসঙ্গে এই অর্থই সবচেয়ে উপযোগী হবে। সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম দাঁড়ালো বিভিন্ন সামাজিক স্তরগুলি অক্ষত রাখা—অর্থাৎ জাতিভেদের নিয়মগুলি মেনে চলা।

সৃষ্টিস্তোত্রে যে সংশয় ব্যক্ত হয়েছে তা সে যুগের জ্ঞানপিপাসা ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার একটি উদাহরণমাত্র। এর একটা পরিণতি হল বৈরাগ্য। কিছু-কিছু অন্বেষক একা বা ছোট ছোট দল বেঁধে সমাজ থেকে দূরে কঠোর তপশ্চর্যায় জীবন-যাপন করতে লাগলেন। এই সংসার-বৈরাগ্যের পিছনে হয়তো দুটির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ছিল—কৃচ্ছ্রসাধন ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন, অথবা লোকালয় থেকে সরে গিয়ে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার দায়মুক্ত হওয়া। দ্বিতীয় সম্ভাবনার উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় কোনো কোনো যোগীর বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতিকে অস্বীকার— অথবা কোনো কোনো সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর অদ্ভুত নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান (যেমন নগ্নতাবাদ)।

সমাজ থেকে দূরে সরে যাবার আরো কারণ ছিল। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই আর্য-সমাজের পুরনো গঠন অনেক বদলে গিয়েছিল। উপজাতি সমাজের জায়গায় ততদিনে এসে গেছে স্থায়ী প্রজাতন্ত্র এবং ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী রাজাদের যুগ। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মাৎস্যন্যায়ের জন্ম হয়, যখন অপ্রতিহত প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় শক্তিশালীরা দুর্বলদের ইচ্ছেমতো গ্রাস করে নেয়। শাস্ত্রে মাৎস্য-ন্যায়ের সংজ্ঞা হল 'বিশৃঙ্খলার সময় যখন বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে'। গ্রামের জমি ভাগ হয়ে কয়েকজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল, অথবা স্থানীয় শাসকের আয়ত্তাধীন হয়ে গেল। এইভাবে জমির সমবেত অধিকার ক্রমশ কমে এলো। গঙ্গানদীতে নৌ-চলাচল বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতি-যোগিতাও বেড়ে উঠল। ধীরে ধীরে একটা অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাবের

আবহাওয়া দেখা দিল—যা থেকে অনুভূতিশীল মানুষরা মুক্তি খুঁজতে লাগলেন।

ঋষি বা তপস্বীরা অবশ্য বনে বা পাহাড়েই জীবন কাটিয়ে দেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজে ফিরে এসে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথাগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। ব্রাহ্মণরা সম্ভবত এর মধ্যে তাঁদের নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখা সম্বন্ধে বিপদের আশঙ্কা করলেন। তখন ব্রাহ্মণরা মানুষের জীবনকে চারটি কালানুক্রমিক ভাগে বিভক্ত করার বিধান দিলেন। একেক ভাগকে আশ্রম বলা হতো। প্রথমে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, তারপর গৃহীজীবন, তারপরে সমাজ থেকে দূরে সাত্ত্বিক জীবনযাপন এবং অবশেষে ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীর জীবন। সামাজিক দায়িত্ব শেষ করে তবেই মানুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবে, এই ছিল আদর্শ। তবে বলা বাহুল্য, অর্থ-নৈতিক কারণে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল কেবল উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যেই। তার মধ্যেও নীতি হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করলেও কার্যত এ ব্যবস্থার তেমন প্রয়োগ কখনোই হয়নি। একটা ব্যাপার অবশ্য ব্রাহ্মণরা মেনে নিলেন, বেদের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়বাদীঅংশ—আরণ্যক ও উপনিষদ—তার মধ্যে এইসব ঋষিদের কিছু-কিছু উপদেশ সন্নিবিষ্ট করা হলো।

সন্ন্যাসীজীবন সব সময়ই পলায়নী মনোভাবের পরিচায়ক মনে করলে ভুল হবে। উপনিষদ পড়লেই বোঝা যায়, এই ঋষিদের মধ্যে অনেকেই জীবনের কিছু-কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। কোথা থেকে এসেছিল এই জগৎ সংসার ? একি নক্ষত্রজগতের কোনো সঙ্গমের ফলে সৃষ্টি ? তাপ থেকে ? তপশ্চর্যা থেকে ? আত্মা বলে কি কিছু আছে ? আত্মা তাহলে কি ? মানব-আত্মার সঙ্গে জগৎ-আত্মার কি তাহলে সম্পর্ক ?

"'বটবৃক্ষ থেকে আমাকে একটি ফল এনে দাও।'

'তাত, এই যে একটি ফল এনেছি।'

'ভেঙে দেখ।'

'ভেঙেছি।'

'কি দেখতে পাচ্ছ ?'

'খুব ছোট ছোট বীজ।'

'তার একটা ভাঙো।'

'ভেঙেছি।'

'এবার কি দেখতে পাচ্ছ ?'

'কিছুই না তাত।'

"পিতা বললেন, 'পুত্র, ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি যা অনুভব করতে পারছ না, তাই হলো প্রকৃত সত্তা। আর তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই বিরাট বটবৃক্ষ। বিশ্বাস করো পুত্র, ঐ মূল সত্তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমস্ত সত্তা। এই হলো চরম সত্য, এই হলো আত্মন্।'" ৩

সাধারণ লোকে মনে করে, বৈদিক যুগ ছিল অতীতের সুবর্ণযুগ। সেযুগে বুঝি দেবতারাও এসে দাঁড়াতেন মানুষের পাশে। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়ের জন্য বীরের

মতো লড়াই করত। কিন্তু এই সময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখতে গেলে বহু অনিশ্চয়তা ও ফাঁক এসে পড়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের- সাহায্যেই আরো সঠিক তথ্য উদ্ধার সম্ভব। তবে বৈদিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় দান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের ক্ষেত্রে। ভারতীয়, বিশেষত হিন্দু জীবনধারার বহু আচার-অনুষ্ঠানের উৎস অনুসন্ধান করা যাবে আর্যদের যুগে।* আর্যরা যে কেবল সংস্কৃত ভাষা, বর্ণভিত্তিক সমাজ ও ধর্মীয় বলিদানের ধারণা, উপনিষদের দর্শনের ব্যাপারেই তাদের অবদান রেখে গেছে তা নয়, তারা বিস্তৃত বনাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষির প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। সবথেকে বড় কথা হলো, গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এইসব ধারণার বিবর্তন হয়ে ক্রমশ নতুন চিন্তাধারা ও রীতিনীতির সূচনা হতে থাকে।

শীঘ্রই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষদের ভাষা হয়ে দাঁড়ালো। এই উপমহাদেশে পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরেই সংস্কৃত ভাষা এই শ্রেণীর লোকেদের মতে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সংস্কৃতের ব্যবহার উচ্চবর্ণের লোকেদের সমাজের অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথক করে দেয়। সমাজের অন্য স্তরের লোকেদের গুরুত্ব কিছু কম ছিল না, এবং তারা অন্যান্য ভাষা সুনিপুণভাবে ব্যবহার করত, সেজন্যে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতের আধিপত্য কমে যায়।

বর্ণাশ্রম প্রথাকে পরিত্যাগ করার বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও দু'হাজার বছর ধরে এই প্রথা ভারতবর্ষে চলে আসছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠনকে এই প্রথা বহুভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন উপবর্ণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গ্রামজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব আঞ্চলিক বর্ণভিত্তিক সম্পর্ক ও আনুগত্য রাজনৈতিক সম্পর্ক ও আনুগত্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বও এইজন্যে কোনোদিন প্রবল হতে পারেনি।

পরবর্তীকালের সামাজিক আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল বর্ণাশ্রম ও বৈদিক বলি-দান প্রথার বিরোধিতা। উপনিষদের দর্শন থেকে জন্ম নিয়েছিল পরবর্তীকালের অনেক নতুন দার্শনিক চিন্তাধারা। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনাঞ্চল বিনাশের ফলে এলো কৃষিভিত্তিক সমাজ। তা থেকে এলো শক্তিশালী রাজ্য। রাজ্যগুলির আয়ের উৎস ছিল কৃষি। উত্তর-ভারতের ইতিহাসে এই ধারা বয়ে চলল অনেক শতাব্দী ধরে।

এইসব ঘটনাপ্রবাহের তলে তলে চলেছিল আর্য-পূর্ব ও আর্য-সংস্কৃতির বিরাম-হীন সংঘাত। যদিও প্রথমটি কখনো জয়ী হতে না পারলেও আর্য-সংস্কৃতির রূপকে পরিবর্তন ও পরিমার্জনে সাহায্য করেছিল ঠিকই। যে ভারতবর্ষকে আজ আমরা চিনি তার ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল আর্যদের আগমন ও তাদের নতুন সংস্কৃতির প্রেরণাবলে। কিন্তু এছাড়াও আরো অনেক শক্তি ও সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে ভারত-ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হয়েছে।

* এই উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস এত প্রবল ছিল, এমন-কি গত শতাব্দীতেও ধর্মীয় সংস্কারকরা তাঁদের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে গিয়ে বেদের উক্তির সাহায্য নিয়েছেন।

৩

বিভিন্ন গণরাজ্য ও রাজ্য

প্রায় ৬০০-৩২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দ

৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাজ্য ও গণরাজ্য স্থাপনা শুরু হয়। এরপর থেকে ভারতের ঐতিহাসিক চিত্রও আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর আগে একটা শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক সংঘাত চলছিল, কেননা উপজাতি সংগঠনের সঙ্গে বিরোধ বাধছিল রাজতন্ত্রের। রাজতন্ত্র তখন একেবারে নতুন। কোনো অঞ্চলে স্থায়ী বসতি শুরু হলেই সেখানকার অধিবাসী উপজাতিগুলির একটা আলাদা ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য জন্মে যেত। জায়গাটির নামকরণও হতো সেই উপজাতির নামানুসারে। জায়গাটির ওপর নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন হতো কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের— রাজতন্ত্র বা গণরাজ্য সংগঠন।

রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হলো প্রধানত গাঙ্গেয় সমভূমিতে। আর গণরাজ্যগুলি দেখা গেল এর উত্তরদিকের অঞ্চলে— হিমালয়ের পাদদেশে ও বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অংশে। পাঞ্জাবে ছাড়া অন্যত্র গণরাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তা থেকে মনে হয়, রাজ্যগুলির আগেই গণরাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। কেননা, সমভূমির জলাজমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করার চেয়ে অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি পরিষ্কার করা ছিল সহজ। যদিও অন্যপক্ষে এও বলা যায় যে, হয়তো রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতা দেখে স্বাধীনচেতা আর্যরা পাহাড়ের দিকে উঠে আসে এবং সেখানে উপজাতিদের রীতিনীতি অনুযায়ী নতুন করে সমাজ স্থাপন করে। পাঞ্জাবে গোড়ার দিকে এরকমই ঘটেছে। বৈদিক রক্ষণশীলতা সম্পর্কে গণরাজ্যগুলির প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, গণরাজ্যের অধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে আরো পুরনো রাজনৈতিক পরম্পরাই বজায় রেখে চলছিল।

গণরাজ্যগুলি কখনো গঠিত হতো একটিমাত্র উপজাতি নিয়ে, যেমন শাক্য, কোলিয় ও মল্ল। আবার কখনো কয়েকটি উপজাতি একসঙ্গে— যেমন বৃজি ও যাদব। বৈদিক যুগের উপজাতিরাই গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং রাজতন্ত্রের চেয়ে এরাই উপজাতীয় প্রথাগুলি বেশি মেনে চলত। উপজাতি থেকে গণরাজ্যে রূপান্তরের ফলে উপজাতির মূল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি কিছুটা বদলে গেলেও প্রতিনিধি-সভার মাধ্যমে শাসনের রীতিটা বজায় ছিল। গণরাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত, তার থেকে দুটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। প্রায়শই দেখা যায় গণরাজ্যের পত্তনের গোড়াতে আছেন কোনো রাজবংশের লোক, যিনি নানাকারণে নিজের রাজ্য ছেড়ে এসেছেন। তাছাড়া, ভাই ও বোনের মধ্যে অজাচারের ফলে যে পরিবার সৃষ্টি হল, অনেক সময় তারাই নতুন গণরাজ্য স্থাপনের জন্যে দায়ী। এ থেকে দুটো জিনিস মনে হয়—এইসব কাহিনী নিশ্চয়ই আর্য-জীবনধারার একেবারে

গোড়ার দিকের, যখন অজাচার সম্পর্কে খুব সচেতন কোনো বাধানিষেধ ছিল না। অথবা বৈদিক গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণরাজ্যগুলির জন্ম। অন্তত একটি ব্রাহ্মণসূত্র থেকে এ ব্যাপারটা বোঝা যায়। সেখানে কয়েকটি গণরাজ্যীয় উপজাতিকে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রেণীচ্যুত ক্ষত্রিয় এবং শূদ্ররূপে, কেননা তারা ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান দেখানো ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি পালন করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর আরো প্রমাণ দেখা যায় গণরাজ্যগুলিতে প্রচলিত লোকাচার-ভিত্তিক পূজার রীতি থেকে। চৈত্য অথবা গাছের চারিদিকের পবিত্রভূমি, এই ধরনের উপাস্য বস্তুকে পূজা করার নিদর্শন পাওয়া যায়।

রাজতন্ত্রে উপজাতীয় আনুগত্য চলে গিয়ে ধীরে ধীরে বর্ণগত আনুগত্য দৃঢ় হলো। রাজ্যগুলির ক্রমবিস্তারের ফলে প্রতিনিধি-সভার ক্ষমতা ক্রমশ কমে এলো, কেননা দূরত্বের অসুবিধার জন্যে নিয়মিত সভা ডাকা সম্ভব হতো না। প্রতিনিধি-সভার মাধ্যমে শাসন পরিচালনা উপজাতিদের মধ্যে সম্ভব ছিল। কারণ সেখানে ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি ছিল ছোট ছোট। লক্ষণীয় যে, বৃজি সংঘরাজ্য ছিল কয়েকটি স্বাধীন ও সম-অধিকারসম্পন্ন উপজাতির মিলিত সংঘরাজ্য। সংঘবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য অটুট ছিল। রাজতন্ত্রে রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা, তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিতদের শক্তি ও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান প্রথম যুগের প্রতিনিধি-সভাগুলিকে ক্রমশ গুরুত্বহীন করে ফেলেছিল।

রাজ্যশাসনের যৌথ ব্যবস্থাই ছিল গণ বা সংঘ রাজ্যগুলির প্রধান শক্তি। শাসন-পরিচালনা হতো এইভাবে— বিভিন্ন উপজাতিগুলির প্রতিনিধি অথবা পরিবারের কর্তারা রাজধানীতে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি-সভায় মিলিত হতেন। সেখানে সভাপতির কাজ করতেন প্রতিনিধিদেরই একজন। তাঁকে বলা হতো রাজা। কিন্তু রাজার পদ বংশানুক্রমিক ছিল না এবং তাঁকে রাজা হিসেবে না দেখে বরং প্রধান হিসেবেই গণ্য করা হতো। আলোচনার বিষয় নিয়ে সভায় তর্ক-বিতর্ক চলত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে একমত না হতে পারলে ভোট নেওয়া হতো।* শাসনকাজ চালানোর দায়িত্ব ছিল কিছু কর্মচারীর ওপর, যেমন প্রধানের সহকারী, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি ইত্যাদি। বিচারব্যবস্থা ছিল কিছুটা জটিল। অপরাধীকে পরপর সাতজন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখীন হতে হতো।

রাজা এবং সভার প্রতিনিধিদের (প্রধানত ক্ষত্রিয়) হাতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধরা এইসব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেই বেশি পরিচিত ছিলেন এবং বৌদ্ধ সূত্রে অনেক সময়ই বর্ণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগে ক্ষত্রিয়দের স্থান দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণদের ওপরে। পশুপালনের বদলে কৃষিই অনেক স্থানে প্রধান জীবিকা হয়ে উঠেছিল। ভূমির মালিকানা কখনো ছিল গ্রামের সকলের যৌথভাবে, অথবা কখনো উপজাতি প্রধানের। তিনি লোক নিয়োগ করে চাষ করতেন। প্রধানদের উপার্জনের অনেকটাই আসত ভূমি থেকে।

* এই রীতি বুদ্ধদেবকেও আকৃষ্ট করে এবং বৌদ্ধ মঠগুলিতে শ্রমণদের সভার সময় বুদ্ধদেব এই রীতিরই প্রচলন করেন।

কিন্তু ভূমিই অর্থাগমের একমাত্র উৎস ছিল না। কয়েক শতাব্দী যাবৎ উত্তর-ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়। ছোট ছোট নগর পত্তন হওয়া আরম্ভ হয়, সেগুলি শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে শ্রাবস্তী, চম্পা, রাজগৃহ, অযোধ্যা, কৌশাম্বী ও কাশী গাঙ্গেয়-সমভূমির অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। এ ছাড়াও বৈশালী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা অথবা ভারুকচ্ছ (ব্রোচ) বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল আরো বিস্তৃত। যেসব গ্রামে মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ ও বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল, সেসব গ্রাম ঘিরে ছোট ছোট শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল। বিভিন্ন কারিগররা এক জায়গায় এসে বাস করতে লাগল, কেননা তাতে কাঁচামালের সরবরাহ ও শিল্পদ্রব্যের বেচাকেনার সুবিধে হত। যেমন মৃৎশিল্পের ব্যাপারে শিল্পীরা স্বভাবতই এমন একটি জায়গা খুঁজে নিল যেখানে ঠিক ধরনের মাটি পাওয়া যায়। কারিগররা একসঙ্গে থাকায় তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী ও বাজারের যোগাযোগও সুবিধাজনক হয়।

গণরাজ্যের বর্ণনা থেকে মনে হয় এই নগরকেন্দ্রগুলি গণরাজ্যের অধিবাসীদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কাহিনী আছে, বৈশালীর এক যুবক অনেক পরিশ্রম করে সুদূর তক্ষশীলায় গিয়েছিল কোনো একটি কারিগরী বিদ্যা শিখতে। শেখবার পর আবার ফিরে এসেছিল নিজের শহরে। স্বভাবতই এই বিদ্যার অর্থকরী মূল্য খুব বেশি না হলে এত কষ্ট স্বীকারের কোনো প্রশ্নই উঠত না।

গণরাজ্যগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে রাজতন্ত্রের চেয়ে বেশি উদার ছিল। প্রচলিত মতের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে সহ্য করা হতো। এইসব গণরাজ্য থেকেই উত্থান হয় দুই ধর্মীয় নেতার— যাঁরা প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বুদ্ধ এসেছিলেন শাক্য উপজাতি থেকে এবং জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের জন্ম জ্ঞাতৃক উপজাতিতে।

রাজতন্ত্র নয় বলেই এদের পক্ষে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ধারণা সম্পূর্ণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েনি। অব্রাহ্মণ ধারণাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বৌদ্ধ ধারণা, যাকে 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের সবচেয়ে প্রথম বিবরণ বলা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে আদিমকালে পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। কোনো কিছুর অভাব না থাকায় মানুষের লোভ বা আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু হল। এলো পরিসর, এবং তার সঙ্গে এলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা। শুরু হল বিবাদ ও সংঘর্ষ। অতএব আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শক্তির প্রয়োজন হল। স্থির হল, কোনো একজন মানুষকে নেতা নির্বাচন করা হবে, তিনিই হবেন শাসনকর্তা ও বিচারক। তাঁকে বলা হতো 'মহাসম্মত'। জমির উৎপাদনের একাংশ তাঁকে দেওয়া হতো পারিশ্রমিক হিসেবে। এই মতবাদের সঙ্গে গণরাজ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্য আছে।

সাধারণভাবে গণরাজ্য-শাসিত অঞ্চলগুলি গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম গোঁড়া ছিল। বারংবার আক্রমণ সত্ত্বেও উপজাতীয় গণরাজ্যগুলি খ্রীস্টীয় চতুর্থ

শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এইসব অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। এখানেই গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ ইত্যাদি বিদেশী আক্রমণকারীরা একে একে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল।

রাজতন্ত্র বা গণরাজ্যগুলি এক-এক সময় নিজেদের রাজনৈতিক গঠন বদল করেছে, এমনও দেখা গেছে। যেমন, কম্বোজ রাজ্য রাজতন্ত্র থেকে গণরাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে গাঙ্গেয় সমভূমির রাজতন্ত্রগুলিতে এরকম রূপান্তর ছিল দুর্লভ। উপজাতি সংস্কৃতির ক্ষয় এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরতার ফলে রাজতন্ত্রেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

ওই যুগের সাহিত্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে বারাণসী অঞ্চলের কাশীরাজ্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এর গৌরবের কাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। প্রথমে কোশল ও পরে মগধরাজ্য সমভূমি অঞ্চলের কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। নদীর ওপর দিয়েই ছিল গাঙ্গেয় সমভূমির বাণিজ্যপথ এবং সেই কারণে সমভূমি কর্তৃত্বের অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বেশি ছিল। শেষপর্যন্ত মাত্র চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য অবশিষ্ট রইল— কাশীরাজ্য, কোশলরাজ্য (কাশীরাজ্যের নিকটস্থ), মগধ (বর্তমান দক্ষিণ-বিহার) ও বৃজিদের গণরাজ্য (নেপালের জনকপুর ও বিহারের মজঃফরপুর জেলা)।

ইতিমধ্যে রাজসিংহাসনের অধিকার বংশানুক্রমিক হয়ে উঠল, আর রাজারা বেশির ভাগই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে অন্যবর্ণের লোকেরাও রাজা হয়েছেন, এমন নজির আছে। রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ এ সময়ে সর্বস্বীকৃত ধারণা ছিল। এই ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্যে রাজারা মাঝেমাঝেই আনুষ্ঠানিক বলিদানের ব্যবস্থা করতেন। রাজ্যাভিষেকের পর রাজারা একবছর ধরে রাজসূয় যজ্ঞ চালাতেন। তার দ্বারা পুরোহিতরা তাঁদের মন্ত্রপূত ক্ষমতার মাধ্যমে রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করতেন। এই প্রতীকী অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে রাজা পবিত্র হয়ে উঠতেন ও দেবত্বশক্তিযুক্ত মনুষ্যে রূপান্তরিত হতেন। বছরের শেষে রাজা তাঁর মন্ত্রী, পরিবারের লোকজন ও প্রজাদের কোনো কোনো অংশকে বারোটি মূল্যবান রত্ন দান করতেন তাদের আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে। এই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি হতো আবার কয়েক বছর পরে, যাতে যজ্ঞের সাহায্যে রাজা পুনর্যৌবন পান।

বিভিন্ন রকমের যজ্ঞের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল অশ্বমেধ। একটি ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হতো তার ইচ্ছেমতো বিচরণ করার জন্যে। আর রাজা তার ঘুরে-আসা সমস্ত অঞ্চলের ওপর নিজের অধিকার দাবি করতেন। কিন্তু এই অশ্বমেধ যজ্ঞ শাস্ত্রমতে কেবল পরম শক্তিশালী রাজাদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও অনেক ছোট ছোট রাজাও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন এবং নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে ঘোড়ার ভ্রমণপথ নিশ্চয়ই তাঁরা সুবিধেমতো নিয়ন্ত্রিত করতেন। যজ্ঞ হতো বিরাট আকারে এবং বহু পশুর প্রয়োজন হতো। দলে দলে পুরোহিতরা যজ্ঞের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন। সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর ধরে যজ্ঞের জাঁকজমকের গল্প

করত। সন্দেহ নেই, এসবের ফলে সমালোচকরাও স্তিমিত হয়ে পড়ত এবং অপরদিকে দেবতাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগের কথাটাও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়াতো। পুরোহিতরাও সাধারণ মানুষ হিসাবে গণ্য হতেন না, কেননা তাঁরাই ছিলেন রাজার সঙ্গে দেবলোকের যোগাযোগের সেতু। এইভাবেই রাজা ও পুরোহিত একজোট হয়ে নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করতে লাগলেন।

কাশী, কোশল, মগধ ও বৃজি রাজ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম চলল প্রায় ১০০ বছর ধরে। শেষপর্যন্ত জয় হল মগধের। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতের রাজনীতির মূলকেন্দ্র হয়ে রইল এই মগধ। মগধের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষ। একটি বড় রাজ্য যদি নদীপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে তার গুরুত্ব ও সম্ভাবনা কি হতে পারে তা তিনি বুঝেছিলেন এবং মগধকে গড়ে তুলেছিলেন সেভাবেই। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিম্বিসারের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। কোশল ও বৈশালীর রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক যোগাযোগ তাঁর সম্প্রসারণবাদী নীতির পক্ষে সুবিধাজনক হল। এইভাবে নিজের রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে অঙ্গরাজ্য জয়ে বেরোলেন। অঙ্গ গাঙ্গেয় বদ্বীপের সামুদ্রিক বন্দরগুলি নিয়ন্ত্রণ করত এবং তার সঙ্গে বর্মা ও পূর্ব-ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ফলে অঙ্গ মগধরাজ্যের মূল্যবান অর্থনৈতিক সহায়ক হয়ে উঠল।

ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বিম্বিসারই প্রথম দক্ষ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন বাছা বাছা লোক এবং বিম্বিসার কখনোই তাঁদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতেন না। কাজ অনুযায়ী কর্মচারীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন হল। উত্তম শাসনের পক্ষে ভালো রাস্তাঘাটের গুরুত্ব স্বীকৃত হল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ছিল গ্রাম। সরকারি কর্মচারীদের ওপর ভার ছিল কৃষিজমি জরিপ করে ফসলের পরিমাপ হিসাব করা। গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল কর আদায়ের এবং সরকারি কর্মচারীরা করের অর্থ নিয়ে আসত রাজকোষে। বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলির চারদিকে ছিল মাঠ ও পশুচারণভূমি। তার বাইরে ছিল পোড়োজমি ও জঙ্গল। কেবলমাত্র রাজার অনুমতি নিয়েই জঙ্গল কেটে চাষ করা চলত, কেননা জঙ্গলগুলি ছিল রাজকীয় সম্পত্তি। চাষের জমিতেও রাজার অধিকার ছিল বলে ধরে নেওয়া হতো। তাই ফসলের কিছু অংশ (সাধারণত এক-ষষ্ঠাংশ) রাজা পেতেন কর হিসেবে। জমিতে চাষ করত শূদ্র চাষীরা। তবে ব্যক্তিগত মালিকানার যেসব অল্প জমি ছিল, সেগুলির চাষের জন্যে লোক ভাড়া করে আনা হতো। রাজাকে যখন রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে ধরা হল, তাঁকে রাজ্যের ভূস্বামী বলেও গণ্য করা হতো। ক্রমশ রাজা ও রাজ্য এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে এলো এবং জমিতে রাজার অধিকার নিয়ে বিশেষ কোনো আপত্তিও উঠত না।

কৃষির উন্নতি নির্ভর করত শূদ্র চাষীদের ওপর, কেননা তারাই জঙ্গল সাফ করত।

কিন্তু এদের অনেকেই ভূমিহীন চাষী ছিল বলে তাদের সম্মান ক্রমশ কমে আসছিল। এই সময়ে শূদ্রদের চেয়েও নীচ শ্রেণীতে ফেলা হয়েছিল কিছু মানুষকে। তারা হল অস্পৃশ্য। সম্ভবত এই আদিবাসী জাতিরা আর্যদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে রাজ্যের সীমান্তদেশে বিতাড়িত হয়েছিল, যেখানে তারা শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করত। তাদের ভাষার সঙ্গে আর্যদের ভাষার কোনো মিল ছিল না। এদের প্রধান কাজ ছিল শিকার ও বেতের কাজ — যেগুলিকে অত্যন্ত হীন দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল।

খ্রীস্টপূর্ব ৪৯৩ সালে বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রু রাজা হবার আগ্রহে অধৈর্য হয়ে নিজের পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসলেন। সামরিক অভিযান করে তিনিও পিতার মতোই রাজ্যের পরিধি বাড়াতে উৎসাহী ছিলেন। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। শহরটি যে কেবল সুন্দরই ছিল তাই নয়, এর চারিদিকে পাঁচটি পাহাড় থাকার ফলে রাজধানীর স্বাভাবিক সুরক্ষার ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। রাজধানীকে আরো সুরক্ষিত করবার জন্যে অজাতশত্রু গঙ্গার কাছে পাটলিগ্রামে একটি ছোট দুর্গ তৈরি করলেন। পরবর্তীকালে এটিই সেই বিখ্যাত মৌর্য শহর পাটলিপুত্র নামে পরিচিত হল। বিম্বিসার জয় করেছিলেন পূর্বদিকের রাজ্য অঙ্গ। অজাতশত্রু অভিযান শুরু করলেন উত্তর ও পশ্চিম দিকে। কোশলের রাজা ছিলেন অজাতশত্রুর মামা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোশলকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেললেন। পশ্চিমদিকের এই অভিযান চললো কাশীরাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত। বৃজি রাজ্যসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এবং অজাতশত্রুর মন্ত্রীরা রাজ্যসমূহের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।* শেষপর্যন্ত জয় হল মগধেরই এবং পূর্ব-ভারতে মগধই হল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। বিম্বিসারের স্বপ্ন সার্থক হল। মগধের জয় হল প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রেরই জয় এবং রাজতন্ত্র এইভাবে গাঙ্গেয় সমভূমিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসল।

কেবল বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলেই যে মগধের উত্থান সম্ভব হয়েছিল তা নয়, কেননা এঁদের পরবর্তী দুর্বল রাজাদের শাসনকালেও মগধ শক্তিশালী ছিল। মগধরাজ্যের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। নদীপথ নিয়ন্ত্রণে থাকায় নদী-বাণিজ্য থেকে নিয়মিত কর আদায়ও সম্ভব ছিল। অঙ্গ জয়ের পরে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যোগ হল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং তা ছিল রীতিমতো লাভজনক। মগধরাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকেও সৌভাগ্যশালী ছিল। জমি ছিল উর্বর, জঙ্গল থেকে সৈন্যবাহিনী পেত হাতি, আর জঙ্গলের কাঠ বাড়িঘর তৈরির কাজে

* এই যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দুটি নতুন অস্ত্রের উল্লেখ আছে এবং সেগুলি মগধের সামরিক শক্তিতে অভিনব সংযোজন ছিল। এগুলির একটি ছিল 'মহাশিলা কণ্টক'— বড় বড় পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করবার জন্যে একটি গুলতির মতো বৃহৎ যন্ত্র। অপরটি ছিল 'রথমুষল'— ধারালো ছুরি ও অন্যান্য ছুঁচলো জিনিস লাগানো রথবিশেষ। সারথি নিজে আবৃত স্থানে নিরাপদে লুকিয়ে বিপক্ষ যোদ্ধাদের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে দিয়ে অনায়াসেই ঘাস কাটার মতো তাদের শেষ করে দিতে পারত।

আসত। মাটির নিচের লোহার খনি থেকে লোহা নিয়ে একদিকে যেমন উন্নত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে লোহার বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও যথেষ্ট অর্থাগম হতো।

অজাতশত্রুর মৃত্যু হল খ্রীস্টপূর্ব ৪৬১ সালে। তাঁর পূর্বের পাঁচজন রাজাই পিতৃহন্তা বা নিকট আত্মীয়দের ঘাতক ছিলেন বলে শোনা যায়। এইসব দেখে উত্ত্যক্ত হয়ে মগধের লোকেরা এই পাঁচ রাজার সর্বশেষ রাজাকে খ্রীস্টপূর্ব ৪১৩ সালে রাজ্যচ্যুত করল এবং তাঁর জায়গায় শিশুনাগ নামে একজনকে রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। শিশুনাগ বংশের শাসন চলল মাত্র অর্ধশতাব্দী এবং এই বংশের উচ্ছেদ ঘটল মহাপদ্ম নন্দের হাতে। তাঁর বংশের শাসনও ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং তাঁর অবসান ঘটল খ্রীস্টপূর্ব ৩২১ সালে। রাজবংশের এইসব দ্রুত পরিবর্তন ও দুর্বল রাজাদের শাসন সত্ত্বেও মগধ বাইরের সমস্ত আক্রমণ (যেমন, অবন্তী রাজ্যের আক্রমণ) প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং গাঙ্গেয় সমভূমির অগ্রগণ্য রাজ্য হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল।

শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদকারী নন্দদের জন্ম নাকি নিচু বংশে। অনেকের মতে, নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম ছিলেন শূদ্রানী মায়ের সন্তান। আবার অনেকের মতে, মহাপদ্মের বাবা ছিলেন নাপিত ও মা ছিলেন রাজসভার নর্তকী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নন্দবংশই অক্ষত্রিয় রাজবংশদের মধ্যে প্রথম। এর পর থেকে ভারতের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রাজবংশই অক্ষত্রিয় ছিল এবং এ অবস্থা চলেছিল এক হাজার বছর পরে রাজপুত রাজবংশগুলির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এযুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, ধর্মীয় গুরুরা অনেকেই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত ছিলেন অথচ কয়েকজন রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রম ধর্মের এই মিশ্রণ লক্ষণীয়।

নন্দরাজাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাঁরাই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্য নির্মাতা। মগধরাজ্য আগেই বেশ বড় ছিল। নন্দরাজারা রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন আরো দূরে। রাজ্যজয়ের জন্যে তাঁরা এক বিরাট সেনাদল গঠন করেছিলেন। গ্রীক লেখকরা সামরিক শক্তির যে হিসেব দিয়েছেন তা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়, যার পরিসংখ্যান হল— ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ২ হাজার রথ ও ৩ হাজার হাতি। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ শেষ হয়ে গিয়েছিল পাঞ্জাবেই। অতএব নন্দরাজাদের এই বিপুল সামরিক শক্তি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

রাজ্যের স্থিতি ও শক্তির তার একটি উৎস ছিল জমির খাজনা। খাজনাই রাজকোষের অর্থাগমের প্রধান উৎস ছিল। জমি ছিল উর্বরা, প্রচুর ফসল হতো, অতএব খাজনাও ছিল যথেষ্ট। নন্দরাজারা নিয়মিত ও সুচারুরূপে খাজনা আদায়ের জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। রাজকোষে ক্রমাগত অর্থাগমের ফলে নন্দরাজাদের ধনসম্পদের কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজারা অনেক খাল কাটিয়েছিলেন ও ভালো জলসেচেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে এমন একটা সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা ভারতীয়দের

মনে উদিত হল যার অর্থনৈতিক গঠন কৃষিভিত্তিক। কিন্তু নন্দরাজবংশের সমাপ্তি ঘটল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে এক ভাগ্যান্বেষী যুবকের হাতে। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দখল করলেন খ্রীস্টপূর্ব ৩২১ সালে। সুতরাং মৌর্যদের শাসনকালেই সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্পষ্টরূপ পেল।

এবার ফিরে যাওয়া যাক উত্তর-পশ্চিম ভারতে। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বাকি অংশ থেকে এই অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বরং পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেই এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটি ছিল পারস্যের আকিমেনিড (Achaemenid) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৫৩০ সালের কাছাকাছি পারস্যের আকিমেনিড সম্রাট সাইরাস হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কাম্বোজ, গান্ধার অঞ্চলের উপজাতিদের কাছ থেকে উপঢৌকন আদায় করে যান।

হেরোডোটাস লিখেছেন, গান্ধার ছিল পারস্যের বিংশতিতম প্রদেশ এবং এটি ছিল আকিমেনিড সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল ও সম্পদশালী প্রদেশগুলির অন্যতম। ভারতীয় প্রদেশগুলি থেকে ভাড়াটে সৈনিকরা গিয়ে পারস্য সৈন্যদলের হয়ে গ্রীকদের সঙ্গে লড়াই করেছিল খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৬-৪৬৫ সালে। এদের বর্ণনা দিতে গিয়ে হেরোডোটাস লিখেছেন, এরা সুতির পোশাক পরত ও নলখাগড়ার ধনুক, বর্শা ও লোহার ফলা লাগানো বেতের তীর দিয়ে যুদ্ধ করত। পারস্য রাজদরবারে একজন গ্রীক চিকিৎসক থেসিয়াস খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধের উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এর কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুই কল্পনাপ্রসূত। যেমন বাঘের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> বাঘের মুখের ভেতরে প্রতি পাটিতে তিনসারি করে দাঁত আছে। আর ল্যাজের প্রান্তে আছে হুল। কাছাকাছি লড়াইয়ের সময় বাঘ ওই হুল ব্যবহার করে এবং দূর থেকেও অন্য পশুর দিকে ওই হুল ছুঁড়ে দিতে পারে ঠিক যেমন তীরন্দাজ তীর ছোঁড়ে।[১]

গান্ধারের রাজধানী ছিল বিখ্যাত শহর তক্ষশিলা। গ্রীকরা বলত তক্শিলা। এখানে বৈদিক জ্ঞান ও ইরানের শিক্ষাদীক্ষার সমন্বয় হয়েছিল। পারস্যের অধীনস্থ অঞ্চল বলে অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ এই অঞ্চলকে অপবিত্র বলে মনে করতেন। কিন্তু পারস্যের নানা চিন্তার ছাপ দেখা যায় ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। পারস্যের সিগলোই-ধরনের মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রা তৈরি হতে লাগল। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের শিলালিপির প্রেরণা সম্ভবত পারস্যসম্রাট দারিয়ুসের শিলালিপি থেকেই এসেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লিপি খরোষ্ঠী, সম্ভবত পারস্যে ব্যবহৃত লিপি অ্যারামাইক থেকেই নেওয়া। ভারত ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের আরো বড় ঘটনা ঘটল কয়েক শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সময়। প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গিয়ে পড়ল পারস্যের দার্শনিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ওপর—বিশেষত ম্যানিকিয়ান বিশ্বাসের

ওপর এর প্রভাব লক্ষণীয়। আবার পরে পারস্যের জরথুস্ত্র মতবাদের প্রভাব পড়ল বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার ওপর। প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৩৩০ সাল নাগাদ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের পারস্যজয়ের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর পারস্যের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটল। অল্পদিন পরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতও আলেকজাণ্ডারের সেনাদলের কাছে পরাজিত হল।

খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ সালে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার দারিয়ুসের রাজ্য জয় করে আকিমেনিড সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রদেশগুলিতে প্রবেশ করলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-অভিযান চলল প্রায় দু'বছর ধরে। কিন্তু ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর গ্রীক অভিযানের কোনো প্রভাবই পড়ল না। প্রাচীনতম কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিক সূত্রের মধ্যে কোথাও আলেকজাণ্ডারের উল্লেখই খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, গ্রীকরা যেমন দ্রুত এসেছিল, তাদের প্রস্থানও হয় তেমনি দ্রুত। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এলেন দারিয়ুসের সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তে পৌঁছনোর উদ্দেশ্য নিয়ে। তাছাড়া গ্রীক-ভূগোলবিদ্‌রা মহাসাগরের সমস্যাটারও একটা সমাধান খুঁজেছিলেন। অর্থাৎ, মহাসাগরের বিস্তার ঠিক কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত তা তাঁরা জানতে চাইছিলেন। এছাড়াও ভারতবর্ষের মতো একটি ঐশ্বর্যশালী দেশের নাম তাঁর বিজিত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাও আলেকজাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী অতিক্রম করে তাঁর অভিযান শেষ হয়ে গেল। কেননা, পঞ্চম নদী পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর সেনাবাহিনী অস্ত্র রেখে বেঁকে দাঁড়ালো— আর অগ্রসর হতে চাইল না। এরপর স্থির করলেন, সিন্ধুনদের উপকূল দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছবেন ও সেখান থেকে ব্যাবিলনে ফিরে যাবেন। সৈন্যবাহিনীর একাংশ যায় পারস্য উপসাগর দিয়ে সমুদ্রপথে ও বাকি অংশ উপকূল অঞ্চল দিয়ে স্থলপথে। আলেকজাণ্ডারকে এই অভিযানের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর মধ্যে হাইদাসপেসের যুদ্ধ বিখ্যাত— যেখানে আলেকজাণ্ডারকে ঝিলাম অঞ্চলের রাজা পুরুর সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও অসংখ্য উপজাতি গোষ্ঠীকে দমন করতে হয়েছিল— তাদের মধ্যে কিছু রাজতন্ত্র, কিছু ছিল প্রজাতন্ত্র। তারপর মাল্লোইদের দ্বারা আলেকজাণ্ডার আহত হবার পর গ্রীকরা স্থানীয় উপজাতীয়দের ওপর প্রতিশোধ নিল। সিন্ধু অঞ্চলে সমগ্র অভিযানের সময়ই সৈন্যদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। বিজিত ভারতীয় অঞ্চলগুলি শাসন করার জন্যে আলেকজাণ্ডার গ্রীক শাসনকর্তা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটলে শাসনকর্তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদেশে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাব পড়েনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আগত গ্রীকদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বিবরণ রেখে গেছেন। ওই সময়কার ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখনো অনেক অনার্য রীতিনীতির প্রচলন ছিল। খাঁটি আর্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটেছিল পূর্বদিকে। ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের

সঙ্গে বিদেশীদের অবাধ যোগাযোগ ঘটল। বিদেশীদের আর্যরা অপবিত্র (ম্লেচ্ছ) বলে মনে করত। গণরাজ্য সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ দেখে মনে হয়, মগধের সাম্রাজ্য বিস্তার সত্ত্বেও কিছু কিছু অঞ্চলে তখনও গণরাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

কিন্তু গ্রীক বিবরণে অনেক সময় কল্পনার অবাধ বিস্তার চোখে পড়ে, যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হওয়ার ফলে কল্পনার কিছুটা সংশোধন হয়েছিল। এইসব বর্ণনার মধ্যে আছে সত্য ও কল্পনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনানায়ক নিয়ারকাস (Nearchus) ভারতীয়দের পোশাকের কিছু বর্ণনা দিয়ে গেছেন:

> গাছে জন্মানো তুলো থেকে ভারতীয়রা পোশাক তৈরি করে। কিন্তু অন্য সমস্ত জায়গার তুলোর চেয়ে এই তুলো অনেক বেশি শাদা। অথবা ভারতীয়দের গায়ের কালো রঙের জন্যে তাদের পোশাক এত উজ্জ্বল শাদা বলে মনে হয়। নিম্নাঙ্গে তারা সুতোর যে পোশাক পরে তা হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে আসে। ওপরের পোশাক কিছুটা কাঁধের উপর ঝোলানো ও খানিকটা মাথার চারদিকে জড়ানো থাকে। ধনী ভারতীয়রা হাতির দাঁতের তৈরি কানের গহনাও ব্যবহার করে। রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে ছাতার ব্যবহার হয়। শাদা চামড়ার জুতোয় নানারকম কারুকার্য থাকে, এবং পায়ের নিচের চামড়ায় চিত্র-বিচিত্র করা থাকে। তা ছাড়া নিচেটা এত পুরু যে জুতো পরলে লোকদের লম্বা দেখায়।[২]

এ ছাড়া উদ্ভট কাল্পনিক বিবরণের নমুনা আছে:

> ···এক ধরনের মানুষের কথা শোনা যায় যা দশফুট লম্বা ও ছ'ফুট মোটা। এদের অনেকের নাক নেই। তার বদলে মুখের উপর দুটো ফুটো আছে। অনেক মানুষ আছে যারা কানের মধ্য দিয়ে ঘুমোয়। তা ছাড়া এক ধরনের মানুষের কথা শোনা যায় যাদের মুখই নেই। এরা খুব শান্ত স্বভাবের লোক। এদের বাস গঙ্গানদীর উৎস অঞ্চলে। বাষ্প থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টির মতো তাম্রপাত হতে থাকে।[৩]

পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার বেশ কয়েকটি গ্রীক বসতি স্থাপন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনোটিই শহর হয়ে উঠতে পারে নি। কেননা, গ্রীকরা নিজেরাই কাছাকাছি শহরগুলিতে চলে গিয়েছিল বা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভবঘুরে গ্রীকদের দলে মিশে গিয়েছিল। গ্রীক সেনাবাহিনী গ্রীস থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম এশিয়া ও ইরান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। এইভাবে কিছু নতুন বাণিজ্য-পথ সৃষ্টি হল এবং পুরনো পথগুলোও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। এই পথগুলি উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আফগানিস্তান ও ইরান হয়ে এশিয়া মাইনরে গিয়ে পৌঁছল। কয়েকটি পথ গেল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলির দিকে। এইসব বাণিজ্যপথের সাহায্যে ও ভারতের গ্রীক অধিবাসীদের আগ্রহে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট ছোট রাজতন্ত্র ও গণরাজ্য-

গুলির উচ্ছেদ হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের হাতে। তাঁর প্রস্থানের পর এইসব অঞ্চলে একটা রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন ও এই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

উত্তর ভারতের ষোলটি প্রধান রাজ্য
৬০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনার ফলে শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চলের বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হয়ে উত্তরাঞ্চলের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের আর একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হল। উত্তর-দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের এই সময়কালের স্তর থেকে খুঁড়ে পাওয়া গাঙ্গেয়

উপত্যকার বিশিষ্ট কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র * ও লোহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখে মনে হয়, এই অঞ্চলের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। অবশ্য প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল গঙ্গানদীর তীর দিয়ে— রাজগৃহ থেকে (এলাহাবাদের কাছে) কৌশাম্বী পর্যন্ত। তারপর উজ্জয়িনী হয়ে ব্রোচ পর্যন্ত। পশ্চিমের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের জন্যে প্রধান বন্দর ব্রোচ। এ ছাড়া কৌশাম্বী থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা দিয়ে উত্তরে গিয়ে তারপর পাঞ্জাব পেরিয়ে তক্ষশিলা পর্যন্ত আর একটি পথ ছিল। স্থলপথে পশ্চিমদিকের বাণিজ্যের দ্বারপথ ছিল এটাই। পূর্বদিকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল দিয়ে উত্তর-বর্মার তীরভূমি ও দাক্ষিণদিকে পূর্ব-উপকূল ধরেও বাণিজ্যপথের বিস্তার ছিল।

শহরের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদেরও সংখ্যা বেড়ে গেল। এরা সবাই সমবায় সংঘের বা 'শ্রেণী'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক-একটি 'শ্রেণী' শহরের এক-একটি বিশেষ অংশে বাস করত। ফলে এদের নিজেদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত ও এরা এক-একটি উপবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে তার বাপের পেশাই পুরুষানুক্রমে গ্রহণ করত। এই যুগের সমবায় সংঘগুলি অবশ্য ততটা উন্নত হয় নি যতটা পরে, প্রথম কয়েক খ্রীস্টাব্দ বাণিজ্যিক সংঘগুলি হয়েছিল। দেশের এক-একটি অঞ্চলে এক-একটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো ও গোটা দেশেই সেগুলি বিক্রি হতো— যেমন, উত্তরাঞ্চলের কালো পালিশকরা মৃৎপাত্র। মুদ্রাব্যবহার আরম্ভ হবার পর থেকে ব্যবসার সুবিধে হয়েছিল। রুপো ও তামা দিয়ে মুদ্রা তৈরি হতো ও তার মধ্যে ছিদ্র করা থাকত। ছাঁচে ঢালা তামার মুদ্রাও পাওয়া গেছে। সুদে টাকা ধার দেওয়ার রীতি ছিল— তবে সুদের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা চলত দূর-দূরান্তরে আর সাধারণ জিনিস বিক্রি হতো স্থানীয়-বাজারে।

লিপির ব্যবহার ক্রমশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, হয়তো বাণিজ্যের বিস্তার এর জন্যে কিছুটা দায়ী। ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপির নমুনা এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে লিপির ব্যবহারের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এই সময় সংস্কৃত থেকে আরো অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি ঘটল। মূল-সংস্কৃত ভাষা ক্রমশ কেবল ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া সংস্কৃতের সীমিত ব্যবহার ছিল ঘোষণাপত্র, সরকারি দলিলপত্র ও বৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতেও। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার একটা জনপ্রিয় সংস্করণের প্রচলন ছিল, তার নাম প্রাকৃত। এরও আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের সংস্করণের নাম ছিল 'সৌরসেনী' ও পূর্বাঞ্চলের সংস্করণের নাম ছিল 'মাগধী'। সংস্কৃতের ওপর ভিত্তি করে আর একটি ভাষা প্রচলিত ছিল— পালি। এটিও ঐসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। বুদ্ধদেব যখন তাঁর শিক্ষা প্রচার করতে চাইলেন তখন বৃহত্তর

* উত্তরাঞ্চলের কালো পালিশকরা মৃৎপাত্র (যাকে N. B. P. বলা হয়) এই সময়কার সবচেয়ে উন্নত মৃৎপাত্র ছিল। রঙ ছিল কখনো কুচকুচে কালো, কখনো ধূসর, কিংবা ইস্পাতনীল। এর দ্বারা মৃৎপাত্রগুলিতে একটা আলাদা জৌলুস্ আসত। তবে এই শৌখিন পালিশ থাকত প্রধানত ছোট ছোট বাটি ও ছোট পাত্রে।

জনসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন মাগধী ভাষা।

শহরের বিস্তার, কারিগরদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার— এই সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ ছিল আর-একটি বিষয়ের সঙ্গে। তা হল ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা। শহরে নূতন ও পুরাতনের যে সংঘাত দেখা দিল, তা এই পরিবর্তনকে দ্রুততর করে তুলেছিল। এর মধ্য দিয়ে মানসিক সজীবতা ও মৌলিক চিন্তাধারার যে প্রাচুর্য দেখা গেল, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তার এত বেশি নিদর্শন মেলে না। আগের যুগের তপস্বী ও ভ্রাম্যমাণ তার্কিকের দল নতুন নতুন চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। নিমিত্তবাদ থেকে জড়বাদ সবই এই ভাবনার পরিধিভুক্ত ছিল। অজীবক নামে একদল দার্শনিক ছিলেন, যাঁদের বিশ্বাস ছিল, আগে থেকেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু স্থির হয়ে আছে। মানুষের সামান্যতম কাজকর্ম ও ব্যবহারও নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট এবং কিছুতেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীরা অজীবক বলে পরিচিত হতেন। তপস্যা করেই তাঁরা জীবন কাটাতেন। এ ছাড়া অনেক নিরীশ্বরবাদী গোষ্ঠীও ছিলেন। এঁদের মধ্যে চার্বাকরা সম্পূর্ণ জড়বাদ প্রচার করতেন। মানুষ এসেছে ধূলিকণা থেকে এবং তাকে ফিরেও যেতে হবে ধূলিকণাতেই। অজিত কেশ-কম্বলিন মানুষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন :

> মানুষ চারটি মূল পদার্থ দিয়ে তৈরি। মৃত্যুর পর মাটি চলে যায় মাটিতে। জল চলে যায় জলে। আগুন মেশে আগুনে। বায়ু উড়ে যায় বায়ুতে। আর তার চেতনা বিলীন হয় মহাশূন্যে। চারজন শববাহক মৃতদেহ নিয়ে যায় শ্মশানে। শববাহকরা যতক্ষণ গল্প করতে থাকে ততক্ষণে মানুষটির হাড়গুলি পুড়ে বন-কপোতের ডানার রঙ পায়। তার জীবনের সমস্ত দাগের হিসেব পুড়ে ছাই হয়। যারা ভিক্ষাদানের উপদেশ দেয় তারা নির্বোধ। যারা দেহোত্তর অস্তিত্বের কথা বলে, তারা মিথ্যা বাক্বিস্তার করে। শরীরের যখন মৃত্যু হয়, মূর্খ আর জ্ঞানী সকলেই সমানভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর কিছু বাকি থাকে না।[৪]

এইসব গোষ্ঠীদের খুব সুনজরে দেখা হতো না এবং প্রাচীনপন্থীরা এদের সম্পর্কে গর্হিত ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ করতেন। ব্রাহ্মণদেরই রাগ ছিল বেশি, কেননা জড়বাদীরা পুরোহিতদের অর্থহীন অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আপত্তি তুলতেন। অথচ এই অনুষ্ঠানগুলির ওপর পুরোহিতদের জীবিকার্জন নির্ভর করত। প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী দর্শন সম্পর্কে ভালোভাবে জানা কঠিন, কেননা পুরোহিতদের লেখায় এই দর্শনের প্রকৃত চেহারা এতটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল— ভারতীয় দর্শন মোটামুটিভাবে জড়বাদকে পাশ কাটিয়েই এসেছে।

এই সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে টিকে রইল কেবল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। জৈন ধ্যান-ধারণার প্রচার চলছিল খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে মহাবীর সেগুলিকে একটা স্পষ্টরূপ দিলেন। ('জৈন' শব্দটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে, অর্থাৎ বিজেতা। এখানে বিজেতা মানে মহাবীর।) মহাবীর তাঁর ৩০ বছর বয়সে (সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ৫১০ সালে) সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ

করলেন। বারো বছর ধরে নানা জায়গায় সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর পর তাঁর পরম উপলব্ধি ঘটল। তাঁর উপদেশের প্রচার গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসার ঘটল (ঐ অঞ্চলে এখন ২০ লক্ষ জৈনধর্মাবলম্বী আছেন)। এ ছাড়াও এ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে উত্তর-ভারতের কিছু অংশ ও দক্ষিণ-ভারতের মহীশূরে।

জৈনধর্মের উপদেশাবলী প্রথমদিকে মৌখিক পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হচ্ছিল। তার-পর খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হল। শেষপর্যন্ত খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উপদেশাবলীর সর্বশেষ সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। জৈনধর্ম নিরীশ্বরবাদী। এই মতবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। এই মতবাদ অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াবলাপ এক শাশ্বত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এবং উত্থান ও পতনের মহাজাগতিক তরঙ্গের আসাযাওয়া চলেছে নিরন্তরভাবে। জগতের সমস্ত কিছুরই একটি আত্মা আছে। আত্মাকে পবিত্র করে তোলাই হল জীবনের উদ্দেশ্য। পবিত্র আত্মা দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরম সুখের জগতে বাস করে। উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আত্মার পবিত্রতা আসে, জৈন মতবাদে তা স্বীকার করা হয় না; কেননা জ্ঞান হল একটি আপেক্ষিক গুণ। এ প্রসঙ্গে ছয় অন্ধের হস্তীদর্শনের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো অন্ধ বলল, সে হাতি ছোঁয় নি ছুঁয়েছে একটি দড়ি। আর-একজন বলল, সে ছুঁয়েছে একটা সাপ। আর-একজনের ধারণা, সে ছুঁয়েছে একটা গাছের গুঁড়ি। প্রত্যেক মানুষই সামগ্রিক জ্ঞানের অংশমাত্রের পরিচয় পায়, অতএব মুক্তির জন্যে জ্ঞানের পথ নির্ভরযোগ্য নয়। সুসমঞ্জস জীবনযাত্রার মধ্যেই আত্মা পবিত্র হয়ে উঠবে— এই হল জৈনদের বিশ্বাস। কিন্তু মহাবীরের মতে, একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেই কেবল সেই সুসমঞ্জস জীবনযাপন সম্ভব। অহিংসাকে এতদূর গুরুত্ব দেওয়া হল যে, অজ্ঞাতসারে একটি পিঁপড়েকে মাড়িয়ে দিলেও তাকে পাপ বলে গণ্য করা হতো। অহিংসা জৈনদের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এমনকি জৈনরা মসলিন কাপড়ের একটা মুখোশ পরে মুখ ও নাক ঢেকে রাখে যাতে ভুল-ক্রমেও কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট শ্বাসের সঙ্গে ঢুকে বিনষ্ট না হয়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করল। কিন্তু কৃষিজীবীদের পক্ষে জৈন-ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হল না, কেননা অহিংসার ওপর অত জোর দিলে চাষের সময়ও কীটপতঙ্গ মারা চলত না। যাদের অনপ্রাণীর জীবন বিপন্নকারী পেশা, জৈনধর্মে তাদেরও কোনো স্থান ছিল না। সুতরাং জৈনধর্মের লোকদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পেশা হিসেবে নেওয়াই সম্ভব ছিল। তা ছাড়া এই ধর্মে মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দেবার ফলে ব্যবসায়ীদের এর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে খুব কড়াকড়ি ছিল জৈনধর্মে। কিন্তু জৈনরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থে জমিজমা বোঝাতো। ক্রমশ জৈনরা উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের বিনিময়ের ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠল। তা ছাড়া কেউ কেউ দালালীর কাজও করত। এইভাবে শহর-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে জৈনধর্মের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। পশ্চিম উপকূলে নৌ-

বাণিজ্যের সুবিধে ছিল। জৈনদের কেউ কেউ মহাজনী কারবার শুরু করল, আবার কেউ কেউ পণ্যদ্রব্য নিয়ে সাগরপাড়ি দিল।

মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ, দু'জনে ছিলেন সমসাময়িক। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রচারক হিসেবে বুদ্ধদেবেরই খ্যাতি বেশি। সারা এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মই প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ালো। বুদ্ধ (আক্ষরিক অর্থে জ্ঞানপ্রাপ্ত) এসেছিলেন শাক্য উপজাতীয় গণরাজ্য থেকে। তাঁর বাবা ছিলেন ওই উপজাতির ক্ষত্রিয়প্রধান। বুদ্ধের জীবনকাহিনীর সঙ্গে যীশুখ্রীস্টের জীবনকাহিনীর অনেক মিল দেখা যায়। যেমন, তাঁদের মায়েদের অলৌকিক উপায়ে গর্ভধারণ, শয়তানের প্রলোভন, ইত্যাদি। বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৬ সালে। রাজপ্রাসাদের জীবন তাঁর কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তারপর একরাতে হঠাৎ গৃহত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। ছয়বছর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পর বুদ্ধের মনে হল, সন্ন্যাসের মধ্যে মুক্তি নেই। ধ্যানের সাহায্যে তিনি মুক্তির উপায় অনুসন্ধান শুরু করলেন। ঠিক উনপঞ্চাশ দিন পরে তাঁর দিব্য জ্ঞানলাভ হল এবং পৃথিবীতে দুঃখকষ্টের কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। বারাণসী থেকে চার মাইল দূরে সারনাথের মৃগ-উদ্যানে তিনি প্রথম তাঁর উপদেশ প্রচার শুরু করলেন। প্রথম শিষ্য হলেন পাঁচজন।

এই প্রথম উপদেশ ধর্মচক্রের প্রবর্তনরূপে খ্যাত হয় এবং একে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য উপদেশ। এর মধ্যে ছিল চারটি মহৎ সত্য (যথা— এ পৃথিবী দুঃখময়, দুঃখ আসে মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে, আকাঙ্ক্ষা দূর হলেই মুক্তি সম্ভব, এবং এই মুক্তির জন্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা প্রয়োজন)। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে ছিল আটটি নিয়ম (যথা — সৎ ধারণা, সৎ সিদ্ধান্ত, সৎবাক্য, সৎ আচরণ, সৎ-বৃত্তি, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও ধ্যান। এগুলির সবগুলিকে মিলিয়ে বলা হতো মধ্যপন্থা)। এইসব নিয়ম অনুসরণ করে সুষম ও পরিমিত জীবনযাপন সম্ভব। এই উপদেশ বোঝবার জন্যে জটিল দর্শনচিন্তার প্রয়োজন ছিল না। উপদেশের মধ্যে যে যুক্তি-বাদিতা ছিল তা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হেতুবাদকে গুরুত্ব দেবারই একটা উদাহরণ মাত্র। তা ছাড়া এই চিন্তাধারার মধ্যে দেব হস্তক্ষেপের কোনো প্রশ্নই ছিল না। পরম মুক্তির পথ হল পুনর্জন্ম-চক্রের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাণলাভ। সুতরাং বৌদ্ধমতে মুক্তির পথে পৌঁছতে গেলে তার মধ্যে কর্মফলের একটা ভূমিকা এসে পড়ে। বুদ্ধ জাতিভেদ মানতেন না বলে বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণদের ধারণা-মতো কর্মফল অনুযায়ী জাতিভেদের কথা মানা হতো না। বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদীও, কেননা ব্রহ্মাণ্ডে একটা স্বাভাবিক উত্থান-পতনের নিয়ম রয়েছে বলে বিশ্বাস ছিল। এর মধ্যে ঈশ্বরের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। এ জগৎ আগে ছিল এক পরমশান্তির স্থান, কিন্তু বাসনার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করার পর থেকেই দুঃখের সূচনা। প্রথম দিককার বৌদ্ধধর্মে সমস্ত রকম ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্রবহির্ভূত অথচ জনপ্রিয় দুটি প্রথা,— বৃক্ষপূজা ও সমাধিস্তূপ নির্মাণ বৌদ্ধরাও গ্রহণ করার ফলে সাধারণ মানুষের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ স্থাপিত হল।

বৌদ্ধধর্মে সংঘের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৌদ্ধভিক্ষুদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত

হল— যাঁরা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার ও ভিক্ষা করে দিনযাপন করতেন। ফলে ধর্মের মধ্যে একটা প্রচারমূলক ও জনহিতকর রূপ দেখা দিল। ক্রমশ শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্যে বিহার স্থাপন করা হল যাতে ভিক্ষা পেতে সুবিধে হয়। বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রচার বেড়ে গেল, কেননা শিক্ষাদান এখন আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সমাজে সর্বস্তর থেকে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষা সমাজের সব শ্রেণীতেই ছড়িয়ে পড়ল। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা যেখানে মেয়েদের ক্রমশ নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে বেঁধে ফেলেছিলেন, বৌদ্ধরা সন্ন্যাসিনীদের জন্যে আলাদা মঠস্থাপন করে স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিলেন।* মঠগুলির পরিচালনা হতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং তার সঙ্গে গণরাজ্যের গণসভার একটা মিল ছিল। মাসে দু'বার করে নিয়মিত সভা বসত এবং সেখানে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির ব্যবস্থা ছিল।

বুদ্ধদেবের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর পরে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলি সংগ্রহ করা হয়। তার ফলে এগুলির কালানুক্রম নির্দিষ্টভাবে জানা কঠিন। পরে ভক্তদের দ্বারা অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট অংশগুলিকে পৃথক করাও সহজ নয়। বৌদ্ধধর্ম তার নিজের উৎপত্তিস্থল এবং প্রচারের দেশগুলিতে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সিংহলের থেরবাদের মধ্যে। বৌদ্ধধর্মকে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হল, বৌদ্ধধর্মেও দার্শনিক তত্ত্ববিচার সন্নিবিষ্ট হল। তার ফলে বৌদ্ধধর্মের মূল সরল ব্যাখ্যা অনেক জটিল হয়ে উঠল।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল। দুটি ধর্মেরই প্রচারকরা এসেছিলেন ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী থেকে। তাঁরা ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন, বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন, এবং পশুবলি প্রথার বিরোধী ছিলেন। উভয় ধর্মই সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আকর্ষণ করে। বৈশ্যরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তেমন সম্মান পেতেন না, আর শূদ্ররা তো অত্যাচারিত শ্রেণী ছিলেনই। জাতিভেদকে সরাসরি আক্রমণ না করলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিল এবং এগুলিকে বর্ণভেদহীন আন্দোলন বলা চলে। এইভাবে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ নিজের বর্ণত্যাগ ক'রে নতুন এক বর্ণহীন গোষ্ঠীতে যোগ দেবার সুযোগ পেল।† ব্রাহ্মণদের পূজার্চনার মতো এই দুই ধর্মের পূজার্চনা অত ব্যয়বহুল ছিল না বলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষ এর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়।

* সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণের যতটুকু অধিকার ব্রাহ্মণরা দিয়েছিলেন পরবর্তীযুগে ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকরা তাকে অত্যন্ত সীমিত বলে মনে করতেন এবং ওই স্বাধীনতার প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। যেমন, তামিল ভক্তিবাদ আন্দোলন এবং উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ।

† এই ঘটনা আবার ঘটেছে মাত্র গত দশকেও। মহারাষ্ট্রের বহু দলিত শ্রেণীভুক্ত মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ২,৪৮৭ জন বৌদ্ধ ছিল। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বৌদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে—৩,২৫০,২২৭ জন। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে যে প্রায় ২০ লক্ষ বৌদ্ধ আছে, তারা প্রায় সবাই সমাজের অস্পৃশ্য ও তপশীলী শ্রেণীভুক্ত মানুষ।

রাজন্যবর্গকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বুদ্ধদেবের আপত্তি না থাকলেও তাঁর ধর্মপ্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের নিচুশ্রেণীর মানুষ। সেই কারণেই তিনি সংস্কৃতের বদলে বেছে নিলেন অন্য একটি বহুলপ্রচলিত ভাষা—মাগধী। ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষিজীবী শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানত বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদের কথাও অবশ্য শোনা যায়। তবে অন্য ব্রাহ্মণরা এদের বর্ণচ্যুত বলে জ্ঞান করত। ক্ষত্রিয়রাও বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুগামী হয়েছিল। অবশ্য ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এই দুই ধর্মের অহিংসার আদর্শকে মেনে নেওয়াটা একটা আপাতবিরোধী ব্যাপার। কিন্তু যেসব ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পেশা শুধু যুদ্ধই ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম—প্রচলিত সংস্কারবিরোধী এই দুই ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল মূলত শহরাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্র করেই। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ভক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে। সংস্কারপন্থী ধর্মীয় নেতারা পরবর্তীকালেও ওই শহরাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরই অনুগামী হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁদের ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে সামাজিক দিকটাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হতো। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের হাতেই ছিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি তখন তুঙ্গে। ব্রাহ্মণ্যবাদের পাল্টা জবাব হিসেবে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মকেই বেছে নিলেন।

৪
সাম্রাজ্যের উত্থান
৩২১—১৮৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্যদের আগমনের পর থেকে নানা সূত্র থেকে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। এ সময়ের রাজনৈতিক চিত্রে জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম, কারণ বিরাট এক অঞ্চলের একক ক্ষমতার সূত্র ছিল মৌর্য শাসকদের হাতে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ গড়ে উঠতে লাগল। আগেকার শতাব্দীগুলির তুলনায় এই যুগ সম্পর্কে অনেক বেশি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে।

নন্দরাজবংশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে এলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। তিনি তখন মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক। কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর সিংহাসনারোহণ ও রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান পরামর্শদাতা ও অভিভাবক। মগধ অধিকারের মধ্য দিয়ে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সূচনা হল। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মোরিয়া উপজাতিভুক্ত। কিন্তু তাঁর বর্ণ ছিল নিচু—সম্ভবত বৈশ্য। নন্দদের তুলনায় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর সমর্থকদের সামরিক শক্তি কম ছিল। কিন্তু চাণক্যের কূটবুদ্ধি চন্দ্রগুপ্তের সহায় হল। নন্দদের রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে তাঁরা গোলযোগ বাধিয়ে তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন রাজ্যের কেন্দ্রে। চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে এই রাজনৈতিক কৌশল শিখলেন সে সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে: চন্দ্রগুপ্ত ছোটবেলায় একবার দেখেছিলেন যে একটি শিশু পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার তুলে মুখে দেবার জন্যে তার মার কাছে বকুনি খাচ্ছিল; কেননা, পাত্রের মাঝখানের খাবার ধারের অংশের খাবারের চেয়ে বেশি গরম থাকে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে আধিপত্য বিস্তারের পর চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে। আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পর ওই অঞ্চলে তখন কিছুটা রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল। সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তিনি সহজেই অধিকার করলেন। এখানে এসে চন্দ্রগুপ্তকে থামতে হল, কারণ গ্রীক সেলুসিড (Seleucide) রাজবংশ তখন পারস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তারা সহজে সিন্ধুতীরবর্তী অঞ্চলগুলি ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। অতএব, সাময়িকভাবে চন্দ্রগুপ্ত সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে চললেন মধ্য-ভারতে। নর্মদা নদীর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ৩০৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত আবার অভিযান শুরু করলেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে; সেলুকাস নিকাতরের (Seleucus Nikator) বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ হল ৩০৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। বর্তমানে যেখানে আফগানিস্তান সেই অঞ্চলগুলি চন্দ্রগুপ্ত লাভ করলেন। চন্দ্রগুপ্ত-অধিকৃত ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি হল সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমভূমি ও সুদূর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত। যে-কোনো দেশকালের মাপকাঠিতেই এই সাম্রাজ্যকে

বিশাল বলা চলে।

সেলুসিড রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তারা পরস্পরের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক ছিল। গ্রীক লেখার মধ্যে সাণ্ড্রকোট্টস (চন্দ্রগুপ্ত) সম্পর্কে বারবার উল্লেখ দেখা যায়। যুদ্ধের পর ৩০৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দের সন্ধিচুক্তির মধ্যে একটি বিবাহবন্ধনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত সেলুকাসের এক কন্যার আগমন ঘটেছিল মৌর্যবংশে। সুতরাং তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন গ্রীক মহিলারও আগমন স্বাভাবিক। সেলুকাসের প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস অনেক বছর পাটলিপুত্রে কাটিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। দুই রাজ্যের মধ্যে নিয়মিত দূত বিনিময় ও উপহারদ্রব্য বিনিময়ও প্রচলিত ছিল (এর মধ্যে বহু কামোদ্দীপক বস্তুও ছিল)। পাটলিপুত্রে বিদেশীরা যে রীতিমত সমাদৃত হতো, তার প্রমাণ হিসেবে পাটলিপুত্র পুরসভার একটি বিশেষ সমিতির উল্লেখ করা যায়। এই সমিতির কাজ ছিল শহরে বিদেশীদের সুখসুবিধের ওপর দৃষ্টি রাখা।

জৈনদের মতে, চন্দ্রগুপ্ত নাকি শেষজীবনে জৈনমতবাদে আকৃষ্ট হন। তারপর রাজ্যত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন। একজন জৈন ধর্মগুরু ও অনেক জৈন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি দক্ষিণ-ভারতে যান। সেখানে গোঁড়া জৈনরীতি অনুসারে অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর ২৯৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসার সিংহাসনে বসলেন। গ্রীকরা তাঁকে বলতেন অমিত্রকেটাস। সম্ভবত, সংস্কৃত শব্দ অমিত্রঘাত (শত্রুবিনাশকারী) থেকে গ্রীক শব্দটি এসেছে। মনে হয়, বিন্দুসারের আগ্রহ ছিল বহুমুখী এবং রুচি ছিল শৌখিন। শোনা যায়, রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাসকে (Antiochus I) অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর জন্যে সুমিষ্ট মদ, শুকনো ডুমুর ও একজন গ্রীক নৈয়ায়িককে পাঠানো হয়। বিন্দুসার রাজ্যবিস্তার করলেন দাক্ষিণাত্যে। মৌর্যসাম্রাজ্য বিস্তৃত হল মহীশূর পর্যন্ত। বলা হয়, তিনি 'দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল' জয় করেছিলেন। বোধ হয় আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন তামিল কবিদের লেখায় মৌর্য রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনির বর্ণনা আছে। রথের শ্বেতধ্বজা সূর্যালোকে ঝলসে উঠত। ২৭২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যুর সময় প্রায় সমগ্র উপমহাদেশেই মৌর্য-কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্তে সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হয় নি, কেননা ওই অঞ্চল বিনাযুদ্ধেই মৌর্য-আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। একমাত্র একটি অঞ্চলই বিজিত হয় নি— কলিঙ্গ বা এখনকার উড়িষ্যা। বিন্দুসারের পুত্র অশোক কলিঙ্গজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন।

একশো বছর আগে পর্যন্তও অশোককে শুধু মৌর্য রাজবংশের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে একজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি ব্রাহ্মীতে রচিত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এই লিপিতে 'দেবনামপিয়' (দেবতাদের প্রিয়) পিয়দশ্যী বলে কোনো এক রাজার উল্লেখ আছে। এই রহস্যময় রাজা পিয়দশ্যীকে ঘিরে একটা ধাঁধার সৃষ্টি হল, কেননা

এরকম কোনো নামের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় নি। কয়েক বছর পরে সিংহলের বৌদ্ধ বিবরণী পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতে এক মহান ও দয়ালু মৌর্য সম্রাট পিয়দশ্যীর কথা উল্লিখিত আছে। ধীরে ধীরে এইসব সূত্রগুলি একত্রিত হল। তারপরে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আর একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হল। তাতে লিপিকার নিজেকে সম্রাট অশোক, পিয়দশ্যী বলে উল্লেখ করেছেন। বোঝা গেল, পিয়দশ্যী হল অশোকেরই দ্বিতীয় নাম।

অশোকের শিলালিপি ও অনুশাসন ছড়িয়ে আছে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বপ্রান্তে। এগুলি থেকে কেবল অশোকের নিজের কথাই নয়, তাঁর রাজত্বকালের বিভিন্ন ঘটনার কথাও জানা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হল তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। কলিঙ্গযুদ্ধের পরই এই ধর্মান্তর ঘটে। স্থল ও জলপথে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের পথগুলি নিয়ন্ত্রণ করত কলিঙ্গ। ফলে এটিকেও মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ২৬০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করে রাজ্যটিকে প্রায় ধ্বংস করে দিলেন। মৌর্যসম্রাটের ভাষায়— 'দেড় লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নির্বাসিত হয়, এক লক্ষ লোক মারা যায় এবং এই সংখ্যার অনেকগুণ লোক নানাভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' যুদ্ধের এই বিপুল ধ্বংসলীলা দেখে অশোকের মনে অনুশোচনা দেখা দেয়। প্রায়শ্চিত্ত করার চিন্তায় নিবিষ্ট সম্রাট বৌদ্ধ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এতদিন পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, অশোকের ধর্মান্তর ঘটেছিল নাটকীয়ভাবে,—এই করালযুদ্ধের ঠিক পরই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মান্তর রাতারাতি হয়নি। এক শিলালিপিতে অশোক বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী অনুরাগী হতে তাঁর লেগেছিল আড়াই বছর। এরপর তিনি অহিংস মতবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং রাজ্যজয়ের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ পরিত্যাগ করেন।

অশোকের রাজত্বের সময়ই পাটলিপুত্রে আনুমানিক ২৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের পর বৌদ্ধধর্মের কিছু-কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবতই, বৌদ্ধসূত্রে অশোককে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অশোক তাঁর কোনো শিলালিপিতে, এমন-কি বৌদ্ধসংঘ সম্পর্কিত শিলালিপিতেও এই ঘটনার কথা বলে যান নি। অশোকের কাছে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও সমর্থন ছিল একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সম্রাট হিসেবে নিজের অপক্ষপাত দায়িত্ব পালন করেছেন কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না ক'রে। এই তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। থেরবাদ মতাবলম্বী গোঁড়া বৌদ্ধরা এই শেষবার বিরোধীদল ও নতুন মতবাদীদের বৌদ্ধধর্মের আওতা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। বলা যেতে পারে, এই মনোভাব থেকেই বৌদ্ধধর্মে পরবর্তীকালে বিভেদের জন্ম হয়েছিল। পরে গোঁড়াপন্থীরা হলেন হীনযানপন্থী এবং এঁদের বিরোধী উদার মতবাদীরা মহাযানপন্থী হিসেবে পরিচিত হলেন। এ ছাড়া এই সম্মেলনেই স্থির হল, উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠিয়ে ধর্মান্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধমত প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এভাবেই দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে অশোক নানারকম দূত বিনিময় করেছিলেন ও সে কথা শিলালিপিতে উল্লেখও করেছেন। খ্রীস্টপূর্ব ২৫৬-২৫৫ সালের একটি শিলালিপিতে লেখা আছে :

…যেখানে গ্রীকরাজা অংতিয়োগ রাজত্ব করেন এবং তাঁর রাজ্য পেরিয়ে চার রাজার রাজত্ব তুলময়, অন্তেকিন, মক এবং অলিক্যশূদল…।[১]

পরে দেখা গেছে এইসব রাজারা হলেন, সিরিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস থিওস (২৬০-২৪৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ),— যিনি ছিলেন সেলুকাস নিকাতরের পৌত্র ; মিশরের তৃতীয় টলেমী ফিলাডেলফাস (২৮৫-২৪৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) ; ম্যাসিডোনিয়ার অ্যান্টিগোনাস গোনাটাস (২৭৬-২৩৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) ; সিরিনের রাজা ম্যাগাস ও এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তখন যোগাযোগ ভালোভাবেই স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলির সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছিল বেশি। পূর্বদিকের অঞ্চলগুলির সম্বন্ধে তখনো বেশি কিছু জানা যায় নি। গ্রীক রাজ্যগুলিতে অশোক প্রতিনিধিদল পাঠানোর ফলে গ্রীকদের মধ্যে ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় বস্তু সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হল। সবচেয়ে কাছের গ্রীক রাজ্য ছিল সেলুসিড সাম্রাজ্য— মৌর্য-সাম্রাজ্যের সীমানা-সংলগ্ন। পরপর তিন সম্রাটের রাজত্বকালেই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে দূত বিনিময় হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি আগে অ্যাকামেনিড সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে সেখানে কিছু-কিছু পারসী বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। অশোকের তৈরি স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশের সঙ্গে এ জন্যই পার্সেপোলির স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশের সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। হয়তো উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কারিগররাই এই স্তম্ভগুলি তৈরি করেছিল। রাজা দারিয়ুসের শিলালিপির কথা শুনেই হয়তো অশোক নিজের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ করেছিলেন। কিছু কিছু বাক্যাংশ, যেমন সম্বোধন অংশগুলির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। দারিয়ুস লিখেছেন :

এইভাবেই সম্রাট দারিয়ুস বললেন…[২]

আবার অশোক লিখেছেন :

দেবতাদের প্রিয় রাজা পিয়দশ্যী এইভাবেই বললেন…[৩]।

অশোকের শিলালিপিতে স্থানীয় লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পেশোয়ারের কাছে পাওয়া শিলালিপিতে আছে খরোষ্ঠী লিপি। এটির উৎপত্তি ইরানের অ্যারামাইক লিপি থেকে। সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে কান্দাহারের কাছে পাওয়া শিলালিপিগুলি লেখা হয়েছিল গ্রীক ও অ্যারামাইক লিপিতে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বলা হয়, কাশ্মীর ছিল মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং শ্রীনগর শহরটি অশোকই নির্মাণ করেছিলেন। মধ্য-এশিয়ার খোটানও মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রভাবের অন্তর্গত হয়েছিল বলে শোনা যায়। তিব্বতীসূত্রে বলা হয়েছে খোটান রাজ্য ভারত ও চীন থেকে রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত ব্যক্তিদের দ্বারা যুগ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত। অশোক একবার খোটানে এসেছিলেন। কিন্তু অশোকের

খোটান-যাত্রার কথাটা নিয়ে সন্দেহ জাগে, কেননা পথ ছিল খুবই দুর্গম। চীনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে তারিখ উল্লেখ করে কিছু বলা কঠিন। মধ্য-এশিয়ার পথটি তখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় নি। যেটুকু সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার সূত্র ছিল আসাম ও বর্মার পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু এইসব পাহাড়ের অবস্থান উত্তর থেকে দক্ষিণে। উপরন্তু এগুলির যা উচ্চতা, তাতে কোনো যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে বাধা হয়ে ওঠারই কথা। আধুনিক নেপালের অঞ্চলগুলির সঙ্গে মৌর্যদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কারণ পর্বতের পাদদেশভূমি ছিল সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। অশোকের এক কন্যার নাকি নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের এক অভিজাত বংশে বিয়ে হয়। পূর্বদিকের প্রদেশের নাম ছিল 'বঙ্গ' (আধুনিক বঙ্গদেশের অংশ বিশেষ)— যা ছিল প্রধানত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল। বদ্বীপের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত বঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। বর্মা উপকূল ও দক্ষিণ-ভারতগামী সমস্ত জাহাজ যাত্রা শুরু করত তাম্রলিপ্ত থেকে।

দক্ষিণ-মহীশূর পর্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অশোকের যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তা থেকে দক্ষিণ-ভারতে মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রভাবের কথা জানা যায়। অশোক লিখেছেন, দক্ষিণাঞ্চলের চোল, পাণ্ড্য সতিয়পুত্র ও কেরলপুত্র রাজ্যের লোকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শোনা যায়, তামিল কাব্য (দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রাচীন সাহিত্যভাষা) প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদেশী আগন্তুকদের আগ্রহে। আগন্তুকরা কিছু কিছু শিলা-লিপিও উৎকীর্ণ করেছিল। সম্ভবত এখানে মৌর্যদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মৌর্যরা প্রত্যক্ষভাবে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিল না। এটা হতে পারে যে, তামিলভাষীরা মৌর্যদের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে পরিচিত হবার আগে পর্যন্ত তামিল ছিল লিপিবিহীন মৌখিক ভাষামাত্র। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সঙ্গে অশোকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যগুলি জয় করার চেষ্টা করতেন। ওই রাজ্যগুলিও বিন্দুসারের সময়ে মৌর্য সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়ার পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে শান্তিতে থাকাই ভালো মনে করেছিল।

সিংহলের সঙ্গে মৌর্যদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং নানা সিংহলী বিবরণীতেও মৌর্যদের সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। কেবল যে অশোকের পুত্র মহিন্দ বৌদ্ধ-প্রচারক হিসেবে সিংহলে গিয়েছিলেন তাই নয়, সিংহলের রাজা তিস্‌সা নিজেও অশোককে তাঁর আদর্শ রাজা বলে শ্রদ্ধা করতেন। দূত ও উপহার বিনিময় হতো নিয়মিত। যে অশ্বত্থগাছের নিচে বসে বুদ্ধদেব বোধিত্বলাভ করেছিলেন, তার একটি শাখা অশোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সিংহলে। শোনা যায়, সেটি নাকি এখনো বেঁচে আছে। অপরদিকে প্রকৃত অশ্বত্থগাছটি কয়েক শতাব্দী পরে এক উত্তেজিত বৌদ্ধ বিরোধীর হাতে কাটা পড়ে।

প্রথম তিন মৌর্যসম্রাট রাজত্ব করেছিলেন ৯০ বছর ধরে এবং মৌর্যবংশের এই সময়টাই বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রাজ্যজয়টাই কেবল বড় কথা ছিল না, তাঁরা এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী ও মানুষকে নিয়ে একসূত্রে বেঁধে এতবড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা যে সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে গেলেন,

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। কেন খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলো তার কতকগুলি কারণ ছিল।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। জমির খাজনা থেকে রাজকোষে অর্থ আসত। এটাও বোঝা গিয়েছিল যে, নিয়মিতভাবে নির্ধারণ করে দিলে প্রসরমান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে খাজনা আদায় বেড়েই চলবে। অর্থাগমের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা আসার ফলে একটা আর্থিক নিরাপত্তাবোধের জন্ম হল। শাসনব্যবস্থার একটা বড় কাজ ছিল নিয়মিত খাজনা আদায়। কৌটিল্য ছিলেন এই ব্যবস্থার প্রবক্তা। তাঁর রচনাতে খাজনা আদায় ও তার নানা সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। চাষবাস ছাড়া অন্যান্য কাজও অজানা ছিল না। গ্রামের পশুগুলির হিসেব থাকত ও তাদের ওপর কর বসত। উপকূল অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর সরকারি দৃষ্টি ছিল। এবং সুবিধেমতো কর আদায় হতো। জমির খাজনা নির্ণয়ের পদ্ধতিতেই এসবেরও কর ধার্য করা হতো।

বেশিরভাগ মানুষই ছিল কৃষিজীবী এবং তাদের বাস ছিল গ্রামাঞ্চলে। ক্রমশ রাজা ও রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যটা মুছে যেতে লাগল এবং সমগ্র জমির ওপর রাজার অধিকার ক্রমশ সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়ে এলো। রাজার অধিকার সম্বন্ধে যে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলে নি তা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' পড়লে বোঝা যায়।* এ ছাড়া দেখা যায় ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে তা নিয়ে সোজাসুজি রাজা ও কৃষকের মধ্যেই কথাবার্তা হতো— এই ব্যাপারে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নতুন অঞ্চলে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হতো সরকারি তত্ত্বাবধানে। এর জন্য জনবহুল অঞ্চল থেকে শূদ্রদের নিয়ে যাওয়া হতো নতুন অঞ্চলে। অর্থশাস্ত্রে পুরো ব্যাপারটার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই কলিঙ্গ থেকে যে দেড় লক্ষ লোককে নির্বাসিত করা হয়েছিল তা পোড়োজমি পরিষ্কার করে নতুন বসতি তৈরি করার জন্য। এদের কোনো অস্ত্র দেওয়া হয় নি। এদের একমাত্র কাজ ছিল চাষ-আবাদ। সরকার থেকে সমস্ত বাড়তি খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়া হতো। শূদ্র খেত-মজুরদের সরকারি কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার পর আর খাদ্যোৎপাদনের জন্যে ব্যাপক ক্রীতদাসপ্রথার প্রয়োজন রইল না। যদিও শূদ্ররা আইনত ক্রীতদাস ছিল না, প্রকৃত ক্রীতদাসের জীবনের সঙ্গে শূদ্রদের জীবনে খুব একটা পার্থক্যও নজরে পড়ে না। একবার নতুন বসতিগুলি ভালোভাবে গড়ে ওঠার পর তখন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যান্য পেশা ও বর্ণের লোকরা এইসব অঞ্চলে আসতে শুরু করত।

চন্দ্রগুপ্তের সভায় সেলুসিড রাজদূত মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ভারতবর্ষে দাসপ্রথা ছিল না। কিন্তু ভারতীয় সূত্রে দেখা যায় এ ধারণা ঠিক নয়। ধনীগৃহে ক্রীতদাস থাকাটাই সাধারণ রীতি ছিল। এইসব ক্রীতদাসরা নিম্নবর্ণের হলেও অস্পৃশ্য শ্রেণীর

* রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক বইটি চন্দ্রগুপ্তের প্রধান উপদেষ্টা কৌটিল্যের লেখা বলেই মনে করা হয়।

ছিল না। খনির কাজে ও সমবায় সংঘগুলির দ্বারাও ক্রীতদাস ব্যবহৃত হতো। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী কোনো মানুষ জন্মসূত্রে, আত্মবিক্রয় দ্বারা, যুদ্ধবন্দী হিসেবে বা বিচারালয়ের শাস্তি হিসেবে ক্রীতদাস হতে পারে। দাসপ্রথা ছিল একটি সমাজ-স্বীকৃত ব্যাপার এবং প্রভু ও দাসের মধ্যেকার আইনগত সম্পর্কও পরিষ্কারভাবে বলা ছিল। যেমন, কোনো ক্রীতদাসীর গর্ভে তার প্রভুর কোনো পুত্র জন্মালে ক্রীতদাসী আইনত স্বাধীন হয়ে যাবে ও তার সন্তান প্রভুর পুত্র হিসেবে আইনসম্মত মর্যাদা পাবে। সম্ভবত অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস ও বর্ণভেদের জটিলতার মধ্যে মেগাস্থিনিস দাসপ্রথার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। উৎপাদনের জন্যে ব্যাপক দাসপ্রথার প্রচলন ছিল না। গ্রীকসমাজে ক্রীতদাস ও স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ছিল ভারতবর্ষে ততটা ছিল না। ক্রীতদাস তার স্বাধীনতা মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারত, অথবা তার প্রভু স্বেচ্ছায় তাকে স্বাধীনতা দিতে পারতেন। এবং গ্রীকসমাজে যা একেবারেই অভাবনীয়— ক্রীতদাস যদি আর্যবংশোদ্ভূত হতো তাহলে স্বাধীনতা ফিরে পাবার পর আবার সে আর্য হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হতো। ভারতীয় সমাজে যা একান্তভাবে অপরিবর্তনীয় ছিল তা স্বাধীনতা বা দাসপ্রথা নয়, জন্মসূত্রে লব্ধ বর্ণ বা জাতিত্ব।

রাজা রাজ্যের সমগ্র ভূমির অধিকারী হলেও ব্যক্তিগতভাবে লোকেরা অল্পজমি রাখতে পারত। এইসব জমি তারা নিজেরাও চাষ করত, কিংবা অন্য লোক দিয়ে চাষ করাতো। কৃষি শ্রমিককে মজুরি দিয়ে চাষ করানোর প্রথা তখন যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়। ভূমিরাজস্ব ছিল দু'ধরনের— জমির ওপর খাজনা ও উৎপন্ন ফসলের ওপর কর, এবং এই দুইয়ের হিসেব আলাদা ছিল। রাজস্বের হার সব অঞ্চলে একরকম ছিল না। কোথাও উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা দিতে হতো, কোথাও বা এক-ষষ্ঠাংশ। গোটা গ্রামের জমিতেও একরকম রাজস্ব নির্ধারণ হতো না। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করে দেখা হতো। পশুপালকদের ওপর কর নির্ধারণ করা হতো পশুর সংখ্যা হিসেব করে।

চাষের জন্যে সেচের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিল। কয়েক জায়গায় হিসেব করে সেচের জল বণ্টন করা হতো। অর্থশাস্ত্রে জলকরের উল্লেখ আছে যা সেইসব অঞ্চল থেকে আদায় করা হতো— যেখানে সরকার থেকে সেচের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের আমলে একজন শাসনকর্তা পশ্চিম-ভারতে গিরনারের কাছে নদীর ওপর বাঁধ তৈরি করেছিলেন। তার ফলে একটি হ্রদ সৃষ্টি হয় ও হ্রদের জল সেচের কাজে লাগত। এই অঞ্চলের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, বাঁধ নির্মাণের পর ৮০০ বছর ধরে বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। জলাশয়, জলাধার ও খাল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সরকারের। তবে সেচ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণই যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি ছিল, এমন নয়।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যেমন রাজনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছিল, সাম্রাজ্য পত্তনের ফলে আর এক ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক একতা ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হবার ফলে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায়সংঘ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার শুরু

হল।* শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছন্দগতির ফলে বাবসা-বাণিজ্যের সুবিধে হয় ও কুটির-শিল্পগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রশিল্পে পরিণত হয়ে ওঠে। কিছু কিছু কারিগর, যেমন অস্ত্র-নির্মাণকারী জাহাজ নির্মাণকারী ও আরো কয়েক ধরনের পেশার লোককে সরকার থেকে সরাসরি নিযুক্ত করা হল। এদের কোনো কর দিতে হতো না। কিন্তু সরকারি খনি বা তাঁত ও বয়নশিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের কর থেকে অব্যাহতি ছিল না। বাকি সবাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা সমবায় সংঘের মধ্য থেকে কাজ করত। সমবায় সংঘগুলি বেশ বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এখানে কাজ করে কারিগরদের সুবিধেই হতো। নিজে কাজ করার বাড়তি খরচাও বেঁচে যেত এবং সমবায় সংঘের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অসুবিধেও আর থাকত না। আবার, সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমবায় সংঘের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সুবিধে হতো এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখাও সহজ ছিল। এক-এক অঞ্চলে এক-একটি পেশা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হওয়ায় সমবায় সংঘগুলি দৃঢ়তরভাবে গঠিত হতে পারত।

সমস্ত নির্মিত দ্রব্যের ওপর কর বসানো হতো এবং ক্রেতাদের সুবিধের জন্যে দ্রব্য-গুলির ওপর তারিখের ছাপ মেরে দেওয়া হতো। বিক্রির ওপর সরকারি নজর ছিল কড়া। কোনো জিনিসের মূল্যায়নের সময় সরকারি বাণিজ্য-অধিকর্তা উৎপাদন খরচ, বর্তমান দাম ও চাহিদার কথা বিচার করে দেখতেন। জিনিসের দামের এক-পঞ্চমাংশ কর বসানো হতো; তা ছাড়া এই করের এক-পঞ্চমাংশ বাণিজ্যকর বসানো হতো। কর ফাঁকির কথাও শোনা যায়, তবে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। ব্যবসায়ী যাতে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে তার জন্যে দামের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং মুনাফার ওপর কর আদায় হতো। কোনো ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা না থাকলেও তেজারতি প্রথার প্রচলন ছিল। ধার নিলে সাধারণত সুদ দিতে হতো বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা হিসেবে। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা বা অন্যান্য অনিশ্চিত ব্যাপারে টাকা লেনদেনের সময়ে সুদের হার শতকরা ৬০ টাকা পর্যন্তও ধার্য হতো।

মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে মৌর্যসমাজকে সাত বর্ণে বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা— দার্শনিক, কৃষক, সেনানী, পশুপালক, কারিগর, বিচারক ও পারিষদ। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি পেশার সঙ্গে বর্ণের গণ্ডগোল করে ফেলেছিলেন। বর্ণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, কেউ তার বর্ণের বাইরে বিয়ে করতে পারে না, বা নিজের পেশার বাইরেও যেতে পারে না।[৪] দার্শনিক বলতে বোঝাত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক। মেগাস্থিনিস বলেন, এবং ভারতীয় সূত্রেও দেখা যায় দার্শনিকদের করদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কৃষিজীবী বলতে বোঝাতো প্রধানত শূদ্র ও ভূমি-শ্রমিকদের। সৈন্যদলের সবাই হয়তো ক্ষত্রিয় বর্ণের ছিল না, কিন্তু তারা যে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৌর্যদের

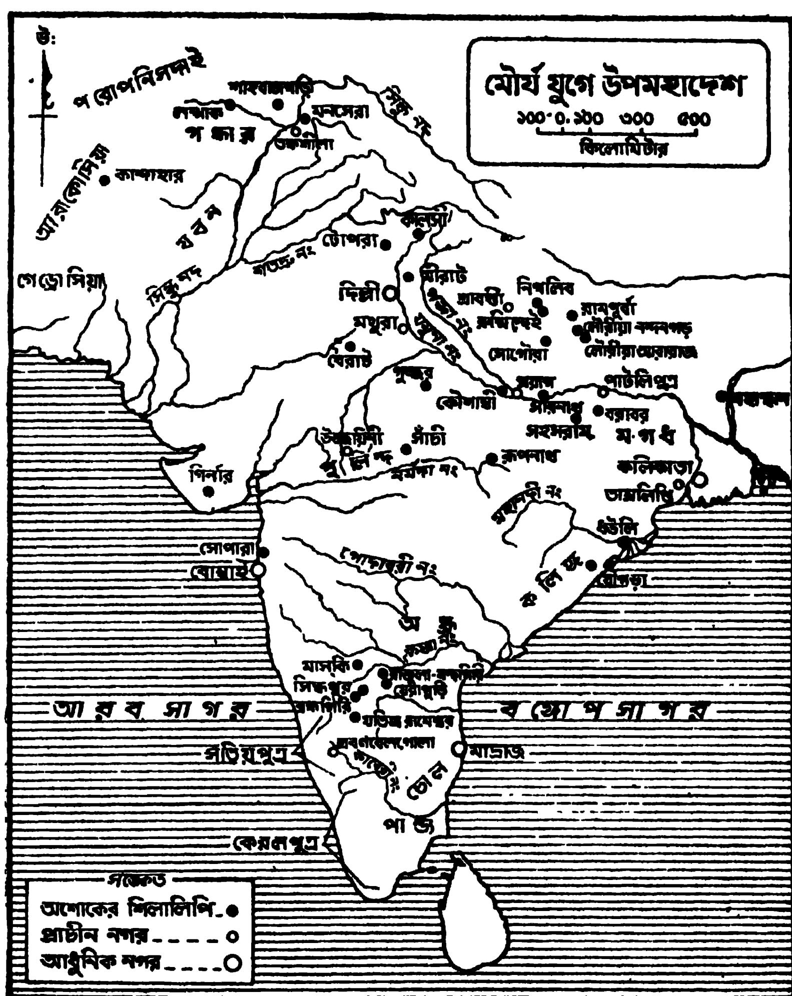
* উপদ্বীপ অঞ্চলের নানা জায়গায় খননকার্যের সময় তৃতীয় খ্রীস্টপূর্বাব্দের স্তরে উত্তরাঞ্চলের পালিশ-করা মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে মৌর্য আমলে বাণিজ্য বিস্তারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৈন্যবল নন্দদের চেয়ে বেশি ছিল। প্লিনি লিখেছেন— মৌর্যদের ছিল ৯ হাজার হাতি, ৩০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৬ লক্ষ পদাতিক। শান্তির সময়ে এই বিপুল সেনাবাহিনীর খরচ যোগানো নিশ্চয়ই একটা দায় হয়ে উঠত। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যখন কাজকর্ম থাকত না, তখন এরা আলস্যে আর মদ খেয়ে দিন কাটাতো। আর তাদের ব্যয়নির্বাহের অর্থ যোগাতো রাজকোষ। অতএব, যেন-তেন-প্রকারেণ রাজকোষে অর্থসংগ্রহ বজায় রাখতে হতো। করযোগ্য যাবতীয় জিনিসের ওপর করধার্য করতে হতো আর সম্পূর্ণ এক-একটি সম্প্রদায়কে নতুন বসতি স্থাপনের জন্যে দূরে পাঠাতে হতো। শূদ্র ও অন্যান্য নিম্ন বর্ণের লোকেরাই পশু-পালকের পেশায় নিযুক্ত ছিল। কারিগরদের বর্ণ নির্ভর করত তাদের নিজস্ব কাজের প্রকৃতির ওপর। যেমন, ধাতুশিল্পীরা তন্তুবায় বা মৃৎশিল্পীদের চেয়ে বেশি সম্মান পেত। সম্ভবত, যারা বেশি অবস্থাপন্ন ছিল তারা উচ্চবর্ণভুক্ত ছিল, আর তাদের অধীনে যারা কাজ করত তারা ছিল শূদ্র। বিচারক ও পারিষদবর্গ স্বভাবতই শাসক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এরা অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত।

শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণরা যেমনটি চেয়েছিলেন, বর্ণাশ্রম প্রথা কিন্তু ততটা নির্বিবাদে চলে নি। প্রথম তিনটি বর্ণের সবাই ছিল দ্বিজ এবং শূদ্র বা নিম্নবর্ণের মানুষের চেয়ে এদের বেশি সুযোগসুবিধে পাবার কথা। কিন্তু বৈশ্যারা দ্বিজ হওয়া সত্ত্বেও তেমনভাবে সুযোগসুবিধের ভাগ পায় নি। কারণ, প্রথম দুই বর্ণ এদের সমাজে স্থান দিতে অস্বীকার করে। অথচ বৈশ্যারা ক্রমেই অর্থশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল পুরোপুরি তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের লোকদের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। অশোকের শিলালিপিতে সামাজিক শান্তি বজায় রাখার জন্য বারংবার আবেদন দেখে আন্দাজ করা যায় যে, সামাজিক অশান্তির অস্তিত্ব ছিল। সমবায় সংঘের কর্তারা শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। অথচ সমাজে তাদের ক্ষমতানুযায়ী মর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। তাদের অসন্তোষের কিছুটা প্রকাশ ঘটত প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী দলগুলিকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে, যেমন— বৌদ্ধধর্ম। আবার, এ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে এইসব দলগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ বেড়ে উঠত।

সে সময়কার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজনের জন্যে মৌর্য সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীভূত সরকারি আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হল। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সম্রাট আর তাঁর ক্ষমতাও ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল খুব। অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও অশোক বলতেন, 'সব মানুষই আমার সন্তান।' একটি বৃহৎ পরিবারের কর্তার মনোভাব নিয়েই তিনি রাজ্যশাসন করেছিলেন। জনমতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অশোক সারা দেশ ঘুরতেন। রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটল। ধর্মীয় কাজকর্ম পেছনে ফেলে পুরোহিতরা ক্রমশ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সামাজিক প্রথাগুলিকেই মূলত আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া হতো। এ ব্যাপারে রাজাই সর্বেসর্বা হলেও সাধারণত তাঁর

মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরামর্শ করে নিতেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। মন্ত্রীদের ক্ষমতা নির্ভর করত রাজার ব্যক্তিত্বের উপর : অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়, মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত আলোচনা



করতেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির সময়েও মন্ত্রীরা তাঁর রচিত আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারতেন। তবে শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন সম্রাটই।

শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে দুজন কর্মচারীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল— কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক। আদায়ীকৃত অর্থ ও অন্যান্য

জিনিসের হিসেব রাখার দায়িত্ব ছিল কোষাধ্যক্ষের। করণিকদের সহযোগিতায় প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কর আদায়ের নথিপত্র রাখতেন। প্রতিটি শাসনবিভাগের আলাদা হিসেব থাকত এবং মন্ত্রীরা একসঙ্গে এগুলি রাজার কাছে পেশ করতেন। এর ফলে প্রতারণা বা অর্থ আত্মসাৎ করার সুযোগ থাকত না। প্রতি বিভাগেই তত্ত্বাবধায়ক ও অধীনস্থ কর্মচারীদের অনেকগুলি পদ ছিল। তত্ত্বাবধায়করা কাজ করত স্থানীয় কেন্দ্রে এবং এরাই ছিল কেন্দ্রীয় সরবরাহের সঙ্গে স্থানীয় শাসন পরিচালনার যোগসূত্র। অর্থশাস্ত্রে বিশেষ করে সোনা ও স্বর্ণকারদের তত্ত্বাবধায়কের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়াও ছিল— গুদাম, বাণিজ্য, বনসম্পদ, অস্ত্রাগার, বয়ন, কৃষি, আবগারী, কসাইখানা, বারবনিতা, গোরু, ঘোড়া, হাতি, রথ, পদাতিক বাহিনী, পাসপোর্ট ও শহরের জন্যে নিযুক্ত বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক।

রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হয়ে যেত কর্মচারীদের বেতন ও জনহিতকর কাজে। পুরোহিত বা প্রধানমন্ত্রী পেতেন ৪৮ হাজার 'পণ', কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রাজস্ব সংগ্রাহকের বেতন ছিল ২৪ হাজার পণ, হিসাবরক্ষক ও কেরানিদের জন্যে ধার্য ছিল ৫০০ পণ, মন্ত্রীরা পেতেন ১২ হাজার পণ, আর কারিগরদের বেতন ছিল ১২০ পণ। তবে পণ-এর মূল্য সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কিংবা বেতন যে কতদিন অন্তর দেওয়া হতো তাও জানা যায় না। কেরানির সঙ্গে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতনের অনুপাত ছিল— ১ : ৯৮, আর কারিগরের সঙ্গে মন্ত্রীর বেতনের অনুপাত ছিল— ১ : ১০০। জনহিতকর কাজ ছিল বহুমুখী : রাস্তানির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কূপখনন, বিশ্রামগৃহ নির্মাণ, সেচ প্রকল্প। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব— খনি ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্প পরিচালনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাজার সাহায্যদান। রাজার নিজস্ব কোনো অর্থবরাদ্দ ছিল না।

শহরাঞ্চল শাসিত হতো সরাসরিভাবে। বাকি সাম্রাজ্যকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। রাজপুত্র বা রাজপরিবারের সদস্যারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। প্রদেশের মধ্যে ছোট ছোট অঞ্চলের জন্য স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হতো। এই স্থানীয় প্রশাসকরা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং প্রশাসক হিসেবেও অনেক ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অশোক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিদর্শক পাঠাতেন হিসেবপত্র ও শাসনব্যবস্থা দেখেশুনে আসার জন্যে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্যে বিচারবিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। গ্রামাঞ্চলে এইসব কর্মচারীকে 'রাজুক' নামে অভিহিত করা হতো। তাঁদের ওপর বিচারের দায়িত্ব ছাড়াও জমির মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল। কেননা, গ্রামাঞ্চলে জমি নিয়েই বিরোধ বাধত বেশি। সাধারণত শাস্তি হিসেবে জরিমানা ধার্য করা হতো। কিন্তু গুরুতর অপরাধ ঘটলে প্রাণদণ্ডেরও বিধান ছিল। এমন-কি, অহিংসার সমর্থক অশোক নিজেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল আর বেশ-কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হতো এক-একটি জেলা। গ্রামই ছিল শাসনব্যবস্থার সর্বশেষ একক অংশ। এই রীতি

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই চলে এসেছে। একজন করে হিসাবরক্ষক গ্রামগুলির সীমানানির্ধারণ, জমি ও দলিল রেজিস্ট্রি, জনসংখ্যার হিসেব, গৃহপালিত পশুর হিসেব ইত্যাদি কাজের জন্যে নিযুক্ত থাকত। এছাড়া একজন করে কর আদায়কারী নানাধরনের কর আদায় করত। প্রতিটি গ্রামের জন্যে আলাদা কর্মচারী থাকত— সে হিসাবরক্ষক ও কর-আদায়কারীর অধীন ছিল। এইসব কর্মচারীর পারিশ্রমিক হিসেবে তাকে কিছুটা জমিদান করা হতো, কিংবা তার কর মকুব করে দেওয়া হতো।

শহরাঞ্চলে আবার রাজকর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নিজস্ব শ্রেণীবিভাগ ছিল। শহর-পরিচালকের দায়িত্ব ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা। বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের তৈরি ছিল বলে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখতে হতো। হিসাবরক্ষক ও কর-সংগ্রাহক এখানেও গ্রামের মতোই তাদের কাজ করত। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে গেছেন। শহরের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ৩০ জন কর্মচারীর ওপর। এরা ৫ জন করে ৬টি কমিটিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কমিটির ওপর এক-এক ধরনের কাজের দায়িত্ব ছিল : শিল্প-সম্পর্কিত সমস্যা, বিদেশীদের দেখাশোনা, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপার, বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রির দেখাশোনা এবং বিক্রীত দ্রব্যগুলির ওপর কর আদায় (বিক্রয়মূল্যের এক-দশমাংশ)।

মৌর্য-শাসনব্যবস্থার একটা মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গুপ্তচর প্রথা। অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচর প্রথার প্রয়োজনের কথা বলা আছে। এই গ্রন্থের মতে, গুপ্তচরেরা সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, ছাত্র, ভিখারিণী ও বারবনিতার ছদ্মবেশে কাজ করবে। নীতিনির্ধারণ হতো কেন্দ্র থেকে, তবে কাজ চলত স্থানীয় উদ্যোগেই। এই পদ্ধতিতে রাজার পক্ষে সাম্রাজ্যের দূরতম অংশগুলির ওপর নজর রাখা সম্ভব হতো। মৌর্য-সাম্রাজ্যের পক্ষে এটা ছিল অপরিহার্য।

এইরকম পটভূমিকায় অশোক এক নতুন ধারণার প্রবর্তন করলেন যা ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে আগে আর দেখা যায় নি। এ ব্যাপারটা আধুনিক ভারতে অত্যন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করার ফলে অশোক অত্যন্ত জনপ্রিয়* হয়ে উঠেছেন। এর ভিত্তি হল 'ধম্ম'। সংস্কৃত ধর্ম শব্দটির প্রাকৃত অপভ্রংশ হল ধম্ম। প্রসঙ্গভেদে এর অর্থ হল— সার্বজনিক নিয়ম, জাগতিক রীতি, ন্যায় ও সত্যের পথ ; অথবা পরিবর্তিত রূপে এর অর্থ দাঁড়ায় হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ। তবে অশোকের শিলালিপি থেকে দেখা যায়, এসময়ে শব্দটি আরো ব্যাপক সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হতো।

অশোক সম্পর্কে আগে যা গবেষণা হয়েছে তার ভিত্তি ছিল অশোকের শিলালিপি ও সিংহলের বৌদ্ধ-বিবরণ। এর ফলে শিলালিপির ব্যাখ্যার মধ্যে একটা বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঘটনাটিকে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হতো। ধর্মান্তরের পর তাঁকে বৌদ্ধধর্মানুরাগের মহত্তম

* ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে অশোকস্তম্ভের শীর্ষের চারটি সিংহের মূর্তি

উদাহরণ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। একজন ঐতিহাসিক এমনও দেখিয়েছিলেন যে অশোক ছিলেন একাধারে সম্রাট ও সন্ন্যাসী। অশোক সন্দেহাতীতভাবেই বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন ও নিজের আচরণেও বৌদ্ধরীতির অনুসরণ করতেন। কিন্তু তখনকার সময়ে বৌদ্ধধর্ম কেবলই একটি ধর্মবিশ্বাস ছিল না—একটা সামাজিক ও বুদ্ধিবাদী আন্দোলন হিসেবেও নানাবিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। স্বভাবতই যে-কোনো বিজ্ঞ রাজনীতিকেই বৌদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হতো।

অশোকের শিলালিপি দুধরনের। একধরনের শিলালিপির মধ্যে দেখা যায়, সম্রাট বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে বৌদ্ধসংঘ ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করে নানাকথা লিখেছেন। তাতে তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ এবং সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। এগুলো পড়ে মনে হয়, তিনি অন্য ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু গোঁড়া বিশ্বাসীর মতো কথা বলছেন। এক জায়গায় লেখা আছে, ভিন্নমতাবলম্বী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর-একটি শিলালিপিতে সেইসব বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির তালিকা আছে—যেগুলির সঙ্গে সমস্ত ধার্মিক বৌদ্ধেরই পরিচিত হওয়া কর্তব্য। তবে আর-এক ধরনের শিলালিপি পাওয়া গেছে—যেগুলি সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি সমস্তই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা। এ ছাড়া কিছু কিছু লিপি বিশেষভাবে নির্মিত স্তম্ভের গায়ে লেখা হয়েছিল। যেসব জায়গায় জনসমাগম হতো, সেসব জায়গায় এই স্তম্ভগুলি বসানো হতো। এগুলিকে বলা চলে, জনসাধারণের প্রতি সম্রাটের সাধারণ ঘোষণা। এর মধ্যে 'ধম্ম' সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করা থাকত। মৌর্য আমলের পরিপ্রেক্ষিতে অশোকের প্রধান কৃতিত্ব এটাই যে— অশোক ব্যক্তিগত পুণ্যলাভের জন্যে শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচরণ করার কথা ভাবেন নি। তিনি 'ধম্ম'কে দেখেছিলেন একটা সামাজিক দায়িত্ববোধের মনোভাব নিয়ে। অতীতের ঐতিহাসিকরা অশোকের 'ধম্ম'কে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন এবং তাঁরা মনে করেন, অশোক বৌদ্ধধর্মকে সরকারিভাবে রাজধর্মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশোকের উদ্দেশ্য তাই ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ধম্মের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও মানুষের পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কিত একটা বিশেষ মনোভাব তৈরি করা। সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক কাজকর্মে মানবীয় ভাবের সঞ্চারই ছিল এর লক্ষ্য।

যেসব পরিস্থিতির ফলস্বরূপ এই আদর্শের সূত্রপাত হয়েছিল, তা এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এই আদর্শের জন্ম হয়েছিল অশোকের মনে। কিন্তু অশোক এও বুঝেছিলেন, এই আদর্শ প্রচারের দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে। অশোকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের একটা প্রভাব ছিল। পরিবারগতভাবে মৌর্যরা প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করতেন, যদিও সেজন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদকে কখনো আঘাত করেন নি। এইসব বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সমাজে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়াও অসন্তোষের অন্যান্য কারণ ছিল। যেমন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন, শহরে সমবায় সংঘগুলির

প্রবল ক্ষমতা, কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার চাপ ও সাম্রাজ্যের বিপুল আয়তন। মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের এমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল যা সমস্ত বিরোধী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও ঐক্যের সম্ভাবনা আনবে। মৌর্য-সাম্রাজ্যের গঠন এমন ছিল যে, এই সম্ভাবনার সূচনা হতে পারত একমাত্র সম্রাটের কাছ থেকেই। ঐক্যপ্রতিষ্ঠার মূলসূত্র খুঁজতে গিয়ে অশোক প্রাথমিক চিন্তাগুলির ওপর জোর দিলেন এবং এইভাবে তাঁর ধর্মনীতির জন্ম হল।

যে-কোনো ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাছেই 'ধম্মের' নীতিগুলি গ্রহণযোগ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন তেমন কিছু ছিল না। মনে হয়, এই অস্পষ্টতা ছিল ইচ্ছাকৃত। কেবল মূল নীতিগুলি স্পষ্ট করে উল্লিখিত হতো। এগুলিতে মানুষের সাধারণ আচার-আচরণকে উন্নত করার কথাই বলা থাকত। মূল নীতিগুলির মধ্যে অশোক সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন সহনশক্তির ওপর। এই সহনশক্তি ছিল দু'ধরনের— মানুষকে সহ্য করা এবং তাদের বিশ্বাস ও ধারণাকেও সহ্য করে নেওয়া। তিনি লিখেছেন :

> …ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের প্রতি সুব্যবহার, পিতামাতার প্রতি আনুগত্য, বন্ধু, পরিচিত, আত্মীয়, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের প্রতি উদারতা…। ঈশ্বরের প্রিয়-পাত্ররা সমস্ত গোষ্ঠীর সমান উন্নতির চেয়ে নিজের সম্মান বৃদ্ধিকে বড় করে দেখেন না। নিজের বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে— নিজের গোষ্ঠীকে বেশি করে প্রশংসা করা ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।… সবসময় অন্য মানুষের গোষ্ঠীকেও সম্মান জানাতে হবে। এভাবেই নিজের গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়বে ও অন্য গোষ্ঠীরও ভালো করা হবে। অন্যথায় নিজের গোষ্ঠীর প্রভাব কমে যাবে ও অন্যটিরও ক্ষতি করা হবে…। সুতরাং সমন্বয়ই কাম্য, যাতে মানুষ একে অপরের আদর্শ জানতে পারে…।[৫]

এইভাবে সকলের মধ্যে ঐক্য-সমন্বয়ের আদর্শে মতবিরোধকে চাপা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হল। কিন্তু এও বলা যায় যে, বিভিন্ন মত প্রকাশ্যে আলোচনা করে ও মতপার্থক্যের কথা স্বীকার করে নিয়েই সহনশক্তির প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায়। মতপার্থক্য চাপা দিতে গেলে তা আরো বেড়ে ওঠে, সন্দেহ জাগে সম্রাটের হয়তো ভয় ছিল যে, মানুষ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। উৎসব উপলক্ষে জমায়েত বা সভাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই নিষেধের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল— এইসব জমায়েত থেকেই বিরোধী-গোষ্ঠীর জন্মের সূচনা হতো।

'ধম্মে'র আর একটি মূলনীতি ছিল অহিংসা। যুদ্ধ ও হিংসা পরিত্যাগ, প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের মধ্যে অহিংসার আদর্শ প্রতিফলিত হতো। অশোক জানতেন, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ না করলে চলে না। তাই, সম্পূর্ণ অহিংসার কথা কখনো তিনি জোর দিয়ে বলেন নি। কয়েকটি আদিবাসী অরণ্যচারী দলকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত দমন করা সম্ভব হয় নি। একটি আবেগময় শিলালিপিতে যুদ্ধের বিষময় ফল সম্পর্কে তিনি সচেতন করে দিয়েছেন। লিখেছেন—

ধম্মনীতিতে অবিচল থেকে তিনি ভবিষ্যতে আর শক্তিপ্রয়োগ করবেন না। আরো আশা করে গেছেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরাও হিংসা দ্বারা রাজ্য জয় করার চেষ্টা করবেন না। যদি কখনো তা অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে যেন শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারে করুণা ও ক্ষমার অভাব না হয়।

'ধম্ম' নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি উপদেশ ছিল যা এখনকার যুগে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে নাগরিকদের হিতের জন্যে মেনে চলা হয়। সম্রাট দাবি করেছেন

আমি পথের ধারে ধারে বটগাছ রোপণ করেছি, মানুষ ও পশু গাছের ছায়া উপভোগ করবে। আমি আম্রকুঞ্জ স্থাপন করেছি, কূপ খনন করেছি ও ৯ মাইল অন্তর একটি করে বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছি।···মানুষ ও পশুর জলপানের জন্যেও বহু জলসত্র স্থাপন করে দিয়েছি। এইসব কাজ করা প্রয়োজন। আমার আগে বহু রাজাই এই পৃথিবীর জন্যে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আমি এসব কাজ করলাম যাতে আমার প্রজারা 'ধম্মে' অনুরাগী হয়।[৬]

'অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বলিদান' সম্পর্কে অশোক কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন, যাত্রা নিরাপদ করা বা অসুখ থেকে দ্রুত আরোগ্যের আশায় যেসব অনুষ্ঠান করা হতো তা সবই কুসংস্কারজাত। এগুলির ওপর নির্ভর করেই একশ্রেণীর পুরোহিত জীবিকানির্বাহ করত। ধম্মনীতি কার্যকর করার জন্যে 'ধম্ম' প্রচারক একদল কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। কিন্তু ক্রমশ ধম্ম-নীতির ওপর ভিত্তি করে নতুন একদল পুরোহিতের সৃষ্টি হল। তারা মানুষের জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করল যার ফলে ধম্ম-নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই কিছুটা নষ্ট হয়ে গেল।

সবকিছু সত্ত্বেও ধম্ম-নীতি সফল হল না। এর কারণ হয়তো এই যে, তাঁর নীতিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে অশোক অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কিংবা তাঁর রাজত্বের শেষভাগে ধম্ম নিয়ে তিনি যেরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, সেটা একরকম দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। যেসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি, সেগুলির সমাধান কিন্তু হয় নি। সামাজিক উত্তেজনা ও ভেদভাব রয়ে গেল, গোষ্ঠীগত বিরোধ বেড়েই চলল। মনে হয়, সমস্যাগুলো যেখানে সমাজব্যবস্থার একেবারে ভেতরে বাসা বেঁধে ছিল 'ধম্ম' সেখানে পেঁছতে পারে নি, কারণ ধম্মের অনুশাসন ছিল বড় ভাসাভাসা। তবুও ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে এই প্রচেষ্টা করার জন্যে অশোক প্রশংসার যোগ্য।

৩৭ বছর রাজত্ব করার পর অশোকের মৃত্যু হয় ২৩২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পরই রাজনৈতিক পতন শুরু হয়ে গেল এবং সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতেও দেরি হল না। কেবল গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই মৌর্যরা আরো ৫০ বছর রাজত্ব করল। ব্যাক-ট্রিয়ান গ্রীকরা ১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দখল করে নিল। ভারতীয় উপমহাদেশে অধিকাংশ সাম্রাজ্যের পতনের যা কারণ, মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের কারণও অনেকাংশে একই। অতীতে বলা হতো, অশোকের শাসননীতিই পতনের মূল। বলা হতো, বৌদ্ধদের প্রশ্রয় দিয়ে অশোক ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশোকের নীতি বৌদ্ধ অনুরাগী বা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী

ছিল না। তাঁর নীতি যে-কেউ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত। আরো অভিযোগ, তাঁর অহিংসা নীতির বাড়াবাড়ির ফলে সৈন্যবাহিনী হতবীর্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর অহিংসা নীতি এতটা অবাস্তব ছিল না। শিলালিপিতেও সৈন্যবাহিনীকে দুর্বল করার কথা নেই।

প্রকৃত কারণ বোধহয় অন্যত্র খুঁজতে হবে। মনে হয়, মৌর্য-অর্থনীতি নানাদিক থেকে আঘাত পায়। বিরাট সৈন্যবাহিনীর খরচ, সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং নতুন নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন ইত্যাদি কোষাগারকে অর্থশূন্য করে তুলেছিল। খননকার্যের পর দেখা গেছে, মৌর্য শহরগুলির ধ্বংসস্তূপে প্রথমযুগে যেমন বাঁধুনি অর্থনীতির প্রমাণ পাওয়া যায়, পরেরযুগের মুদ্রাগুলির নিকৃষ্টতা দেখে বিপরীত অবস্থার কথাই মনে হয়। মুদ্রাগুলির মধ্যে রুপোর ব্যবহার ক্রমশ কমে এসেছিল। অর্থাৎ, কোষাগারে অর্থাগমের পরিমাণ আর অর্থ ব্যয়ের পরিমাণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না ; এ ছাড়া অন্য অর্থনৈতিক প্রশ্নও আছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি চালু থাকলেও গোটা সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলি থেকে যা আদায় হতো, তা পুরো সাম্রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় ওই পার্থক্য হয়তো অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে ব্যাহত করেছিল।

সাম্রাজ্যের পক্ষে দুটি জিনিস অপরিহার্য— একটি সুপরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও প্রজাদের রাজনৈতিক আনুগত্য। মৌর্যদের শাসনব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সুপরিচালিত মনে হলেও কয়েকটি প্রাথমিক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল। সম্রাটকে কেন্দ্র করে যে আমলাতন্ত্র, তাদের আনুগত্য ছিল সম্রাটের প্রতিই। রাজাবদল হলে আনুগত্যেরও পরিবর্তন ঘটত। কখনো বা কর্মচারীও বদল হতো। নিয়োগের কোনো নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। স্থানীয় শাসনকর্তারা নিজেদের পছন্দমতো কর্মচারী নিয়োগ করতেন। ফলে একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেই নিয়োগ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। অর্থাৎ, স্থানীয় দলাদলির প্রভাব এসে পড়ল শাসনব্যবস্থার ওপর। কিন্তু সুচিন্তিত নিয়োগব্যবস্থার মাধ্যমে এই দলাদলি ও বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারত। এই প্রসঙ্গে চীনা পরীক্ষাপদ্ধতির কথা মনে আসে। মৌর্যরা তেমন কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করলে সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতো। এ ছাড়া জনমত স্থির রাখার জন্যে কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় এটাও একটা সমস্যা রয়ে গেল। মৌর্যদের গুপ্তচর ব্যবস্থার ফলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

রাজনৈতিক আনুগত্যের মধ্যে একটা বড় কথা হল, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং রাষ্ট্র হল রাজা ও তাঁর সরকারের চেয়েও বড় একটা কল্পনা। ভারতে গণরাজ্যগুলির পতন শুরু হতেই রাষ্ট্রসম্পর্কিত ধারণাও যেন চাপা পড়ে গেল। রাজতন্ত্র নির্ভর করত ধর্মীয় সংস্কারের উপর। কিন্তু ক্রমশ রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণাটিকে অস্পষ্ট করে তুলল এবং আনুগত্য তৈরি হল সামাজিক রীতির প্রতি।

রাজনীতি ও বর্ণপ্রথার পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে অন্য যে-কোনো রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বর্ণাশ্রমই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। রাজা ও রাজার কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন থেকেই এটা বোঝা যায়। ব্রাহ্মণরা রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজার দৈবক্ষমতা নয় সামাজিক চুক্তির বিষয়েই জোর দিল। এমন-কি ব্রাহ্মণরাও এরপর চুক্তির কথা বলেছে, কারণ তারাও একটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির প্রয়োজন বোঝে। রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করা ছাড়াও ব্রাহ্মণরা তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে বলে যে, মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে একটা চুক্তির ফলেই এই ক্ষমতা রাজার হাতে এসেছে। পূর্বে মাৎস্যন্যায়ের ভীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো সমাজে আইন না থাকলে বিশৃংখলার সৃষ্টি অনিবার্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যে দুটো ব্যাপারের প্রয়োজনের কথা বলা হল— দণ্ড ও ধর্ম। দণ্ডের সাহায্যে রাষ্ট্র আইন জারি করতে পারত। আর, ধর্ম হল সামাজিক রীতি। ক্রমশ ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার স্থান নিল। এ ছাড়াও, দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজাও অন্যায়ের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। সত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা যেত।

রাজনীতি-তত্ত্বের গ্রন্থাদি অনুযায়ী এসময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী হিসেবে ধরা হয়েছে রাজা ও রাজসরকারকে। কার্যক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে, যদিও অন্যভাবে বলা যায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিমূর্তভাবে ন্যস্ত ছিল 'ধর্মে'র ওপর। রাজার কর্তব্য ছিল সমাজব্যবস্থার রক্ষা ও পালন করা। সমাজব্যবস্থা অবশ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়— কিন্তু এই পরিবর্তন আসে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে। ফলে লোকের আনুগত্য অপরিবর্তিত থাকে। এই সমাজব্যবস্থা দেবতাদের অনুমোদিত বলে সেটি রক্ষা করা একটি পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো। সমাজব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রথমে শুরু হয় অত্যন্ত স্থানীয়ভাবে, প্রধানত বর্ণপ্রথার মধ্য দিয়ে। একদিক দিয়ে সেটাও ব্যাপক ঐক্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারী সরকারের প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে গেল ১৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আরো পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি কখনোই এরকম ছিল না। পরবর্তীকালে আগের মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারণ, রাজা ও প্রজার মধ্যে সরকারি কর্মচারী ও ভূস্বামীরা এসে পড়ল এবং রাজা এদের হাতে তাঁর অনেকটা ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। পতিত জমির নিয়মিত উন্নতির ফলে অকর্ষিত অঞ্চল কমে এলো। বৃহৎ সৈন্যদলের ভরণপোষণ ও রাজাজোড়া বিরাট ক্রিয়াকলাপের জন্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, রাজস্ব থেকে ততটা অর্থাগমের নিশ্চয়তা ক্রমশ কমে এলো। সাম্রাজ্যলিপ্সা না কমলেও প্রথমদিকে যেরকম উৎসাহ ও প্রয়োজনের তাগিদে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পরবর্তী-যুগে ততটা আর দেখা যায় নি।

৫

সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

আনুমানিক ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ

মৌর্যযুগের অবসানের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ কিছুটা অস্পষ্ট। অনেক রাজা, নানান যুগ, বহুপ্রকার মানুষ ও বিভিন্ন রাজবংশের জটিলতায় আচ্ছন্ন এই সময়। ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে বেড়াতে হয়েছে নানা জায়গা থেকে। এমনকি, সু-মা-চিয়েনের (Ssu-ma-chien) লেখা চীনের ইতিহাস থেকেও কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। দক্ষিণ-ভারত ও উপকূল অঞ্চলের মানুষ যখন নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে ব্যস্ত, উত্তর-ভারত তখন মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতার ঘূর্ণাবর্তে প্রবিষ্ট। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এই উপমহাদেশ অনেকগুলি রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং এক-একটি অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষাও হল এক-এক রকম। মনে হতে পারে, এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোনোরকম রাজনৈতিক যোগসূত্র অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা যেমনই ঘটুক না কেন, একটা যোগসূত্র সত্যিই বজায় ছিল।

১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মৌর্যসাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উত্তরাধিকারী হল শুঙ্গরা। এরা ছিল অজ্ঞাত এক ব্রাহ্মণবংশজাত। পশ্চিম-ভারতের উজ্জয়িনী অঞ্চল থেকে আগত শুঙ্গরা মৌর্যদের অধীনে কর্মচারী ছিল। শুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্যরাজাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন। বৌদ্ধ সূত্র থেকে জানা যায়, পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করেন তাদের উপাসনার স্থানগুলি, বিশেষত যেগুলি অশোকের তৈরি, ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত, কেননা এসময়ে বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভগুলি নতুন করে নির্মিত হয়েছিল— তার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য রয়েছে। অবশ্য পুষ্যমিত্র নিজে ব্রাহ্মণদের সমর্থক ছিলেন (এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা তিনি নিজেও ছিলেন ব্রাহ্মণ)। তিনি দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন।

শুঙ্গদের সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশের রাজ্যগুলির সঙ্গেও যেমন লড়াই হয়েছে, তখন উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক আক্রমণ আর দক্ষিণ-পূর্বে কলিঙ্গরাজ্যের সঙ্গেও যুদ্ধ চলেছে সমান তালে। প্রাথমিকে শুঙ্গদের অধীনে ছিল সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ও উত্তর-ভারতের কিছু অংশ। কিন্তু ক্রমশ কয়েকটি অঞ্চলের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়ে কেবল রাজনৈতিক আনুগত্যের আশ্বাসই অবশিষ্ট রইল। ১০০ বছরের মধ্যেই শুঙ্গদের সাম্রাজ্য এসে ঠেকলো কেবল মগধ অঞ্চলটুকুতে এবং এখানেও তাদের অস্তিত্ব শঙ্কাজনক হয়ে উঠল। শুঙ্গদের পর রাজত্ব পেল কাণ্বরা এবং তারা রাজত্ব করল ২৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এদের রাজত্বেও ওই অনিশ্চিত অবস্থা চলতে লাগল প্রায় ৫০ বছর ধরে।

মগধের কাছে কলিঙ্গ সব সময়ই একটা উদ্বেগের কারণ ছিল। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা খারবেলার নেতৃত্বে কলিঙ্গর উত্থান ঘটেছিল। উড়িষ্যার হাতিগুম্ফায় একটি দীর্ঘ শিলালিপি পাওয়া যায়। তার মধ্যে তাঁর জীবনবৃত্তান্তও আছে। কিন্তু শিলালিপিটি এত ক্ষতবিক্ষত যে পড়তে গিয়ে নামের পাঠোদ্ধারে ভুল হতে পারে। খারবেলা ছিলেন জৈন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যজয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধজয়ও করেছিলেন। শোনা যায়, পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের রাজাকে তিনি পরাজিত করেন, উত্তরে রাজগৃহ অধিকার করেন, মগধ জয় করেন ও উত্তর-পশ্চিমে গ্রীকদের আক্রমণ করেন। এছাড়া আরো দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের কিছু কিছু অংশ দখল করে পাণ্ড্য রাজাদের প্রতি অসম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে গাধার সাহায্যে হলকর্ষণ করে আসেন। খারবেলা তাঁর শিলালিপিতে নন্দদের নির্মিত সেচ প্রণালীগুলির কথা উল্লেখ করে এবিষয়ে তাঁর নিজের কীর্তির জন্যে গর্বপ্রকাশ করেন। মৌর্যদের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে শিলালিপির অস্পষ্ট অংশগুলির মধ্যে হয়তো এবিষয়ে কিছু লেখা ছিল। সম্ভবত অশোকের অভিযানের তিক্ত স্মৃতি তখনো কলিঙ্গবাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি। এইসব যুদ্ধজয় ছাড়াও খারবেলা দাবি করেন, প্রজাদের উন্নতির জন্যে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। শিলালিপির অলংকারবহুল ভাষা কিছুটা অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট বলে মনে হয়। আর রাজকীয় স্তুতিবাদ তো ছিলই। খারবেলার মৃত্যুর পর কলিঙ্গ আবার এক নিস্তরঙ্গ রাজ্যে পরিণত হল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরেও গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ হয়নি। বরং পরে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারত-গ্রীক সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেসব গ্রীক রাজা সে সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের বলা হতো ইন্দো-গ্রীক। ইরাণে অ্যাকামেনিডদের রাজত্বের অবসান ও আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ইরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির রাজা হয়ে গেলেন আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা। যখন সমগ্র অঞ্চলটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল, ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক শাসকবৃন্দ ও পার্থিয়ার ইরানীয় শাসকরা সবচেয়ে বেশি সুবিধে আদায় করে নিলেন। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এ'রা সেলুসিড-নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত স্বাধীন-ভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করলেন।

প্রথমদিকে ব্যাকট্রিয়া ছিল বেশি শক্তিশালী। হিন্দুকুশ ও অকসাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক উর্বর ও প্রাকৃতিক সম্পদশালী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এই ব্যাকট্রিয়া রাজ্য। তাছাড়া, গান্ধার থেকে পারস্য যাবার রাস্তা ও সেখান থেকে কৃষ্ণসাগর ও গ্রীসে যাবার রাস্তায় যেতে হতো ব্যাকট্রিয়ার মধ্য দিয়েই। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক অধিবাসীরা এসেছিল অ্যাকামেনিডদের সময়ে (মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে)। তখন পারস্য সম্রাটরা গ্রীক দেশত্যাগীদের এখানে বসবাস করতে দিয়েছিলেন। ব্যাক-ট্রিয়ার মুদ্রাগুলি থেকে মনে হয়, এই রাজ্যের সঙ্গে গ্রীসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (যেমন, রাজা সোফাইটিসের মুদ্রাগুলি এথেন্সের 'পেচক-মূর্তি' সম্বলিত মুদ্রাগুলির

অণুকরণে তৈরি)। জমির উর্বরাশক্তি ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে এখানে বড় বড় সম্পদশালী নগর গড়ে উঠল।

ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা ডায়োডোটাস সেলুসিড রাজা অ্যান্টিওকাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অ্যান্টিওকাস আরো গুরুত্বপূর্ণ মধ্য-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যস্ত থাকায় এই বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। সুতরাং ডায়োডোটাস স্বাধীন হয়ে গেলেন। সেলুসিড রাজারা ব্যাকট্রিয়াকে দমন করতে অসমর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত 'এর স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আনুমানিক ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ডায়োডোটাসের প্রপৌত্রের সঙ্গে এক সেলুসিড রাজকুমারীর বিবাহ হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে এক নগণ্য ভারতীয় রাজা সুভগসেনকে পরাজিত করা ছাড়া সেলুসিড রাজা আর কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তিনি সুভগসেনের কাছ থেকে অনেকগুলি হাতি ও অন্যান্য উপহার আদায় করেছিলেন।

২০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সুভগসেনের পরাজয়ের পর বোঝা গেল, উত্তর-পশ্চিম ভারত প্রায় অরক্ষিত। ইউথিডেমাসের (যিনি সেলুসিড রাজাকে হারিয়ে দেন) পুত্র ডিমেট্রিয়াস দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অভিযান শুরু করলেন। তিনি জয় করলেন আরাকোসিয়া ও পূর্ব গেড্রোসিয়া (বর্তমান দক্ষিণ-আফগানিস্তান ও মাকরান অঞ্চলগুলি)। দ্বিতীয় ডিমেট্রিয়াস আরো এগিয়ে এলেন। পাঞ্জাবে প্রবেশ করে সিন্ধু উপত্যকার মধ্য দিয়ে বদ্বীপ অঞ্চল ও তারপর কচ্ছ পর্যন্ত চলে এলেন। এইভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইন্দো-গ্রীক রাজত্বের সূচনা হল।

ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মিনান্দার। তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ 'মিলিন্দ-পন্‌হো' (রাজা মিলিন্দর প্রশ্ন) প্রসঙ্গেও বেশ পরিচিত। বইতে তাঁর নাম বলা হয়েছে— মিলিন্দ। বইটি হল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের ওপর রাজা মিনান্দার ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগসেনের আলোচনার সংকলন। তারপরই মিনান্দার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মিনান্দার ইন্দো-গ্রীক শক্তিকে আরো দুর্ধর্ষ করে তুললেন। রাজ্যের সীমানাও বেড়ে চললো নানাদিকে। তার রাজত্বকাল ছিল ১৫৫-১৩০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। তাঁর অধিকারে ছিল সোয়াট উপত্যকা, হাজারা জেলা ও ইরাবতী (রাভি) নদী পর্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাব। তাঁর মুদ্রা খুঁজে পাওয়া গেছে উত্তরে কাবুলে এবং দিল্লীর কাছে মথুরায়। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল। পাটলিপুত্রে না হলেও যমুনা অঞ্চলে, তিনি যে শুঙ্গদের আক্রমণ করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ আগুনে পোড়ানো হয়। শোনা যায়, তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে দেহাবশিষ্ট ভস্মের জন্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। অবশ্য সন্দেহ হয়, হয়তো গ্রীকরা এসব কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কাহিনীর সঙ্গে মিনান্দারের মৃত্যুর কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছেন।

ইন্দো-গ্রীকদের ইতিহাস রচনায় সাহায্য পাওয়া গেছে প্রধানত তাদের গ্রীক ও পরে 'ব্রাহ্মী' লিপিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা থেকে। অনেক রাজার একই নাম ছিল এবং মুদ্রাগুলির মধ্যেও তেমন পার্থক্য না থাকায় এই সাক্ষ্য অনেক সময়েই বিভ্রান্তিকর

হয়ে পড়েছে। মিনান্দারের পর কোনো রাজার বদলে রাজপ্রতিনিধির শাসন চললো। তারপর এলো স্ট্র্যাটোর রাজত্বকাল। ওদিকে ইউক্রাটাইডিসের বংশের এক ধারা তখন ব্যাকট্রিয়ায় রাজত্ব করছিল। এই বংশের রাজারা গান্ধারের দিকে অগ্রসর হলেন। কাবুল পেরিয়ে তাঁরা তক্ষশিলা অধিকার করে ফেললেন। হিন্দুকুশ পেরিয়ে রাজ্য-জয়ের ইচ্ছে ছিল পার্থিয়ার রাজাদেরও। কথিত আছে, রাজা প্রথম মিথ্রিডেটিস (আনুমানিক ১৭১-১৩৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) নাকি তক্ষশিলা জয় করেন। কিন্তু তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত গ্রীকরাই তক্ষশিলার শাসক ছিল।

পশ্চিম-ভারতের বেসনগরে একটি স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে। এটির নির্মাতা ছিলেন বেসনগরের রাজার (সম্ভবত শুঙ্গবংশীয়) সভায় তক্ষশিলার রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস প্রেরিত দূত হেলিওডোরাস। ইনি বাসুদেবের (বিষ্ণুর আর এক নাম) ভক্ত ছিলেন। অর্থাৎ, গ্রীক হওয়া সত্ত্বেও ইনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তক্ষশিলা বেশিদিন ব্যাকট্রিয়ার রাজাদের হাতে রইল না।

উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক রাজ্যগুলির পতনের সময় আঘাত এলো ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের ওপরই। মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি যাযাবর উপজাতি এই রাজ্য আক্রমণ করল। এদের মধ্যে সিথিয়ান বা শকরাই ছিল প্রধান। এইসব উপজাতির পশ্চিমদিকে আগমনের কারণ ছিলেন চীনাসম্রাট শি হুয়াং তি। ইনিই হিউং-নু, উ-সুন ও ইয়ে-চি যাযাবর উপজাতিগুলির আক্রমণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। এইসব যাযাবররা পশুচারণ করত এবং পশ্চিম-চীনের সমভূমিতে পশুর পাল নিয়ে আসত তৃণভূমির সন্ধানে। এক এক জায়গার পশুখাদ্য নিঃশেষিত হয়ে গেলে এরা আরো নতুন পশুচারণভূমির সন্ধান করত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সভ্য চীনাদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে আনত। কিন্তু চীনাপ্রাচীর নির্মাণের পর ওদের আর চীনে ঢোকবার উপায় রইল না। বিশেষত শি হুয়াং তি-র পর যে হান রাজবংশের শাসন শুরু হল, সেই বংশের রাজারা প্রাচীরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করে তুললেন। অতএব উপজাতিগুলি এবার দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পা বাড়ালো। তিন প্রধান উপজাতির মধ্যে ইয়ে-চি-দের ভালো জমি ফেলে রেখে মহাদেশের অন্যপ্রান্তে পালিয়ে আসতে হল। এরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল— ছোট ইয়ে-চি-রা, উত্তর-তিব্বতে গিয়ে বসবাস শুরু করল। আর একদল— বড় ইয়ে-চি-রা, আরো পশ্চিমে আরাল সাগরের তীরে এসে ঘুরতে লাগল। এখানে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিল। এই অধিবাসীরাই হল সিথিয়ান বা ভারতবর্ষে যাদের বলা হতো শক। এরপর শকরা, চলে এলো ব্যাকট্রিয়া ও পারথিয়ায়। একজন চীনা ভ্রমণকারী লিখেছেন, ১২৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আরাল সাগর অঞ্চলে শকদের বদলে ইয়ে-চি-রা বসবাস শুরু করে দিয়েছে। দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিসের রাজত্বকালের স্বল্প সময়টুকুর পর পার্থিয়া আর শকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারল না। ৮৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শকরা পার্থিয়া দখল করে নিল। তারপর কোয়েটার কাছে বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়ে শকরা সিন্ধু উপত্যকায় হু হু করে এগিয়ে এসে

একেবারে পশ্চিম-ভারতে এসে থামল। তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল দিল্লীর কাছে মথুরা থেকে উত্তরে গান্ধার পর্যন্ত।

ভারতের ইতিহাসে শকদের আগমনের পর থেকে বিভিন্ন চীনাসূত্রে মধ্য-এশিয়ার ঘটনাবলী যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা ভারতীয় ইতিহাসের পক্ষেও অর্থবহ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আছে শকদের তৈরি মুদ্রা ও লিপির সাক্ষ্য ও সাহিত্যকর্মের মধ্যে পাওয়া উল্লেখ। ভারতের প্রথম শকরাজা হলেন মোয়েস বা মোগা (আনুমানিক ৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)— ইনি গান্ধারে শক ক্ষমতা বিস্তার করলেন। পরবর্তী শক রাজা আজেস উত্তর-ভারতের শেষ গ্রীকরাজা হিপোস্ট্রেটসকে আক্রমণ করলেন। পরবর্তী আর এক রাজা গণ্ডোভারনেসের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে সেণ্ট টমাসের সূত্রে। শোনা যায়, সেণ্ট টমাস ইজরায়েল থেকে রাজা গণ্ডোফারনেসের সভায় এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে গণ্ডোফারনেসের শাসনকাল দাঁড়াচ্ছে প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ইরানের সেলুসিড ও অ্যাকামেনিড শাসনব্যবস্থার সঙ্গে শক শাসন-ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে। রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলির সামরিক শাসনকর্তাদের বলা হতো 'মহাক্ষত্রপ'। এই প্রদেশগুলি আরো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা ছিল নিম্নপদস্থ শাসনকর্তাদের অধীনে। শাসনকর্তারা রীতিমতো স্বাধীনতা ভোগ করতেন— এঁরা শুধু যে নিজেদের ইচ্ছামতো সংবৎ-এ অনুশাসন খোদাই করতেন তাই নয়, নিজেদের নামে মুদ্রাও জারি করতেন। শকরাজারা গ্রীক ও অ্যাকিমেনিডদের অনুকরণে 'মহারাজ', 'রাজাধিরাজ' ইত্যাদি মহিমান্বিত উপাধি ব্যবহার করতেন। শকরা কিছুকাল আগেও ছিল যাযাবর। কাজেই সাম্রাজ্য গঠনের রাজসিক চেষ্টা হয়তো তাদের বিভ্রান্ত করেছিল।

ইয়ে-চি-রা আরো একবার এসে শকদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। চীনা ঐতিহাসিক সু-মা-চিয়েন লিখেছেন, ইয়ে-চি-দের প্রধান কুজুল কদফিসেস একবার ইয়ে-চি-দের পাঁচটি উপদলকে সম্মিলিত করে উত্তরের পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়লেন। হার্মেয়ুসকে হারিয়ে তিনি কাবুল ও কাশ্মীর করায়ত্ব করলেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগের পরই ৮০ বছর বয়সে কুজুলের মৃত্যু হল। তাঁর ছেলে বিম কদফিসের রাজা হলেন। এঁর স্বর্ণমুদ্রাগুলিতে যথেষ্ট ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু কুজুলের মুদ্রাগুলি রোমান 'দীনারি' মুদ্রার অনুকরণে তৈরি ছিল, কেননা রোমের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হবার ফলে ওই মুদ্রাগুলি মধ্য-এশিয়ায় তখন প্রচলিত হয়েছিল।

এই প্রথম দুই রাজার সঙ্গে পরবর্তী রাজা কণিষ্কর সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। মথুরার কাছে কুষাণ রাজাদের যেসব প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কণিষ্কের একটি মূর্তি দেখে বেশ বোঝা যায় যে তাঁর পূর্বপুরুষরা মধ্য-এশিয়া থেকে এসেছিলেন। হয়তো প্রথম দুই রাজার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁর সময়েরই কুষাণ রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং উত্তর-ভারতের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে কুষাণ যুগ রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। কণিষ্ক সিংহাসনে বসে-ছিলেন ৭৮ থেকে ১৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। এই ৭৮ খ্রীস্টাব্দ

থেকে নতুন একটা বর্ষ গণনা শুরু হয়, যার নাম শকাব্দ।* সম্ভবত শকরাই তা শুরু করেছিল। কুষাণদের রাজ্য দক্ষিণে এসেছিল সাঁচী পর্যন্ত, পূর্বে বারাণসী আর মথুরাকে ধরা হতো প্রায় দ্বিতীয় রাজধানীরূপে। প্রকৃত রাজধানী পুরুষপুর ছিল আধুনিক পেশোয়ারের কাছে।

কুষাণদের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। 'বৌদ্ধরা কণিষ্ককে তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গণ্য করত এবং তাঁর রাজত্বকালেই চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল যাতে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতির আলোচনা হয়। এরপর বৌদ্ধদের কাজকর্মে নতুন একটা জোয়ার এলো এবং মধ্য-এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধ প্রতিনিধিদল পাঠানো হল। কণিষ্ক সম্ভবত মধ্য-এশিয়ার কোনো এক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। চীনা বিবরণ থেকে জানা যায়, এক-জন কুষাণ রাজা হানবংশীয় এক রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে সেনাপতি পান চাও মধ্য-এশিয়া অভিযানের সময় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কাহিনীটি যদি সত্যি হয় তাহলে উল্লিখিত রাজা ছিলেন বিম অথবা কণিষ্ক। কণিষ্কর উত্তরাধিকারীরা আরো ১৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের শক্তি হ্রাস হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে। পারস্যের ঘটনাবলী আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর তার ছায়া ফেললো। ২২৬ খ্রীস্টাব্দে আর্দাশীর পার্থিয়ানদের উচ্ছেদ করে সাসানিয়ান রাজত্বের সূচনা করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী পেশোয়ার ও তক্ষশিলা জয় করলেন তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে। কুষাণ রাজারা সাসানিয়ানদের সামন্তবর্গে পরিণত হল।

কুষাণদের আগমনের ফলে শকরা আরো দক্ষিণে কচ্ছ অঞ্চল, কাথিওয়াড় ও মালবে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পশ্চিম-ভারতের এইসব অঞ্চলে তারা পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রুদ্রদামনের নেতৃত্বে একটি নাটকীয় উত্থান ছাড়া এরা বাকি সময়টা চুপচাপই ছিল। কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণদের দুর্বলতার সুযোগে শকরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। রুদ্রদামন ছিলেন কচ্ছ অঞ্চলের অধিবাসী। জুনাগড়ে একটি দীর্ঘ শিলালিপি (সংস্কৃত ভাষায় এটিই সর্বপ্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি) থেকে তাঁর কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে জানা যায়। ১৫০ খ্রীস্টাব্দের এই শিলালিপিতে মৌর্য বাঁধটির সংস্কারের কথা (বাঁধটি এখনো ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে) পাওয়া যায়। তাছাড়া নর্মদা উপত্যকার অভিযান, সাতবাহন রাজাদের (নর্মদার দক্ষিণে) বিরুদ্ধে অভিযান, রাজস্থানের যৌধের উপজাতিদের বিরুদ্ধে রুদ্রদামনের যুদ্ধজয়ের কথা শিলালিপিতে রাজার প্রতি প্রচুর স্তুতিবাদসহ লেখা আছে। রুদ্রদামনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখা আছে:

> তিনি তাঁর হস্ত যথার্থভাবে উত্তোলন করে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তিনি ব্যাকরণ, সংগীত, তর্কবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রচুর অধ্যয়ন ও স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত। অশ্ব, হস্তী ও রথচালনা এবং অসিযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শী।...তিনি যুদ্ধে কৌশলী ও দ্রুতগতি। তিনি নিয়মিত উপহার ও

* বর্তমান ভারত সরকার গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে শকাব্দকেও অনুসরণ করেন।

সম্মান প্রদান করেন ও অশোভন আচরণ পরিহার করেন। নজরানা, খাজনা ও অন্যান্য ধরনের ন্যায়সংগত অর্থ আগমনে তাঁর রাজকোষ সততই স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড ও ফিরোজা পাথর ও অন্যান্য মহার্ঘ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকে। তাঁর রচিত গদ্য ও কাব্য সহজ, মিষ্টি, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। তাঁর শব্দচয়ন ও অলংকার যথাযথ। তাঁর সুগঠিত দেহ বিভিন্ন লক্ষণে শোভিত। তাঁর উচ্চতা ও স্বাস্থ্য, কণ্ঠস্বর, বর্ণ, চলনরীতি, উদ্দীপনা ও শক্তি— সবই সুলক্ষণযুক্ত। তিনি মহাক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। বহু স্বয়ংবর সভায় রাজকুমারীরা তাঁর গলায় বরমাল্য অর্পণ করেছেন।[১]

রুদ্রদামনের মৃত্যুর পর শকরা রাজনৈতিক গুরুত্ব হারালো এবং তাদের উত্থান হয় আবার চতুর্থ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন বংশের উত্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উত্তর-দাক্ষিণাত্য পূর্ণভাবে ভূমিকা গ্রহণ শুরু করল। বর্তমান নাসিককে ঘিরে দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিমাংশে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এদের অন্ধ্র রাজবংশও বলা হয়। সম্ভবত অন্ধ্র থেকেই এদের আগমন। পূর্ব উপকূলের কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী দুটির বদ্বীপ অঞ্চল থেকে এরা গোদাবরী নদীর তীর দিয়ে পশ্চিমদিকে চলে আসে। তারপর মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী বিশৃংখলার সুযোগে এরা নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। আবার অন্যমতে, এই রাজপরিবার এসেছিল পশ্চিমদিক থেকেই। তারপর পূর্বদিকেও নিজেদের রাজ্যবিস্তারের পর নিজেদের নামানুসারে অঞ্চলটির নাম দেয় অন্ধ্র। মৌর্য আমলেও অন্ধ্রের কথা শোনা গেছে। অশোক তাঁর শিলালিপিতে অন্ধ্রদের তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত এক উপজাতি বলে বর্ণনা করেছেন।

সম্ভবত সাতবাহনরা মৌর্যদের শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিল। পুরাণে আছে, দাক্ষিণাত্যে শুঙ্গদের যা শক্তি অবশিষ্ট ছিল, সাতবাহনরা তাও ধ্বংস করে দেয়।

সাতবাহন রাজাদের মধ্যে প্রথম যিনি বিখ্যাত হন, তাঁর নাম সাতকর্ণী। চতুর্দিকে সামরিক শক্তি বিস্তারের জন্যেই তাঁর খ্যাতি। তিনি ছিলেন 'পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু।' তিনি কলিঙ্গর রাজা খারবেলার কাছেও আনুগত্য স্বীকার করেন নি। তাঁকে 'প্রতিষ্ঠানের প্রভু' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের আধুনিক 'পৈইথাম'ই হল, তখনকার প্রতিষ্ঠান। তাঁর সামরিক অভিযান গিয়েছিল নর্মদা পেরিয়ে পূর্ব মালবে। এই অঞ্চলে তখন গ্রীক ও শক আক্রমণের আশঙ্কা। সাতকর্ণী সাঁচী অঞ্চল অধিকার করলেন। এখানকার একটি শিলালিপিতে তাকে 'রাজন শ্রীসাতকর্ণী' বলে অভিহিত করা আছে। এরপরে তিনি অভিযান চালালেন দক্ষিণদিকে। গোদাবরী উপত্যকা জয় করে তিনি উপাধি নিলেন 'দক্ষিণাপথপতি'। সাতকর্ণী ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক ছিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রমাণ সুদৃঢ় করেছিলেন।

কিন্তু পশ্চিম-দাক্ষিণাত্য বেশিদিন সাতবাহন রাজাদের দখলে রইল না। সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর সাতবাহনরা শোচনীয়ভাবে যুদ্ধে হেরে গেল। পশ্চিমদিক থেকে তাড়া খেয়ে তারা পালিয়ে এলো পূর্ব উপকূলে। কিন্তু এটা তাদের পক্ষে একরকম ভালোই



বাণিজ্য পথ
পশ্চিম এশিয়া,
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
উঃ
আরল সাগর
তাসখন্দ
তুরফান
কারাশর
কুচা
কাশগড়
তুন হুয়াং
মিরান
ইয়ারকন্দ
খোটান
কাবুল
হীরাট
কান্দাহার
তক্ষশিলা
ব্যাকট্রিয়া
একবাটানা
সুসা
পার্সিপোলিস
ব্যাবিলন
সেলুসিয়া
আলেকজান্দ্রিয়া
টায়ার
মিশর
আ র ব
এডেন
ইথিওপিয়া
আ ফ্রি কা
বারবারিকাম
মথুরা
উজ্জয়িনী
গঙ্গা নং
কলিঙ্গ
অজন্তা
কার্লে
ব্রহ্মদেশ
পেগু
মার্তবন
থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)
ফুনান
চম্পা
আরিকামেডু
কাবেরী পট্টিনাম
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
প্র শা ন্ত ম হা সা গ র
বোর্ণিও
মলাক্কা
বলি
0 ৪০০ ৮০০ ১২০০ ১৬০০
কিলোমিটার

হল, কেননা তারা অন্ধ্র অঞ্চলে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এরপর যখন তারা আবার পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করল, তখন দাক্ষিণাত্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত সবটাই তাদের দখলে। সাতকর্ণী যাদের সবচেয়ে ভয় করতেন, সেই শকরাই সাতবাহনদের কাছ থেকে পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল। শকরা নর্মদার উত্তরাঞ্চলে পশ্চিম-ভারতে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। নাসিক অঞ্চলে শক রাজা নহপানার কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় মনে হয়, প্রথম শতাব্দীতে শকরা এই অঞ্চল অধিকার করেছিল। কিন্তু বোধহয় এর অল্পদিন পরই সাতবাহনরা অঞ্চলটি আবার দখল করে নেয়। কেননা, নহপানার মুদ্রার ওপরই গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর ছাপ মারা আছে। এই রাজাই শকদের তাড়িয়ে দিয়ে এই অঞ্চলে সাতবাহনদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৌতমীপুত্র ও তাঁর ছেলে বাশিষ্ঠীপুত্রের রাজত্বকালে সাতবাহন রাজা বিশিষ্ট ক্ষমতারূপে গণ্য হয়েছিল। বাশিষ্ঠীপুত্রের আর একটি নাম ছিল শ্রীপুলুমবি। টলেমী ভারতের ভূগোল রচনার সময় বৈথানার (পৈথান) রাজা যে সিরোপলেমাইওসের উল্লেখ করেছেন, তিনি হয়তো পুলুমরি ছাড়া কেউ নন। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে দাক্ষিণাত্য এখন সম্পর্কের সেতু হয়ে দাঁড়ালো। এই যোগসূত্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়, বাণিজ্য ও নতুন চিন্তা বিনিময়েরও। বাশিষ্ঠীপুত্র লিখে গেছেন, গৌতমীপুত্র শকদের উচ্ছেদ করে ক্ষত্রিয়গর্ব খর্ব করেছিলেন। তিনি চারটি বর্ণের মধ্যে মিশ্রণও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে দ্বিজদের স্বার্থরক্ষার্থে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। হিন্দু আইনবিদ্‌রা শকদের মিশ্রবর্ণ ও গ্রীকদের শ্রেণীচ্যুত ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন। মিশ্রবর্ণ আখ্যা দেওয়াটা রীতিমতো মর্যাদা-হানিকর ছিল। গৌতমীপুত্রের মা একটি শিলালিপিতে লিখেছেন, গৌতমীপুত্র শক, যবন ও পল্লবদের বিতাড়িত করেছিলেন।* সম্ভবত এই শেষবারই গ্রীকদের সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পাওয়া গেল।

সাতবাহন ও শকদের বিবোধ মেটানোর উদ্দেশ্যে একটা বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যবস্থা হয় ও সাতবাহন রাজার সঙ্গে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।† কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পর্কের বোধহয় তেমন উন্নতি ঘটেনি। কারণ রুদ্রদামন বলেছেন, তিনি সাতবাহন রাজাকে দুবার যুদ্ধে পরাজিত করেন, কিন্তু নিকট সম্পর্কের জন্যে তাঁকে উচ্ছেদ করেন নি। রুদ্রদামনের মৃত্যুর পর সাতবাহনরা শকদের ওপর আবার আক্রমণ শুরু করল এবং তারা কিছুটা সাফল্যও লাভ করে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সাতবাহনদের রাজ্য পশ্চিম উপকূলে কাথিওয়াড়, কৃষ্ণার বদ্বীপ অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই বিরাট রাজ্য বেশিদিন থাকেনি।

* ভারতীয় সূত্রে 'যবন' অথবা 'যোন' অর্থে গ্রীকদেরই বোঝানো হয়েছে। সেই সঙ্গে, পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত অন্যান্য বিদেশীদেরও। শব্দটি এসেছে 'আয়োনিয়া' থেকে। 'পল্লব'রা ছিল পার্থিয়ান।

† সাতবাহনরা নিজেরা চতুর্বর্ণের মধ্যে মিশ্রণ বন্ধ করা নিয়ে গর্ব করত, কিন্তু শক পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের আপত্তি হয়নি। বর্ণভেদের শাস্ত্রগত রীতি ও কার্যত প্রচলিত প্রথা— এই দুইয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ ছিল, এটি তার আর একটি উদাহরণ।

পরবর্তী শতাব্দীতেই সাতবাহনের পতন শুরু হয় ও স্থানীয় শাসনকর্তারা উত্তরোত্তর অধিক শক্তি সঞ্চয় করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করে।

ইন্দো-গ্রীক রাজারা ও কুষাণরা পারস্য ও চীনের রাজাদের অনুকরণে নিজেরা বড় বড় উপাধি গ্রহণ করে নিজেদের রাজাকে বৃহৎ সাম্রাজ্য বলে আখ্যা দিতে চাইতেন। উপাধিগুলির মধ্যে ছিল 'মহারাজাধিরাজ' ও 'দৈবপুত্র'। এছাড়া আগের রাজাদের দেবতার সম্মান দিয়ে তাঁদের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠারও রীতি ছিল। সাতবাহনরা অবশ্য এই ধরনের মহিমময় উপাধি গ্রহণ করেননি। এর কারণ বোধহয় এই যে, স্থানীয় শাসনকর্তা ও রাজাদের ওপর সাতবাহনদের আধিপত্য একেবারে সার্বভৌম ছিল না। সাতবাহনদের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেও এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না করে রাজকর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। সাতবাহনদের রাজ্য কয়েকটি ছোট ছোট প্রদেশে বিভক্ত ছিল। 'অমাত্য' নামে একজন অসামরিক শাসনকর্তা ও 'মহাসেনাপতি' নামে একজন সামরিক শাসনকর্তার অধীনে ছিল একটি প্রদেশ। মহাসেনাপতিদের রাজপরিবারের বিবাহ করারও অনুমতি ছিল, সম্ভবত এই আশায় যে তার ফলে রাজবংশের প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়বে। কাউকে কাউকে নিজস্ব মুদ্রা তৈরিরও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সাতবাহনদের পতনের পর শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করল। রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় লোকরাই সাধারণত শাসনকার্য চালাতো। উত্তরে এবং দাক্ষিণাত্যেও গ্রামই ছিল ক্ষুদ্রতম শাসনকেন্দ্র। যতদিন গ্রাম থেকেই বেশি রাজস্ব ও সৈন্য সংগ্রহ হতো, ততদিন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়ত কেবল প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও তাদের কর্মচারীদের ওপর।

খ্রীস্টপূর্ব শেষ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করেছিল। সমসাময়িক ঘটনাবলীর পুঁথিগত বর্ণনাও পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলির (অর্থাৎ আধুনিক অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা) উল্লেখ আছে। যেমন চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র ও কেরলপুত্র। প্রথম দুটি পূর্ব উপকূলে শক্তিশালী ছিল ও তামিল সংস্কৃতির উত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তামিলভাষা ছিল দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা। তামিল সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ শহরের ঠিক দক্ষিণের অঞ্চল। এখনো তার নাম তামিলনাদ, অর্থাৎ তামিলদের দেশ। কলিঙ্গরাজ খারবেলা দাবি করেছেন তিনি তামিল মিত্রশক্তিকে পরাজিত করেন। এই মিত্রশক্তি অর্থে চোল, পাণ্ড্য, চের (বা কেরল) এবং তাদের সমস্ত রাজ্যগুলিকে বোঝানো হয়েছে। পাণ্ড্য রাজ্যের সঙ্গে খারবেলা বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। মেগাস্থিনিস লিখেছেন হেরাক্লিসের কন্যা পাণ্ড্যরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। হয়তো তখনকার সময়ে দক্ষিণ ভারতে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রচলিত ছিল এটি তারই উদাহরণ। এই সমাজ ব্যবস্থা পশ্চিম উপকূলের কেরলে আজ থেকে ৫০ বছর আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল মেগাস্থিনিসের মতে, পাণ্ড্যদের রানীর ছিল ৫ শত রণহস্তী, ৪ হাজার অশ্বারোহী ও ১৩ হাজার পদাতিক।

এই সময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 'সঙ্গম' সাহিত্যে—এগুলি এক

ধরনের কাব্যসংকলন। বেদের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এগুলির উৎপত্তি সম্পূর্ণ ধর্মীয় ছিল না। কথিত আছে যে, বহু শতাব্দী আগে তামিলনাদের রাজধানী মাদুরা শহরে পর পর তিনটি সমাবেশ (সঙ্গম) বসেছিল। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত কবি ও চারণকবিরা এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় 'সঙ্গম' সাহিত্যের উদ্ভব হয়। প্রথম সমাবেশে নাকি দেবতারাও হাজির ছিলেন। তবে এই সমাবেশের রচিত কোনো কবিতা পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় সমাবেশে প্রথম তামিল ব্যাকরণ 'তোল কাপ্পিয়াম' রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি রচিত হয়েছিল অনেক পরে। তৃতীয় সমাবেশে ২ হাজার কবিতার আটটি কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এগুলি এখনো আছে।

চের, চোল ও পাণ্ড্যরা অবিরতভাবে পারস্পরিক যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। তার ফলে কবিরা অনেক বীরত্বগাথা রচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই তিনটি রাজ্য মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বলা হয়। বেশ বোঝা যায়, এইকথা বলে রাজ্যগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। পরে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তামিলরা নৌবাহিনী গঠন করে সিংহল আক্রমণ করে। তারা অল্পদিনের জন্যে উত্তর-সিংহল অধিকার করে রাখতেও কৃতকার্য হয়েছিল। তারপর ওই শতাব্দীর শেষার্ধে সিংহলরাজ 'দুত্থগামিনী' তামিলদের বিতাড়িত করেন। কয়েকজন চের রাজারও উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একজন রাজার অবশ্য বীর বলে খ্যাতি হয়েছিল, এঁর নাম ছিল নেড়ুনজেরাল আদান। তবে তিনি হিমালয় পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করেছিলেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিতান্তই কবি-কল্পনা। তিনি রোমান নৌবাহিনীকেও নাকি পরাজিত করেছিলেন। এটি প্রকৃতপক্ষে বোধহয় রোমান বাণিজ্য জাহাজের ওপর আক্রমণের উল্লেখ।

প্রথমদিকের চোল রাজাদের (প্রথম থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দ) কথাসাহিত্যে অনেক উল্লেখ আছে। করিকাল, যাঁকে বলা হয়েছে 'দগ্ধপদ-বিশিষ্ট মানুষ', বেন্নীতে একটি বিরাট যুদ্ধজয় করেছিলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল পাণ্ড্য, চের ও আরো ১১ জন গৌণ রাজার এক সম্মিলিত বাহিনী। ক্রমশ চোলরা অন্যদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর উপদ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণাংশের পূর্ব থেকে পশ্চিম উপকূলব্যাপী সমগ্র অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। দুই উপকূলেই বন্দর গড়ে ওঠায় স্থলপথের এপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বাণিজ্যপথ তৈরী হল। রোমানদের সঙ্গেও ব্যবসা শুরু হল। চোলদের আর এক বীর রাজা ছিলেন নলঙ্গিল্লী। তিনি অনেকবার বৈদিকমতে যজ্ঞ ও বলিদান করেছিলেন বলে খ্যাত। বৈদিক আচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তামিলদের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল! বিশেষত, কয়েকটি পূজাপদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। যুদ্ধ ও উর্বরতার দেবতা মুরুগণকে তারা ভাত ও রক্ত উৎসর্গ করত। তার সঙ্গে চলত পানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যানুষ্ঠান। নেতৃত্ব দিতেন প্রধান পুরোহিতরা। এছাড়া বীর যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করে 'বীর প্রস্তর' স্থাপন করে সেগুলিও পুজো করা হতো সহজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

তামিলদের পক্ষেএটা ছিল উপজাতীয় গোষ্ঠীতন্ত্রের যুগ থেকে রাজ্যগঠনে উপনীত

হবার সময়। রাজা ছিলেন যুদ্ধনায়ক এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল তাঁর রাজ্য বা উপজাতিকে সুরক্ষিত রাখা।* গ্রামীণ পরিষদ বা স্থানীয় সভার কথা উল্লিখিত থাকলেও সেগুলি সম্পর্কে ভালোভাবে কিছু জানা যায়নি। পরে তামিল সংস্কৃতিতে এগুলি ও মন্দিরগুলি একটা বড় শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি গ্রামে এগুলিই হয়ে উঠল গ্রামের সমস্ত কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তামিলরা বেশিদিন পশুচারণ ও কৃষিযুগে পড়ে থাকেনি। তারা ক্রমশ একটি জটিলতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চললো। আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবই এই পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। বংশ পরম্পরায় রাজপরিবার, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার উদাহরণ এবং অন্যদিকে সারা উপমহাদেশে যে সামগ্রিক বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটেছিল, দক্ষিণ-ভারতের পক্ষে তার প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। সাতবাহনদের অভ্যুদয়ের পর উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হল ও বাণিজ্যও বেড়ে উঠল। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে রোমানদের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হওয়ায় দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের সূচনা হল। রোমান নাগরিকদের তামিল নথিপত্রে 'যবন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই একই শব্দ সংস্কৃত নথিপত্রে গ্রীকদের সম্মর্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বহু বাণিজ্যপথ চালু হয়ে গেল। তার মধ্যে কয়েকটি চলে গেল সুদূর মধ্য-এশিয়া ও পশ্চিম-এশিয়াতেও। নদীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে বড় বড় রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। নদীর ওপর সেতু ছিল না, কিন্তু পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। তবে কেবল গ্রীষ্ম ও শীতের শুকনো দিনগুলিতেই যাতায়াত সম্ভব ছিল। বর্ষার সময় বিশ্রাম। যাত্রীরা বড় বড় দলে যাতায়াত করত নিরাপত্তার খাতিরে। বলদ, অশ্বতর ও গর্দভের পিঠে মালপত্র যেত। মরুভূমিতে যেত কেবলই উট। উপকূল বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল আর স্থলপথের চেয়ে জলপথে যাতায়াত ছিল কম ব্যয়সাপেক্ষ। অর্থশাস্ত্রে জলপথে ও স্থলপথে ভ্রমণের সুবিধে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা আছে। সমুদ্রভ্রমণের খরচ অল্প হলেও জলদস্যুর ভয় ও জাহাজ ডুবির আশংকায় প্রকৃত ব্যয় হয়তো বেশিই পড়ত। উপকূলের কাছ দিয়ে যাতায়াত করলে মাঝ সমুদ্রের পথের চেয়ে তা অনেক নিরাপদ হতো। বাণিজ্যের সুযোগও বেশি থাকত। কৌটিল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। দক্ষিণাঞ্চলে যেসব পথ খনি অঞ্চল দিয়ে গেছে সেগুলিই ব্যবহার করা উচিত। কেননা, এগুলি জনবহুল জায়গার মধ্য দিয়ে গেছে বলে নিরাপদ। এ থেকে বোঝা যায় এসময় খনির কাজ, বিশেষত মূল্যবান পাথর বা ধাতুর জন্যে খনি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। বৌদ্ধসূত্রে অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি পথের উল্লেখ আছে। যেমন, শ্রাবস্তী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত পথ, শ্রাবস্তী ও রাজগৃহের মধ্যে উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত পথ এবং পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে

* রামায়ণে রামের সিংহল আক্রমণের সময় অনেক জন্তু-জানোয়ারের সাহায্য নেবার কথার উল্লেখ আছে। বানরদের সর্দার হনুমানও তার মধ্যে একজন। বলা যেতে পারে, এই উপদ্বীপ অঞ্চলের উপজাতিগুলির বিভিন্ন 'টোটেম' প্রতীকের স্মৃতি হিসেবেই এসব জন্তু-জানোয়ারের কল্পনা এসে পড়েছে।

যাবার বিভিন্ন পথ। রাজস্থান মরুভূমি সচরাচর পরিহার করা হতো। পশ্চিম সমুদ্রে বাণিজ্যের জন্যে ভারুকচ্ছ বন্দর (বর্তমান ব্রোচ) ছিল প্রধান। আগের শতাব্দীগুলিতে বাভেরুর (ব্যাবিলন) সঙ্গেও এই বন্দরের যোগাযোগ ছিল।

পশ্চিম-এশিয়া ও গ্রীসের সঙ্গে স্থলবাণিজ্য হতো উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলির মধ্য দিয়ে। যেমন, তক্ষশিলা। মৌর্যরা তক্ষশিলা থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিল। বিভিন্ন শতাব্দী ধরে এই পথটি বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং এখন এটি গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড নামে পরিচিত। পাটলিপুত্রের সঙ্গে স্থলপথে যোগ ছিল তমলুক বন্দরের। এই বন্দর থেকে বর্মা, পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন জায়গা ও সিংহল যাওয়া চলত। মৌর্যযুগের পর দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে স্থলপথগুলির উন্নতি হল প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনেই। নদী-উপকূল ও উপত্যকা অঞ্চল দিয়েই রাস্তাগুলি তৈরী হয়েছিল। কেননা, দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য মালভূমির মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম পথ সহজ ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল কেবল গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর উপকূলবর্তী পথগুলি। মালভূমি ছিল ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন। সুতরাং নদী-উপত্যকার জনবহুল ও পরিষ্কার অঞ্চলের তুলনায় বিপদসংকুল। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তাগুলি অবশ্য ব্যবহার হতো। যেমন, পশ্চিম-মালাবার উপকূল থেকে একটি রাস্তা কইম্বাটোরের কাছে ওরকম একটি গিরিখাতের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল কাবেরীর সমভূমি অঞ্চল পেরিয়ে পণ্ডিচেরীর কাছে পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যকেন্দ্র আরিকামেড়ুতে।

পশ্চিমগামী সবচেয়ে প্রচলিত রাস্তাটি ছিল তক্ষশিলা ও কাবুলের মধ্যে। কাবুল থেকে বিভিন্ন দিকে কয়েকটি রাস্তা চলে গিয়েছিল। উত্তরদিকে রাস্তাটি গিয়েছিল ব্যাকট্রিয়া অক্সাস, কাস্পিয়ান সাগর ও ককেসাসের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণসাগরের দিকে। দক্ষিণগামী আর একটি রাস্তা গিয়েছিল কান্দাহার ও হিটার থেকে একবাটানা (পরে হামাদান) পর্যন্ত, আর সেখান থেকে রাস্তা গিয়ে পৌঁছেছিল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় কয়েকটি বন্দরে। পার্সিপোলিস ও সুসা থেকে কান্দাহার পর্যন্ত আর একটি বড় রাস্তা ছিল। আবো দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও টাইগ্রিসের মধ্য দিয়ে সেলুসিয়া পর্যন্ত আর একটি রাস্তা ছিল। পশ্চিমদিকের বন্দরগামী জাহাজগুলি অনেক সময় পারস্য উপসাগরের উপকূলরেখা ধরে ব্যাবিলনে চলে আসত। অথবা, আরবসাগর অতিক্রম করে এডেন বা সোকোট্রা বন্দরে আসত। এখান থেকে আবার যাওয়া যেত লোহিত সাগর বর্তমান সুয়েজ বা তার কাছাকাছি একটি জায়গায় মালপত্র নামানো হতো। তারপর স্থলপথে সেগুলি পাঠানো হতো আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং এটি ছিল ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির পণ্য আমদানী-রপ্তানীর জন্যে মাল রাখার কেন্দ্র। বেরেনিস (Berenice) ও মিওস হর্মাস (Myos-Hormus, লোহিত সাগরের ওপর) থেকে এর চেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি স্থলপথ প্রচলিত ছিল নীলনদ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে নদীপথ বেয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসা হতো।

ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম-এশিয়ায় যাবার পথ ছিল দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল। গ্রীষ্মকালে আরব সাগরের ওপর দিয়ে যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী হাওয়া বইত, আরবরাই প্রথম তার সদ্ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছিলেন। উপকূলের কাছ দিয়ে জাহাজ চালানোর

চেয়ে মাঝসমুদ্র দিয়ে মৌসুমী হাওয়ার সাহায্যে জাহাজ চালালে গতি দ্রুততর হতো। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও মৌসুমী বায়ুর খবর জেনে যায়। আগে বলা হতো, জাহাজ চালানোর জন্যে অনুকূল বায়ুর ব্যবহার 'আবিষ্কার' করেছিলেন হিপ্পালাস। কিন্তু আরবরা যখন ব্যাপারটা আগেই জেনে গিয়েছিল, নতুন করে আবিষ্কারের কথা আর ওঠে না। লোহিতসাগর থেকে যেসব জাহাজ ছাড়ত, তারা অনুকূল বায়ুর জন্যে অপেক্ষা করে তবেই যাত্রা শুরু করত। আবার, শীতকালে বিপরীতগামী বায়ুর সাহায্যে জাহাজগুলি ভারত থেকে ফিরে যেত।

ভারত ও পশ্চিম-এশিয়ার মধ্যে-ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছিল। পূর্ব-আফগানিস্থানকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অংশ বলেই মনে করা হতো। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন উপত্যকা ও মরূদ্যানের মধ্য দিয়ে বহু রাস্তা তৈরী হয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলেও ব্যবসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরমধ্যে একটি পরে 'প্রাচীন রেশমপথ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, মিরান, কুচি, কারাশার, তুরকান ইত্যাদি নতুন নতুন জায়গায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি এখানে বৌদ্ধ প্রচারকদেরও আগমন ঘটল। মধ্য-এশিয়ার এইসব কাজকর্মের ফলে চীনের সঙ্গে যোগাযোগের উন্নতি হল। কুষাণ রাজারা ভারত ও চীনের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ প্রচারকরা এই সম্পর্ক নিকটতর করলেন। চীন থেকে রেশমের নানান জিনিসপত্র ভারতে আসা শুরু হওয়ায় বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে গেল। রোমান অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে ব্যবসায়ীরা গোবি মরুভূমি পর্যন্ত পণ্যসম্ভার নিয়ে আসত। চীন ও রোমের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মধ্যস্থ হয়ে নিজেদের সুবিধেমতো লাভ গুছিয়ে নিল। রোমের সঙ্গে বাণিজ্য করার পরই ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়ে উঠল। বর্মা ও আসামের মধ্য দিয়ে স্থলপথে যাতায়াতের চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তারচেয়ে সমুদ্রপথই বেশি সুবিধাজনক বলে দেখা গেল। সুবর্ণদ্বীপের (জাভা, সুমাত্রা ও বালি দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায়ীদের অভিযানের যেসব কাহিনী পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায়, এইসব যাতায়াত অত্যন্ত বিপদসংকুল ছিল। কিন্তু রোমানদের কাছে মশলা বিক্রী করে যা লাভ হতো তাতে এইসব ক্ষতি পুষিয়ে যেত। এই কারণেই পূর্বদিকে প্রথম বাণিজ্য শুরু করেছিল ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের বণিক সম্প্রদায়।

৬

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান

আনুমানিক ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ—৩০০ খ্রীস্টাব্দ

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্তিকর মনে হলেও যে ব্যাপারটি এই পরিস্থিতির মধ্যে কিছুটা ধারাবাহিকতা ও সংগতি এনে দিয়েছিল তা হল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। শুঙ্গ, সাতবাহন, ইন্দো-গ্রীক, শক, কুশান, চের ও চোলদের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে বণিক সম্প্রদায়ের শক্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। মৌর্য-সম্রাটেরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে রাস্তা তৈরি করে এবং শাসন-ব্যবস্থায় খানিকটা ঐক্য এনে একদিক দিয়ে ভারতবর্ষকে সুগম করে দিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভারতীয় শাসকদের অবস্থান ব্যবসায়ীদেয় শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হল, কারণ তাদের মাধ্যমে ব্যবসা প্রসারিত হল অজানা নতুন অঞ্চলে। ভারতীয় গ্রীক রাজারা পশ্চিম-এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন। শক, পার্থিয়ান ও কুশানদের রাজত্বকাল মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পরিধির মধ্যে এনে দিল। এবং চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগও ঘটল এই সূত্রে। মশলা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে রোমানদের আগ্রহ ভারতীয় বণিকদের নিয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, এবং রোমান বণিকদের নিয়ে এলো ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে। সারা দেশ জুড়েই যে ব্যবসা ভালো চলছিল সে খবর জানা যায় বিভিন্ন শিলালিপি থেকে, ব্যবসায়ীদের দান-ধ্যানের খবর থেকে এবং সমসাময়িক নথিপত্র থেকেও। এই শতাব্দীগুলিতেই বৌদ্ধ-ধর্ম ও জৈনধর্ম ব্যবসায়ীদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, কৃষিকর্মেও ভাঁটা পড়েনি এবং তা থেকে যথেষ্ট রাজস্ব আদায়ও হতো। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাপারে খুব কর্মচাঞ্চল্য শুরু হওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও সমাজের প্রথম সারিতে এসে পড়ল।

মৌর্য আমলে সে সমবায় সংঘগুলির উদ্ভব হয়েছিল, এখন সেগুলি নগরজীবনে পণ্যোৎপাদন জনমত তৈরির ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। বহু কারিগর সমবায় সংঘে যোগ দিল। কেননা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে গিল্ড বা সমবায় সংঘের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল কঠিন। তাছাড়া এখানে যোগ দিলে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তাবোধও বেড়ে যেত। বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর চাহিদাবৃদ্ধির ফলে অধিক উৎপাদনের জন্যে কিছু কিছু সংঘ কারিগর-ক্রীতদাস ভাড়া করা শুরু করল। সমবায় সংঘগুলিকে নিজেদের এলাকায় তাদের নামে তালিকাভুক্ত করতে বলা হতো ও তারা স্থানীয় শাসনকর্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই স্থান পরিবর্তন

করতে পারত। যেকোনো শিল্পের কারিগররাই সমবায় সংঘ গঠন করতে পারত এবং তার ফলে সকলেরই সুবিধে হতো। প্রধান সংঘগুলি ছিল মৃৎশিল্পী, ধাতুশিল্পী ও কাষ্ঠশিল্পীদের নিয়ে। এগুলির এক-একটি অত্যন্ত বড় আকারের ছিল। ওই সময়কার একজন ধনী কুম্ভকার সদ্দলপুত্ত ৫০০টি মৃৎশিল্প কারখানার মালিক ছিল। তাছাড়াও উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন ব্যবস্থাও সে নিজেই করত। নিজের অনেকগুলি নৌকোর সাহায্যে মৃৎপাত্রগুলি গঙ্গার বিভিন্ন বন্দরেও সে পাঠাতো। বাণিজ্যের বিস্তারের পর এর চেয়েও বড় বড় সংঘেরও উদ্ভব হল।

সংঘগুলির কাজের নানারকম নিয়মকানুন ছিল। ক্রেতা ও কারিগর উভয়ের সুবিধানুযায়ী সামগ্রীর উৎকর্ষ অনুসারে দাম স্থির করে দেওয়া হতো। বিচারসভার মাধ্যমে সমবায় সংঘের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সংঘের প্রচলিত প্রথারও (শ্রেণীধর্ম) গুরুত্ব ছিল আইনের মতোই। সভ্যদের পারিবারিক জীবনেও যে সংঘগুলি হস্তক্ষেপ করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নিয়মটি থেকে— যেকোনো বিবাহিতা মহিলা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হতে চাইলে তাকে কেবল স্বামী নয়, স্বামী যে সংঘের সদস্য তারও অনুমতি নিতে হতো।

জাতিপ্রথার ফলে সমবায় সংঘগুলির কখনো সদস্যের অভাব হতো না। কেননা, বর্ণপ্রথা অনুসারে এক-এক বর্ণ বা উপবর্ণের লোকেরা পুরুষানুক্রমে একই শিল্পের চর্চা করে যেত। পিতার পেশা গ্রহণ করা ছাড়া পুত্রের উপায়ান্তর ছিল না। সংঘগুলির বিপদ এলো তখনি যখন কোনো কোনো উপশ্রেণী তাদের পেশা পরিবর্তন করতে শুরু করল। শ্রেণী ছাড়াও কারিগরদের অন্য ধরনের সমবায় সংঘও ছিল। বিভিন্ন শিল্পের কারিগররা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যেও সংঘ গঠন করত। যেমন, কোনো স্থাপত্য, যথা মন্দির বা বাড়ি তৈরির কাজে যেসব সংঘগুলির সদস্যদের মধ্যে স্থপতি যন্ত্রবিদ, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি ধরনের লোক থাকত— তারা ঐ কাজের ভার পেত।

খনন কার্যের ফলে বেশ কিছু শীলমোহর পাওয়া গেছে, যেগুলিতে বিভিন্ন সমবায় সংঘের নাম খোদিত আছে। উৎসবের সময় সংঘগুলির নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোত। সংঘগুলির বিজ্ঞাপনের জন্যেও চিহ্নগুলি প্রয়োজনীয় ছিল। সংঘগুলি বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাকে যথেষ্ট অর্থদানও করে গেছে। শস্যব্যবসায়ীদের একটি সমবায় সংঘ বৌদ্ধদের জন্যে একটি সুন্দর পাথর খোদাই করা গুহা তৈরি করে দিয়েছিল। বিদিশার হাতির দাঁতের কারিগরদের সংঘ সাঁচীস্তূপের তোরণ ও চারিদিকের পাথরের বেড়ার উপর সুন্দর খোদাইয়ের কাজ করে দিয়েছিল। নাসিকের একটি গুহার মধ্যে পাওয়া শকরাজার আদেশে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, তন্তুবায়দের একটি সংঘ একটি বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কিছু অর্থ রেখে যায়। ঐ অর্থ খাটিয়ে সুদ আদায় করে বিহারের খরচ চলত।

৪২ সম্বৎসরে বৈশাখ মাসে রাজা দিনিকের পুত্র ও ক্ষহরত ক্ষত্রপ রাজা নহপানের জামাতা রাজা উশভদত্ত সংঘকে এই গুহা দান করেছেন। এছাড়াও তিনি তিন হাজার কাহাপন দান করেছেন। যেকোনো সম্প্রদায় বা অঞ্চলের সংঘ সদস্যের

গুহায় থাকার সময় পোশাক ও অন্যান্য খরচের জন্যে এই অর্থ ব্যবহৃত হবে। গোবর্ধনে যেসব শ্রেণী আছে, এই দানের অর্থ সেখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে। একটি তন্তুবায় সমবায় সংঘে বিনিয়োগ করা হয়েছে ২ হাজার কাহাপন। এ থেকে ১ শত কাহাপনে ১ প্রতিক (মাসিক) হিসেবে সুদ আসবে। বিনিয়োগ করা অর্থ আর ফেরত দিতে হবে না। কেবল সুদ পাওয়া যাবে। বাকি ১ হাজার কাহাপন আর একটি তন্তুবায় সমবায় সংঘে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখানকার সুদ শতকরা ৩/৪ প্রতিক (মাসিক)। এই ২ হাজার কাহাপনের শতকরা ১ প্রতিক খরচ হবে পোশাকের জন্যে। আবার গুহায় যে ২০ জন ভিক্ষু বসবাস করবেন তাঁরা পোশাকের মূল্য হিসেবে ১২ কাহাপনপাবেন। আর যে ১ হাজার কাহাপন বার্ষিক শতকরা ৩/৪ প্রতিক হারে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে গৌণ ব্যয়নির্বাহ হবে। কাপুর জেলায় চিক্কলপদ্র গ্রামকে ৮ হাজার নারকেল গাছের মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই সব দান প্রথানুযায়ী নগরসভায় ও নথিশালায় ঘোষণা ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে।...[১]

নাসিকের একটি গুহা থেকে পাওয়া উপরে উদ্ধৃত শিলালিপিটি থেকে দু'টি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সমবায় সংঘের রাজনৈতিক গুরুত্ব। নগরজীবনে, সংঘের কর্তারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেনি। রাজনীতিতে কেবল রাজারই অধিকার ছিল বলে মনে করা হতো। এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো এই যে সমবায় সংঘের সঙ্গে রাজাদেরও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে ভালো রকমই অর্থাগম হতো। বিনিয়োগ করা অর্থে যে জমি কেনা যেত ও তার যা ফসল হতো তার মূল্যের চেয়েও বেশি অর্থাগম হতো বিনিয়োগের মাধ্যমে। রাজপরিবারের সদস্যরা সংঘগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করত বলে সেগুলির উন্নতির প্রতিও তাদের দৃষ্টি ছিল। রাজার বিরোধিতার বদলে উদার সাহায্য লাভ করার ফলে সংঘের নেতাদের মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালিত হবার সুযোগই কমে গিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য সংঘগুলির সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো একটি সংঘের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংঘগুলির মধ্যেও মিল থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, এক-এক সংঘের সদস্যরা পৃথক বর্ণের লোক ছিল। বর্ণপ্রথা অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের লোকের একত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ ছিল।

শিলালিপি থেকে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তা হল, সংঘগুলি ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্টির কাজও করত। তবে সাধারণত বিশেষ কিছু ব্যবসায়ীই এই কাজ করত। তাদের বলা হতো শ্রেষ্ঠী। এদেরই বংশধররা এখন উত্তর-ভারতে শেঠ ও দক্ষিণভারতে চেট্টি বা চেট্টিয়ার নামে পরিচিত। ব্যাঙ্কিং জাতীয় কাজকর্ম পুরো সময়ের পেশা ছিল না এবং শ্রেষ্ঠীরা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য কাজেও নিযুক্ত থাকত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে অনেকেই ব্যাঙ্কের কাজ শুরু করে দিল। এর আগের দ্রব্য-বিনিময় প্রথা বা মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার এখন কমে যেতে লাগল। মৌর্য-পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে মুদ্রানির্মাণ প্রচলিত রীতি হয়ে উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজারা গ্রীক ও ইরানীয় মুদ্রার অনুকরণ

করলেন। অন্যান্য অঞ্চলেও যেসব স্থানীয় মুদ্রা তৈরি হল, সেগুলি মৌর্যদের অঙ্ক-চিহ্নযুক্ত (punch marked) মুদ্রার চেয়ে অনেক উন্নত শ্রেণীর ছিল। বিদেশী-মুদ্রা, যেমন রোমানদের ডিনারিমুদ্রা (denarii) অবাধে ব্যবহৃত হতো। রোমানদের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে দক্ষিণ-ভারতে। মনে করা হয় এগুলি সোনার ওজন হিসেবে (bullion) ব্যবহৃত হতো। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের মধ্যে তেজারতি কারবারও ছিল। সুদ নেওয়া হতো সাধারণত শতকরা ১৫ হিসেবে। সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্যে টাকা ধার দিলে তার সুদের হার আরো চড়া হতো। এই যুগের এক লেখকের মতে, গ্রহীতার সামাজিক বর্ণ অনুসারে সুদের হার স্থির হতো। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের লোকেরা কম সুদ দিত ও নিম্নবর্ণের লোকদের চড়া সুদ দিতে হতো। এর পেছনে একটা স্পষ্ট কারণ আছে। নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষের পক্ষে ধার শোধ দেওয়া বেশ কঠিন ছিল। ঋণের জালে জড়িয়ে তাদের পক্ষে কোথাও চলে যাওয়াও সম্ভব হতো না। এই সব মানুষের মধ্যে ক্রমশ একটা বশ্যতাভাবের সৃষ্টি হতো।

মুদ্রার প্রচলনের পরও বিনিময় প্রথা একেবারে উঠে যায়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা চালু ছিল। যেমন, চোলরাজ্যে রোমান স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য ছোট তাম্রমুদ্রার প্রচলন সত্ত্বেও অনেক শতাব্দী ধরে ধানই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শহরে বহু রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল— নিষ্ক, সুবর্ণ ও পল। রৌপ্যমুদ্রা ছিল— শতমান। তাম্রমুদ্রা ছিল— কাকিনী। এ ছাড়াও ছিল সীসার তৈরি মুদ্রা। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও মাপ আরো বিশদ ও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

প্রধানত কাঁচামাল যেখানে বেশি সেখানেই শিল্পের প্রসার হয়েছিল। তাছাড়া কোনো জায়গায় বিশেষ কোনো শিল্পের খ্যাতি থাকলে আশপাশের অঞ্চল থেকে কারিগররা এসে সেখানে ভিড় করত। সুতী ও সিল্কের কাপড় বোনার ব্যাপারে এ জিনিসটা বেশ লক্ষ্য করা গেছে। সুতী কাপড় তৈরিতে মেয়েদের নিয়োগ করা হতো বেশি সংখ্যায়। বলা হতো কাপড় হবে 'সাপের খোলসের মতো সূক্ষ্ম, যার মধ্যে সুতো দেখা যাবে না।' প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হতো ও সারা দেশেই সেগুলির বাজার ছিল। লোহা আসত প্রধানত মগধ থেকে। কিন্তু অন্যান্য খনিজদ্রব্য বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পাওয়া যেত তামা। বহুল ব্যবহৃত কস্তুরী ও জাফরান আসত হিমালয়ের নানা অঞ্চল থেকে। পাঞ্জাব থেকে আসত নুন। দাক্ষিণাত্য যোগাত মশলা, সোনা, দামী পাথর ও চন্দন কাঠ।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের সাহিত্যে বন্দর-পোতাশ্রয়, বাতিঘর, শুল্কবিভাগ ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। যদিও সাধারণভাবে ভারতীয়রা অন্য দেশের জাহাজ থেকে বিদেশী মাল আমদানী করত, চোলরা এদেশের জিনিস ভারত-মহাসাগরের বিভিন্ন দেশে রপ্তানীর ভার নিয়েছিল। তারা নানা ধরনের জাহাজ তৈরি করেছিল। ছোট উপকূল অঞ্চলের উপযোগী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি লম্বা লম্বা কাঠ জুড়ে তৈরি বড় বড় জাহাজও

ছিল। বড় জাহাজ যেত মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ঐতিহাসিক প্লিনীর মতে, সবচেয়ে বড় ভারতীয় জাহাজ ছিল ৭৫ টনের। অন্যান্য সূত্রে কিন্তু আরো বড় জাহাজের কথা পাওয়া যায়। বিভিন্ন চিত্রে ও ভাস্কর্যে অবশ্য তেমন বড় জাহাজ দেখা যায় না। তবে এগুলি হয়তো উপকূল অঞ্চলে ব্যবহারের ছোট জাহাজ। পুঁথিপত্রে ৩০০, ৫০০ এমনকি ৭০০ যাত্রী বহনকারী জাহাজেরও প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রোচ বন্দরে যেসব জাহাজ আসত সেগুলিকে পথনির্দেশক নৌকোর সাহায্যে বন্দরের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসা হতো।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক ছিল দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য। পশ্চিম-এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 'যবন' ব্যবসায়ীরা সাতবাহন রাজ্য ও আরো দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যেও তাদের ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। আরেক দল সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিল উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয় গ্রীক ও শকদের বংশধরেরা। পশ্চিম উপকূলের নানা অঞ্চলে এদের দানের কথা পাথরে উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন তামিলসাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, 'যবন' জাহাজগুলি মালবোঝাই হয়ে কাবেরীপত্তনম শহরের বন্দরে এসে ভিড়েছে। শহরের 'যবন' অধিবাসীরা অর্থশালী ছিল। অনেক তামিল রাজা আবার 'যবন' দেহরক্ষী নিযুক্ত করতেন। এথেকে মনে হয় 'যবন'রা অন্যরকম বলে তাদের একটা আলাদা ও বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল।

প্রথম শতাব্দীতে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্কে একটা সামুদ্রিক ভূগোলের বই লেখা হয়— পেরিপ্লাস মারি ইরিথ্রি (Periplus Marie Erythrae)। এ থেকে বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যদ্রব্যের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইথিওপিয়া থেকে ভারতে আসত হাতির দাঁত ও সোনা। ওখানে যেত ভারতীয় মসলিন বস্ত্র। আধুনিক জর্ডানের পেত্রা শহরে লোহিত-সাগরের পথ ও পশ্চিম এশীয় পথগুলি এসে মিলেছিল। সাকোট্রা দ্বীপের ডায়োস্কোরাইডিস বন্দরে ভারতীয় জাহাজগুলি আনত চাল-গম সুতীবস্ত্র ও নারী ক্রীতদাস। ওসবের বদলে নিয়ে যেত কচ্ছপের খোলা। পারস্য সাগরের দক্ষিণের শহরগুলি ভারত থেকে নিত তামা, চন্দনকাঠ, সেগুনকাঠ ও আবলুসকাঠ। তার বদলে ভারতে পাঠাতো মুক্তো, লাল বেগুনী কাপড় ছাপানোর রঙ, বস্ত্র, মদ, খেজুর, সোনা ও ক্রীতদাস। বহুকাল আগেই হয়তো সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা এই বাণিজ্যপথ ধরে সুমেরীয় সভ্যতার লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার আর একটি কর্মব্যস্ত বন্দর ছিল বারবারিকাম। এখানে আসত ক্ষৌমবস্ত্র, পোখরাজ, পাথর, প্রবাল, কাঁচ, রুপো, গুগগুল, সোনার বাসন ও মদ। রপ্তানী হতো মশলা, নীলকান্তমণি, মসলিন ও রেশমতন্তু এবং বৃক্ষজাত নীল। বারিগাজা (বর্তমান ব্রোচ) যাকে ভারতীয় সূত্রে ভরুকচ্ছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি ছিল পশ্চিম-উপকূলের সবচেয়ে পুরনো ও বড় আমদানী-রপ্তানী কেন্দ্র। এখানে আমদানী হতো মদ (ইতালী, গ্রীস, আরবদেশের), তামা, টিন। সীসা, প্রবাল, পোখরাজ, পাথর, কাঁচ, বিশেষ ধরনের রঞ্জন, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও চিকিৎসার জন্য ব্যবহারোপযোগী নানা জাতের মলম। স্থানীয় রাজাদের জন্যে উপহার হিসেবে আসত সোনারুপোর গহনা, গায়ক বালক, ক্রীতদাসী, মদ ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র। বারিগাজা

থেকে রপ্তানী হতো মশলা, সুগন্ধি তেল, তেজপাতা (মলম তৈরির কাজে ব্যবহারের জন্যে), হীরে, নীলকান্তমণি, দামী পাথর ও কচ্ছপের খোলা। এইসব বিভিন্ন বন্দরের কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে খুঁজে পাওয়া গেছে। বাণিজ্যপথ উপদ্বীপের মুখ থেকে উপকূল ধরে নেমে এসে অন্তরীপের পর ওপরদিকে উঠে এসেছিল। একটি বন্দর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এটি হল আরিকামেদু (পেরিপ্লাসে একে উল্লেখ করা হয়েছে পড়ুকে নামে)। এখানে ১৯৪৫ সালে যে খননকাজ হয় তাতে বড় একটি রোমান জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সংলগ্ন বন্দরের খোঁজ পাওয়া যায়।

সুতরাং আরিকামেদু যে কেবল মালয় ও চীনগামী জাহাজগুলির যাত্রাপথের অন্যতম একটি বন্দর ছিল তা নয়। ভারতীয় জিনিসপত্র এখান থেকে রপ্তানী হতো ও উপরন্তু এখানে রোমানদের জন্যে বিশেষ ধরনের মসলিন তৈরিও করা হতো। যে সমস্ত পুরনো রোমান মৃৎপাত্র, পুঁতি, কাঁচের জিনিস ও পোড়ামাটির মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা হয় খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিক পর্যন্ত রোমানরা আরিকামেদু ব্যবহার করত। রোমানরা দাম দিত প্রধানত স্বর্ণমুদ্রায়। দাক্ষিণাত্যে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে ও তার পরিমাণ থেকে বাণিজ্যের পরিমাণও অনুমান করা যায়। অধিকাংশ মুদ্রাই সম্রাট অগাস্টাস ও টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালের। সম্রাট নীরোর আমলের নিকৃষ্ট ধরনের মুদ্রা কেউ আর সঞ্চয় করে রাখেনি। অনেকগুলি মুদ্রাতেই একটা লম্বাদাগ দেওয়া আছে। তা থেকে মনে হয়, এগুলিকে আর মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করার নিষেধ ছিল, স্বর্ণখণ্ড হিসেবেই মুদ্রাগুলিকে ধরা হতো। প্লিনী যে অভিযোগ করেছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে রোমের প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন প্রতি বছর ৫৫ কোটি রোমান মুদ্রা (সেস্টারসেস) পরিমাণ মূল্যের জিনিস ভারত রপ্তানী করত। ভারত থেকে প্রধানত যেত বিলাসদ্রব্য, মশলা, দামী পাথর, বস্ত্র, বিশেষ ধরনের জন্তু (ময়ূর, বানর ও কাকাতুয়া)। এগুলি ধনী রোমানদের মনোরঞ্জন করত। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ধরনের বাণিজ্যে রোমের স্বার্থহানিই হতো।

দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ শহরাঞ্চল গড়ে উঠেছিল বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে। যেমন — কাবেরীপত্তনম। প্রাচীন একটি তামিল কবিতায় শহরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শহরটি দু' ভাগে বিভক্ত। মাঝখানে ছিল বড় উদ্যান ও খোলা বাজার। প্রাসাদ ও ধনী ব্যবসায়ীদের ইটের তৈরি বাড়ীগুলি ছিল শহরের ভেতরের অংশে। উপকূলের দিকের অংশটিতে কারিগর ও কম বিত্তশালী মানুষদের বাস ছিল। এই অঞ্চলে গুদাম ও ব্যবসায়ীদের দপ্তরগুলিও ছিল। বিদেশীরা তীরবর্তী অঞ্চলে একটা আলাদা অংশে একসঙ্গে থাকত।

উত্তর-ভারতের সঙ্গে রোমানদের যোগাযোগ এতটা সরাসরি ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রধানত তক্ষশিলায় সমস্ত জিনিস এনে জড়ো করা হতো। ইরান ও আফগানিস্তান থেকে আসত নীলকান্তমণি। সিল্ক আসত চীন থেকে মধ্য-এশিয়ার মধ্য দিয়ে। পার্থিয়ার সঙ্গে রোমের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে চীনাদ্রব্য সরাসরি পশ্চিমী জগতে গিয়ে পৌঁছতে পারত না—যেত তক্ষশিলা ও ব্রোচ হয়ে, উত্তর-পশ্চিম ভারত

সেজন্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তবে ব্যবসা-বাণিজ্য কেবল যবনদের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বাণিজ্য প্রসারিত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। এর মূলে ছিল অবশ্য মশলার জন্যে

রোমের আগ্রহ। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মসলা সংগ্রহ করতে যেত মালয়, জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও বোর্নিওতে। এইসব জায়গায় ভারতীয়রা বসবাস শুরু করার ফলে বাণিজ্যের আরো প্রসার ঘটল। পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের ব্যবসায়ীরাই এসবে অগ্রণী ছিল। ক্রমশ দক্ষিণ-ভারতের ব্যবসায়ীরা পুরো ব্যবসাটাই প্রায় দখল করে নিল। কলিঙ্গ ও মগধ থেকেও অনেক ব্যবসায়ী এসেছিল, তবে প্রথমদিকে

তারা ব্যবসা করত প্রধানত সিংহল, বর্মা ও ভারতের পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চলে।

রোমান বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রভাব দাক্ষিণ-ভারতে বেশি করে অনুভূত হলেও গ্রীক-রোমান চিন্তা ও শিল্পের প্রভাব দেখা গেল উত্তর-ভারতেই বেশি। গ্রীক-রোমান (Hellenisitc) সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তর-ভারতের দীর্ঘতর যোগাযোগেরই একটা ফল। পণ্য-বিনিময়ের পর এলো ভাব-বিনিময়। ভাষার শব্দবিনিময়, বিশেষত কারিগরি শব্দ-বিনিময়— এই বিনিময়েরই ফল। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও শিল্পকর্মের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, কেননা এই ধর্মের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের কাছাকাছি আসা যত সহজ ছিল,— ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বাধা এড়িয়ে তা সম্ভব ছিল না। গ্রীকরা নিজেদের ভাষা-ও স্থানীয় ভাষা, দুই-ই ব্যবহার করত। এক সময় বলা হতো, গ্রীকনাটক থেকেই ভারতের নাটক রচনা শুরু হয়। কিন্তু পরে প্রাচীনতর ভারতীয় নাটকের সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে গ্রীক নাটকের মূল সুরের কোনো মিল নেই। ভারতীয় উপকথা ও লোককথাগুলি এই সময়ে পশ্চিমী জগতে ছড়িয়ে পড়ল ও তারপর বিভিন্ন ইউরোপীয় সাহিত্যে বিভিন্ন-রূপে সেগুলি প্রচারিত হল। চতুরঙ্গ বা দাবাখেলায় (ভারতীয় সেনাবাহিনীর চারটি প্রধান বিভাগ অনুসারে এই নামকরণ, খেলোয়াড়ও চারজন) এই সময় পারস্যদেশের লোকদের খুব উৎসাহ দেখা যায়।

দুই সভ্যতার যোগাযোগের একটা দীর্ঘস্থায়ী ফল হল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন পুঁথিপত্রের মধ্যে বিশদভাবে ভারতের উল্লেখ দেখা গেল। এগুলির মধ্যে আছে— স্ত্রাবোর ভূগোল, আরিয়ানের ইণ্ডিকা, প্লিনীর ইতিহাস ও পেরিপ্লাস মারি ইরিথ্রি এবং টলেমীর ভূগোল। গ্রীক-রোমানদের পরিচিত পৃথিবীতে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল শিল্পক্ষেত্রে। ইন্দো-গ্রীক ধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠল গান্ধার শিল্প। এই শতাব্দীগুলিতে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এটিই ছিল শিল্পরীতি। গান্ধারশিল্পের শুরু হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক-রোমান শিল্পরীতি থেকে। এখানকার তৈরি ব্রোঞ্জ ও প্লাস্টা-রের ছাঁচের তৈরি মূর্তি পশ্চিম-এশিয়ার বাণিজ্যপথ ধরে এসে পড়ল উত্তর-ভারতে। এই সময়েই বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে একাধিক সাধুসন্ত ও স্বর্গের ধারণা জন্ম নেয়। এইসব ধারণা শিল্পরূপ পেল ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে।

এই সময়কার ভারতীয় চিন্তাভাবনা প্রভাবিত করল পশ্চিম-এশিয়াকে। বিশেষ করে ম্যানিকিয়ান, নস্টিকস (Gnostics) ও নব প্লেটোনিস্টদের মতবাদের ; এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা যায়। যীশুখ্রীস্টের জীবনের কোনো কোনো দিকের (অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত, শয়তানের লোভ দেখানো ইত্যাদি) সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর এত মিল পাওয়া যায় যে, কাহিনীগুলি পরোক্ষভাবে ধার করা হয়েছে এমন সন্দেহ করা যায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবের নমুনা পাওয়া গেছে। যেমন, Essene-দের (কিছু কিছু মত অনুযায়ী, খ্রীস্ট এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন) ধর্মাচরণের মধ্যে

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানের নমুনা পাওয়া যায়। অবশ্য এই পারস্পরিক প্রভাব একতরফা ছিল না। বৌদ্ধধর্মও প্রভাবিত হয়েছিল পারস্যের জরাথুস্ত্র মতবাদের দ্বারা, ভারতীয় ধর্মের কয়েকটি দিক পশ্চিমী জগতে বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। যেমন—কঠোর তপশ্চর্যা (আলেকজান্দ্রিয়ার পল ও সেণ্ট অ্যাণ্টনি এর দৃষ্টান্ত), স্মৃতিচিহ্ন উপাসনা ও জপমালার ব্যবহার।

অনেক ভারতীয় রাজা রোমে দূত পাঠিয়েছিলেন। এরমধ্যে খ্রীস্টপূর্বাব্দে ব্রোচ থেকে যে একদল প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল, সে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। প্রতিনিধি-দের সঙ্গে ছিল নানারকম জানোয়ার—বাঘ, সাপ, ফেজন্ট পাখি ও কচ্ছপ। দলে হাতকাটা একটি বালক ছিল—সে পা দিয়েই তীর ছুঁড়তে পারত। একজন সন্ন্যাসীরও জায়গা হয়েছিল এই দলে। ধরা হয়েছিল, এই বিচিত্র প্রতিনিধিদের দেখে রোমের সম্রাট খুব আনন্দ পাবেন। চার বছর পরে খ্রীস্টপূর্ব ২১ সালে এই দলটি সম্রাট অগাস্টাসের কাছে পৌছয়।

পশ্চিমী জগতের সঙ্গে এই যোগাযোগ ছাড়াও কয়েক শতাব্দী ধরে চীন-ভারত সম্পর্ক নিকটতর হচ্ছিল। তাছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারও ঘটছিল। এসবই কিছু শুরু হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কিছু কিছু চীনা জিনিসপত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। এগুলির নামকরণ হয়েছিল চীনা নামের অনুকরণেই। চীনা কাপড়কে বলা হতো 'চীনপট্ট'। বাঁশকে বলা হতে 'কীচক', চীনাভাষায় শব্দটি ছিল 'কি-চক'। এরপর আরো দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের সূচনা হল ৬৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন প্রথম বৌদ্ধ প্রচারকরা চীনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা চীনের লো-ইয়াঙ-এ বিখ্যাত শ্বেত অশ্বমঠে বসবাস শুরু করলেন। ক্রমশ মধ্য-এশিয়ার যেসব মরুদ্যানগুলিতে বৌদ্ধ প্রচারকরা বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল। তারপর ইয়ারখন্দ, খোটান, কাশগড়, তাসখন্দ, তুরফান, মিরান, কুচি, কারাশার ও তুন-হুয়াংএ বহু বৌদ্ধমঠ তৈরি হয়ে গেল। ভারতবর্ষ থেকে পুঁথিপত্র, চিত্র ও উপাসনার নানা জিনিস নিয়ে আনা হল মঠগুলিতে। বহু শতাব্দী ধরে এই মঠগুলি ভারত ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি রেখেছিল। উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী বৌদ্ধ-ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে এইসব মঠে খননকাজের ফলেই। তৃতীয় খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই চীনা বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীরা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পড়া-শোনার জন্যে মধ্য-এশিয়ায় আসা শুরু করে দিয়েছিল।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে ভারতীয়দের যাতায়াত বেড়ে গেল, কেননা চীনে যেতে হলে এই বন্দরগুলি যাত্রাপথের মধ্যেই পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাজ্যগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত তাতে ভারতীয় রাজা ও ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে; শোনা যায়, কলিঙ্গবাসীরা বর্মার ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ও জাভার বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। কৌণ্ডিন্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ কাম্বোডিয়ার এক রাজকুমারীকে

বিয়ে করেন। কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের মূলেও এই ব্রাহ্মণ। ভারতীয় সাহিত্যে এইসব অঞ্চলে বহু দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা আছে। সেগুলি কিছুটা কল্পনাপ্রসূত ও অদ্ভুত ধরনের।

বন্দর-শহরগুলিতে ক্রমশ বিদেশীদের বাস বাড়তে লাগল। তবে এদের অনেকেই অভ্যাস ও আচার-আচরণে ভারতীয় হয়ে উঠেছিল। বর্ণশাসিত সমাজে বিদেশীদের স্থান নির্ণয় করা সমাজপতিদের পক্ষে একটা সমস্যাই হয়ে উঠল। সামাজিক রীতিনীতি ক্রমশ কঠিন হযে উঠছিল। দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে লেখা মনু রচিত 'মানব ধর্মশাস্ত্র' অনুযায়ী সমস্ত নিয়মকানুন নির্ধারণ করা শুরু হল। পুঁথিগতভাবে চারটি বর্ণের বিভাগ, প্রতিবর্ণের লোকের আচার-আচরণ নির্দিষ্ট করে বলা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সব সময় এসব নিয়ম পালন করা হতো না।

হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর ছিল কঠিন, কেননা বর্ণপ্রথা বাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম চলতে পারে না। অহিন্দু কোনো জাতিগোষ্ঠীকে হিন্দুধর্মের মধ্যে ক্রমশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, তাদের একটি পৃথক উপবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে। অহিন্দু কোনো একজন ব্যক্তিকে হিন্দুধর্মের মধ্যে গ্রহণ করতে গেলে তার সঠিকবর্ণ খুঁজে দেওয়া সমস্যা হতো। কারণ বর্ণ তো ছিল জন্মলব্ধ ব্যাপার। এই কারণে গ্রীক, কুষাণ ও শকদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণই সহজ হয়েছিল। তাছাড়া, ওইসময় বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ও সামাজিক সম্মান ছিল তুঙ্গে। তাই অন্যের পক্ষে ওই ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ততটা কঠিন ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামিরও কিছুটা পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল, কারণ রাজনীতিকভাবে শক্তিশালী গ্রীক ও শকদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদ এর সমাধান করে নিল কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে। গ্রীক ও শকদের আখ্যা দেওয়া হল 'পতিত ক্ষত্রিয়'। ভারতবর্ষে এসে কিছু কিছু বিদেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করার ফলে যথেষ্ট সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং ওই সমস্যা বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে যে আঘাত এনেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। সমাজের নিম্নবর্ণের কিছু মানুষ এই সুযোগে বিদেশীদের সহযোগিতায় সামাজিক সিঁড়ির উঁচুধাপে উঠে আসারও চেষ্টা করেছিল। ব্যবসার প্রসারের ফলে সমবায় সংঘে আরো বেশি সংখ্যায় কারিগর নিযুক্ত হল। এরা এল প্রধানত শূদ্রবর্ণ থেকে। এদের অনেকে পেশা পরিবর্তন ও পেশার স্থান পরিবর্তন করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতে সমর্থ হল। আর্যসংস্কৃতির মূলকেন্দ্র হিসেবে উত্তর-ভারতেই এইসব সমস্যা বেশি করে অনুভূত হয়েছিল। অন্যান্য জায়গায় আর্য-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা বিস্তারের কাজটা রীতিমতো চেষ্টা করে এগোতে হয়েছিল। যেমন, সাতবাহন রাজারা স্থানীয় ভাষাকে (বিদ্রূপ করে বলা হতো অপদেবতার ভাষা) উপেক্ষা করে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা প্রচলন করেছিলেন। এছাড়া বৈদিক আচার অনুষ্ঠানও প্রবর্তন করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতীয় অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরকরণ অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতিরও প্রবেশ ঘটেছিল।

অর্থনৈতিক কাজকর্ম ছাড়াও সমবায় সংঘগুলি কিছুটা শিক্ষার দায়িত্বও নিয়েছিল। তবে শাস্ত্রগত শিক্ষার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের হাতে। এক একটি

সংঘের সভ্য ছিল কেবল এক এক ধরনের শিল্পের কারিগর। তাই সংঘগুলি কারিগরি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। খননকাজ, ধাতুবিদ্যা, বয়ন, রঙের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে এক-একটি সংঘ জ্ঞানচর্চারও আরো উন্নতির চেষ্টা করত। এর ফলে এইসব কারিগরিবিদ্যার যে কিরকম উন্নতি হয়েছিল তার নমুনা দেখা যায় মুদ্রা, মৌর্যযুগের স্তম্ভ ও তারও পরের যুগের পাথরের কাজের মধ্যে। তখন পালিশের কাজেও খুব উন্নিত হয়েছিল। এমনকি, উত্তরাঞ্চলের পালিশ করা কালোমাটির পাত্রগুলি এতই উন্নত ধরনের যে, এই যুগেও তার সমকক্ষ বস্তু পাওয়া কঠিন। বাঁধ ও সেচের জলাধার নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্তবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদী ও বলিদানের ভূমি নির্মাণের জন্যে জ্যামিতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু জ্যামিতি ওই যুগে আরো জটিল নির্মাণকাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। ধনুকাকৃতি খিলানের নির্মাণকৌশল অজানা ছিল না। তবে ব্যবহার ছিল কম। অধিকাংশ বাড়িই কাঠের তৈরি বাড়ির নির্মাণকৌশল অনুযায়ী তৈরি হতো। এই সময়কার ধর্মীয় নির্মাণকাজে পূর্তবিদ্যার কৌশল দেখানোর সুযোগ ছিল কম। কারণ, বৌদ্ধদের পছন্দ ছিল তোরণ ও রেলিং দিয়ে ঘেরা সমাধি-স্তূপ কিংবা পাহাড়ের কোল থেকে কাটা সাধারণ আকৃতির গুহা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সুফল এলো জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। দূর সমুদ্রে যেতে হলে নক্ষত্র চেনা প্রয়োজন এবং ব্যবসায়ীরা জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির জন্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিল। পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গে এই বিষয়ে জ্ঞান-বিনিময়ের বেশ সুফল হয়েছিল। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি ছিল শরীর নিঃসৃত তিনটি রস— বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই তিনটির যথার্থ সামঞ্জস্য হলেই শরীর সুস্থ থাকতে পারবে, এই বিশ্বাস ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানকোষ ও ঔষধবিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ এই সময়েই লেখা হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল চরকের রচিত বই। চরক ছিলেন রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক। এর কিছুকাল পরে বই লিখেছিলেন আর একজন— সুশ্রুত। ভারতীয়দের লতাগুল্ম সম্পর্কিত জ্ঞান পশ্চিমী জগতেও পৌঁছে গিয়েছিল। গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী থিওফ্রাসটাস তাঁর উদ্ভিদের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থে ভারতীয় লতাগুল্মের চিকিৎসার প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গেছেন। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা এবং ভাষা বিশ্লেষণ নিয়ে যা চর্চা হয়েছিল তার চরম ফল দেখা যায় পাণিনির সংস্কৃত ভাষা নিয়ে লেখা গ্রন্থে। এযুগের ব্যাকরণবিদ ছিলেন পতঞ্জলি, তাঁর বইয়ের নাম 'মহাভাষ্য'। এতে কেবল যে শব্দের বিবর্তন ও পদবিন্যাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিচার আছে, তাই নয়। সমসাময়িক ইতিহাসেরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে রচিত নাট্য ও ছন্দশাস্ত্রের পুস্তক আজ পর্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যাকরণ ও বৈদিক-গ্রন্থ পাঠের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তবে শিক্ষার সুবিধা ছিল কেবল উচ্চ বর্ণেরই। ব্রাহ্মণের সর্ববিদ্যায় অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা নির্দিষ্ট কিছু কিছু জিনিস পড়তে পারত। শূদ্র এবং স্ত্রীলোকদের পড়াশোনায় নিষেধের উল্লেখ না থাকলেও বাস্তবে তাদের লেখাপড়ার কথা বিশেষ জানা যায় না। ক্রমশ শিক্ষাব্যবস্থা কিছুটা দ্বিধাবিভক্ত হবে

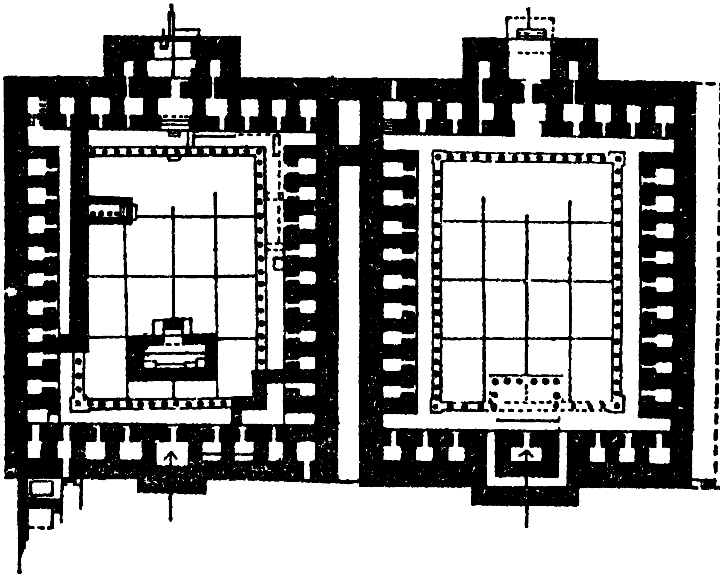
গেল। ব্রাহ্মণদের জন্যে পুঁথিগত বিদ্যা এবং কারিগরি বিদ্যা পেশাদারদের জন্যে। বৌদ্ধ মঠগুলি মধ্যপন্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিল। তাদের শিক্ষাসূচিতে ছিল ব্যাকরণ ও চিকিৎসাশাস্ত্র, এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মণদের চেয়ে বেশি উদার ছিল।

এইযুগে আইনগ্রন্থ (ধর্মশাস্ত্র) প্রণয়নেরও প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। বৈশ্যদের সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উপবর্ণের উদ্ভব, এবং নগরাঞ্চলের মানুষেব উদারপন্থী মনোভাবের ফলে গোঁড়া সমাজপতিদের সামনে সমস্যা দেখা দিল। সামাজিক সম্পর্কের নতুন করে সংজ্ঞা নির্দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হল। স্বভাবতই, আইন গ্রন্থগুলিতে বারবারই বলে দেওয়া হল, সমাজের আর সব মানুষের ওপরে ব্রাহ্মণদের স্থান। তাই সকলেই, এমনকি ধনী বৈশ্যরাও যেন ব্রাহ্মণদেব যথাযথ সম্মান দেয়।

আইনগ্রন্থ ও ব্যাকরণ ছাড়া সাহিত্যচর্চাও প্রচলিত ছিল। কাব্য ও নাটক এসময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন তামিল কাব্যের আজ পর্যন্ত যে হদিশ পাওয়া যায়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'শিলপ্পদিগারম' (রত্নখচিত নূপুর)— এর কাহিনীর পটভূমি হল কাবেরীপত্তনম শহর। সেখানকার এক ধনী যুবক ব্যবসায়ী কোবলন রাজনর্তকীর প্রেমে পড়ল। পতিব্রতা স্ত্রী উপেক্ষিত হল। কাব্যের শেষাংশে তিনজনেরই শোকাবহ মৃত্যু ঘটল। তবে স্বামী ও স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটল পরলোকে। কয়েক শতাব্দী পরে এই কাব্যেরই পরের অংশ হিসেবে লেখা হল 'মনিমেকলই' কাব্য। এর নায়িকা ছিল কোবালন ও রাজনর্তকীর বন্যা। সে আবার বৌদ্ধধর্মে অনুরাগিনী ছিল। ওইযুগে অশ্বঘোষ ও ভাস রচিত সংস্কৃত নাটকের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে। দুই নাট্যকার অবশ্য একেবারে বিপরীতধর্মী। অশ্বঘোষের নাটকের মূল পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল প্রথম শতাব্দীতে। ওই পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে মধ্য এশিয়ার তুরকান অঞ্চলের এক মঠে। বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটক দুটি রচিত। তার একটি বুদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র কবে লেখা। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটক রচনার যেসব নিয়ম স্থির করে গিয়েছিলেন, অশ্বঘোষ সেইসব নিয়ম অনুসরণ করেই নাটক লিখেছিলেন। (সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থখানির মর্যাদা প্রায় অ্যারিস্টোটলের পোয়েটিক্স-এর মতো) কিন্তু ভাস নাটক লিখেছিলেন কয়েক শতাব্দী পরে এসব নিয়মকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ভাসের নাটকগুলির বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের নানা ঘটনা। এছাড়া কয়েকটি ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকে অবন্তীরাজ উদয়নের বিভিন্ন প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজসভার সীমিত দর্শকগোষ্ঠীর জন্যেই ভাস নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু অশ্বঘোষের নাটক সম্ভবত ধর্মীয় সভার বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর সামনে অভিনীত হতো।

এই যুগের সমস্ত শিল্পকর্ম— স্থাপত্যই হোক বা ভাস্কর্যই হোক—বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র কবেই রচিত হয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ীর সমবায় সংঘের বা রাজকীয় অনুদানের সাহায্যে এইসব শিল্পকর্ম সফল হবে উঠত। ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় বৌদ্ধস্তূপ ও গুহা মন্দিরগুলির মধ্যে। স্তূপের উৎপত্তি হয়েছিল আরো প্রাচীন কালের সমাধি ক্ষেত্রগুলির অনুকরণে। বুদ্ধদেব বা কোনো সম্মানিত বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষ বা কোনো পবিত্র সূত্রগ্রন্থের কবরে এইসব গোলাকৃতি স্তূপগুলি তৈরি

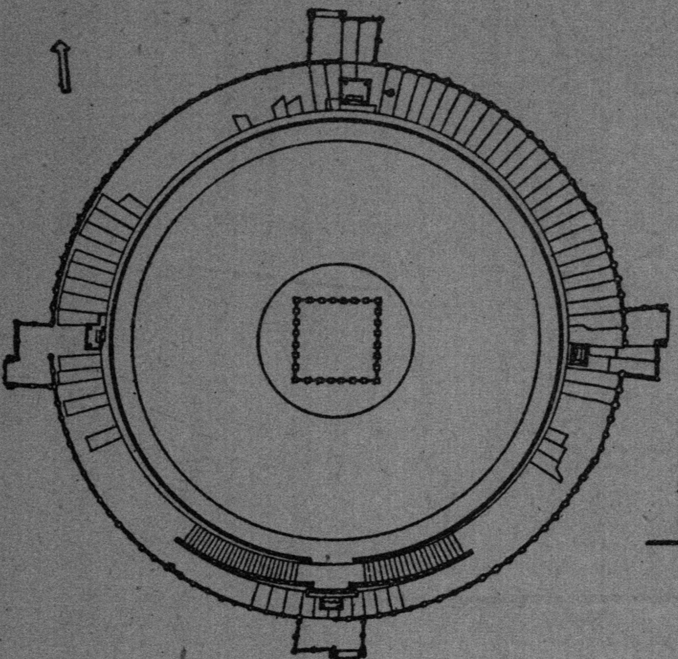
করা হতো। স্তূপের ভিত্তির মাঝখানে একটি ছোট ঘর তৈরি করে তার মধ্যে একটি পাত্রে ভরে ওই দেহাবশেষ রাখা হতো। স্তূপের চারিদিক ঘিরে থাকত বেড়া দেওয়া পথ। এই পথের চারকোণে চারটি তোরণ থাকত। স্থপতি এই তোরণগুলির মধ্যে যথাসাধ্য শিল্পকর্মের পরিচয় রাখার চেষ্টা করত। সবচেয়ে পুরনো বেড়া পাওয়া গেছে ভারহুতে। (বেড়াটি অবশ্য ওখান থেকে তুলে এনে কলকাতার যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে)। এটি তৈরি হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপটি এই যুগে পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

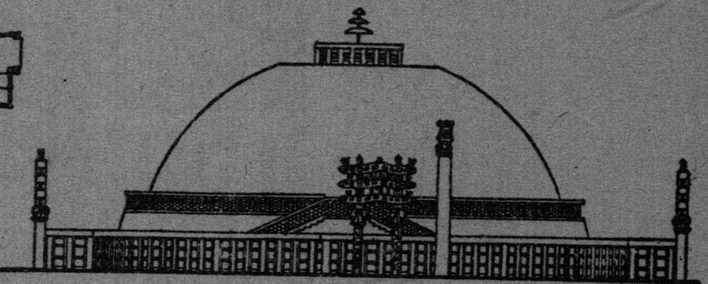


বৌদ্ধ মঠের একটি নকশা

স্তূপ নির্মাণে স্থপতিদের পক্ষে তেমন কোনো শিল্পচাতুর্য দেখানোর সুযোগ থাকত না। গ্রামে বা শহরে যে ধরনের কাঠের তোরণ তৈরি হতো, সেই ধাঁচেই স্তূপের তোরণ নির্মিত হতো। গুহামন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কাঠের তৈরি মন্দিরগুলিকে আদর্শ বলে ধরা হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে গুহা কাটা হতো ও ভিক্ষুরা এগুলিকেই উপাসনাস্থল হিসাবে ব্যবহার করতেন। গুহা খননের সময় যদি কোনো ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত, পরপর কয়েকটি গুহা তৈরি করে স্তূপের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা হতো। স্তূপের মধ্যে যা যা থাকে, গুহাগুলির মধ্যেও তার সবই রাখার চেষ্টা হতো। এরমধ্যে থাকত উপাসনাগৃহ (চৈত্য)* , মঠ (বিহার)—ঠিক যেমনটি বড় বাড়ীর মধ্যে এসবের ব্যবস্থা

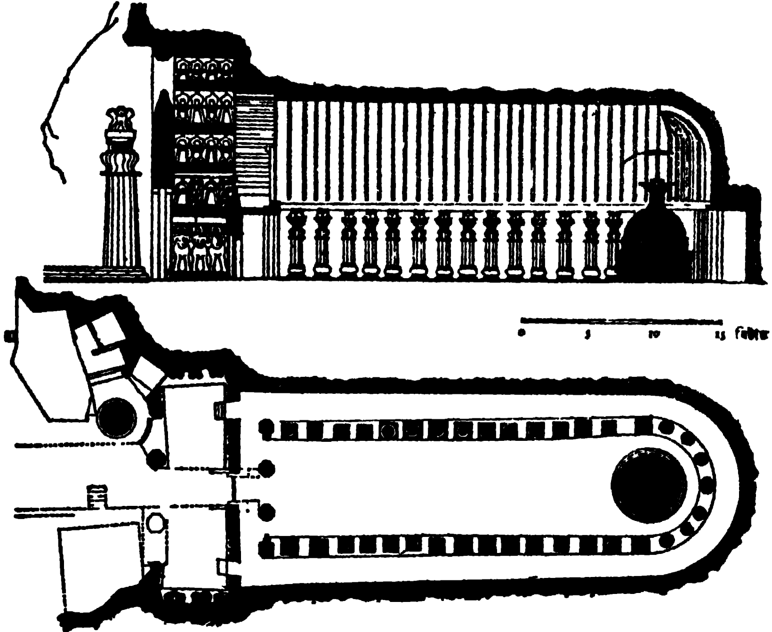
* 'চৈত্য' শব্দটি এসেছে বৌদ্ধ পূর্ববর্তীকালে পবিত্র স্থানগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে। প্রাচীন গণরাজ্যগুলিতে পবিত্র স্থানগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকত ও সেখানেই নিয়মিত পূজা অর্চনা হতো।





সাঁচীর মহাস্তূপ

থাকে। এইভাবেই বড় বড় মন্দিরগুহাগুলি তৈরি হয়েছিল। এর কয়েকটি রয়েছে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত কার্লে অঞ্চলে। পাহাড় কেটেই এইসব জটিল আকৃতির গুহামন্দির তৈরি হয়েছে। গুহার প্রবেশদ্বার ছিল আয়তক্ষেত্র ধরনের। গুহায় ঢুকে প্রথমে উপাসনাগৃহ। এটিও আযত ক্ষেত্রাকার। ওই ঘরের একপ্রান্তে স্তূপটির ছোট একটা প্রতিরূপ রাখা থাকত। গুহার দুইপাশ বরাবব ভিক্ষুদের থাকবার ছোট ছোট ঘর থাকত। কার্লের স্তূপটির ছাদ তৈবি হয়েছিল পিপের গায়ের মতো লম্বা লম্বা কাঠের টুকরো জুড়ে। কাঠ সাজানোর পরিশ্রম এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর মনে হয়। প্রাচীন অজন্তা, ইলোরা কিংবা পরবর্তী কালের অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের চেয়ে বৌদ্ধ-গুহা মন্দিরগুলির পরিকল্পনাও বেশি সুন্দর, স্থাপত্যও বেশি শিল্পসমৃদ্ধ। জৈনদেরও গুহামন্দির ছিল, কিন্তু বৌদ্ধদের মতো এত সুন্দর নয়। গুহা মন্দিরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোর ওপর তৈরি ছিল, সেজন্যে স্থাপত্য কৌশলের তেমন কোনো পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না।



কার্লের চৈত্য সভাগৃহ . গঠনশৈলী

এই যুগের ভাস্কর্য ছিল স্থাপত্যের ওপর নির্ভরশীল। স্তূপের তোরণ ও বেড়া আর চৈত্যের প্রবেশদ্বারের ওপর কিছু কিছু অলংকরণের মধ্যেই ভাস্কর্যের সুযোগ সীমিত থাকত। গোড়ার দিকের ভাস্কররা পাথরের ওপর কারুকার্যে তত দক্ষ ছিল না। বরং কাঠ ও হাতির দাঁতই তাদের বেশি পছন্দ ছিল। কিন্তু এরপর দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে অমরাবতী ও দাক্ষিণাত্যের গুহাগুলিতে পাথরের ভাস্কর্য রীতিমতো

শিল্পসৌকর্যে সমৃদ্ধ। জৈনধর্মের অনুরাগীরা পৃথকভাবে সোজা নির্মিত মন্দির পছন্দ করত। মথুরায় যে সুন্দর লাল রঙের বালিপাথর পাওয়া যেত তা দিয়েই এই ধরনের ভাস্কর্য নির্মিত হতো। এই মথুরা-পদ্ধতির ভাস্কর্য কুষাণ রাজাদেরও পছন্দ ছিল। মথুরার কাছে কুষাণ রাজাদের বেশ কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে। মথুরা পদ্ধতিতেই বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্তি তৈরি হয়। মূর্তি তৈরি হয়েছিল সম্ভবত জৈনমূর্তির অনুকরণে। আগেকার স্তূপের ভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধমূর্তি নেই। বুদ্ধের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে নানা সংকেতের সাহায্যে। যেমন, ঘোড়ার দ্বারা বোঝানো হয়েছে রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ; গাছ দ্বারা বোঝানো হয়েছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। তেমনি চক্রের অর্থ হল বুদ্ধদেবের প্রথম উপদেশ দান। আর স্তূপ মানে বুদ্ধদেবের মৃত্যু ও নির্বাণ লাভ। মথুরা-পদ্ধতির ভাস্কর্য ও স্তূপগুলির মধ্যে একটা উচ্ছল সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক ও ভারতীয় ভাস্কর্যের মিশ্রণ গান্ধার পদ্ধতিতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনা রূপায়িত করা হয়েছিল। গান্ধার-পদ্ধতির মূর্তিগুলিতে বুদ্ধজননীর আদল মেলে এথেন্সের নারীদের সঙ্গে। অন্যান্য বৌদ্ধচরিত্রের মুখমণ্ডল অ্যাপোলোর ধাঁচে তৈরি। গান্ধারশিল্পে মূর্তি নির্মাণের "স্টাকো" পদ্ধতি খুব ব্যবহৃত হতো। আফগানিস্তানের বহু মঠেই এই ধরনের মূর্তি দেখা যায়। পোড়ামাটির কাজও প্রচলিত ছিল। পাথরের মূর্তির খরচ বেশি হওয়ায় অনেকে পোড়ামাটিই বেছে নিত। মাতৃমূর্তির খুব প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, কারণ জনসাধারণ এই ধরনে মূর্তিপূজাই বেশি পছন্দ করত। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে উর্বরাশক্তির পূজাপদ্ধতি ও আরো অন্যান্য জনপ্রিয় পূজাপদ্ধতির নিকট সম্পর্ক ছিল। তার উদাহরণ হল স্তূপগুলির গুরুত্ব। সাঁচীস্তূপের তোরণে বহু নারীমূর্তি খোদিত আছে। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে মাতৃমূর্তিরই আধুনিক অলংকরণ।*

এইযুগের প্রায় সমস্ত কর্মোদ্যোগের পেছনেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্মীয় উদ্যোগে ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরও সমর্থন ছিল। এই কারণেই মঠগুলিতে অর্থদানের বিরতি ছিল না। স্তূপও গড়ে উঠেছিল বিরাট বিরাট আকৃতির। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ সবদিক থেকেই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। কয়েকটি মঠের এত বিপুল অর্থ ছিল যে তারা ক্রীতদাস ও শ্রমিক নিয়োগ করত সন্ন্যাসীদের কাজে সাহায্য করার জন্যে। আগের যুগের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহের ইতিহাসের সঙ্গে এযুগের আর কোনো মিল রইল না। মঠের বিরাট ভোজনগৃহে সন্ন্যাসীরা নিয়মিত খেতে পেত। শহরের আশেপাশে অথবা দূরে পাহাড়ের কোলে মঠগুলি তৈরি হতো। দূরের মঠগুলি চলত দানের টাকায় এবং সন্ন্যাসীদের অর্থাভাবে কোনো কষ্ট পেতে হয়নি। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। ফলে ধর্মের শক্তিও কমে

* ঘর সাজানোর জন্যে বা খেলনা হিসেবেও পোড়ামাটির মূর্তির চল ছিল। এই সময়কার পোষাক সম্পর্কে মূর্তিগুলি থেকে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। দেবী হারীতীকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল এরই উদাহরণ।

আসতে লাগল। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় এমন ঘটলে তিনি নিশ্চয়ই এসব দেখে খুশি হতেন না। ওদিকে যাতায়াতের রাস্তাঘাটের উন্নতি ঘটায় নতুন নতুন ধ্যানধারণাও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বৌদ্ধরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ও ভারতবর্ষের বাইরেও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিল। বিভিন্ন রকম মানুষের ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে বৌদ্ধধর্মের উপরও নতুন চিন্তার প্রভাব পড়ল। ফলে প্রাচীন মতবাদের নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হল; দেখা দিল মতভেদ এবং শেষে বৌদ্ধধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাজের ধনীদের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ও এই বিরোধের ফলেই বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচনা হল।

যেমন হয়ে থাকে, বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই তাঁর উপদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মতভেদ দূর করার জন্যে ক্যাথলিকদের যেমন ধর্মসভা হতো, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকদের মতভেদ মীমাংসার জন্যেও বার বার সভা ডাকা হয়েছিল। এরমধ্যে সবচেয়ে পুরণো গোঁড়াপন্থীদের বলা হতো থেরবার গোষ্ঠী। এদের কেন্দ্র ছিল কৌশাম্বী। এরা বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি পালি অনুশাসনের (পালিভাষার নামানুসারে) মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিল। মথুরাকে কেন্দ্র করে সর্বাস্তিবাদ গোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়ল উত্তরাঞ্চলে। শেষ পর্যন্ত এরা চলে গেল মধ্য-এশিয়ায় এবং সংস্কৃত ভাষায় উপদেশগুলি বিধিবদ্ধ করল। বিভিন্ন গোষ্ঠী ধর্মের যেসব পরিবর্তন সাধন করল, বুদ্ধদেব নিজে সেগুলি মেনে নিতেন বলে মনে হয় না। যেমন, বুদ্ধদেব যদিও তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন, প্রথম শতাব্দীর সময় থেকেই তাঁর মূর্তি তৈরি শুরু হয়ে গেল এবং মূর্তিপুজোও হতে লাগল। এই সময় 'বোধিসত্ত্ব' মতবাদও চালু ছিল। ওই মতবাদ অনুযায়ী যে ব্যক্তি মানবজাতির কল্যাণের জন্যে নিজের নির্বাণের কথা উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যান, তাঁকেই বলা হবে 'বোধিসত্ত্ব'। আবার আরেকদল বৌদ্ধের মতে, বুদ্ধদেব তাঁর পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ বক্তব্য হল, পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে যেকোনো মানুষ ক্রমাগত পুণ্য অর্জন করে যেতে পারে। আরো বলা হল, কোনো ব্যক্তির নাম করে পুণ্য করলে বিনা পরিশ্রমেই ওই ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে পুণ্যের ভাগ নিয়ে নিতে পারবে। অতএব ধনী ব্যবসায়ীরা বৌদ্ধধর্মের জন্যে গুহা তৈরি করে দিয়ে পুণ্য অর্জন করতে পারবে। (এ যেন সম্পত্তি উপার্জন ও অন্যকে দানের ব্যাপার) পরবর্তী 'বোধিসত্ত্ব' মতবাদের সঙ্গে আদি বৌদ্ধধর্মের বেশ পার্থক্য দেখা দিল। খ্রীস্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকে কাশ্মীরে যে চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে এই বিরোধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গোঁড়া বৌদ্ধদের বলা হল হীনযানপন্থী, আর নব্যবাদী বৌদ্ধরা পরিচিত হন মহাযানপন্থী হিসেবে। শেষ পর্যন্ত হীনযানপন্থীরা সিংহল, বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে শক্তিশালী হয়ে রইল। অন্যদিকে ভারত, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপানের বৌদ্ধরা মহাযান-পন্থী রয়ে গেল।

মহাযানপন্থার উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত অন্ধ্রে, খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। তারপর একদল বৌদ্ধ দার্শনিক তার পরিমার্জনা ও ব্যাখ্যা করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে

বিখ্যাত ছিলেন নাগার্জুন। তিনি এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। পরবর্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। নাগার্জুন ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মের সেন্ট পলের মতো। তিনি শূন্যতা মতবাদ প্রচার করেন। তার মূল কথা হল, আমরা চারিদিকে যা দেখছি তার সবই শূন্য ও মায়া। প্রকৃতপক্ষে এই শূন্যতা হল নির্বাণ। অর্থাৎ প্রত্যেক বৌদ্ধ জন্মান্তর থেকে মুক্তিকামনা করত, এ হল তাই। এর-পর আরো অন্যান্য বৌদ্ধ দার্শনিক এই মতবাদের পরিবর্ধন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-বাদের দর্শনের জবাব দেবার জন্যে বৌদ্ধরা এবার নিজেদের ধর্মের দার্শনিক যুক্তি শক্তিশালী করার চেষ্টা শুরু করল। মহাযানপন্থীরা এই প্রচেষ্টায় ভালোভাবেই আত্মনিয়োগ করল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মহাযানপন্থী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দার্শনিক তর্ক ও বিবাদ চলতে থাকল।

মহাযানপন্থার আরো কয়েকটি মতবাদ জন্ম নিয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে। এর মধ্যে একটি মতবাদ ছিল যে, পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যেই বুদ্ধদেব নিজে দুঃখের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। মানবজাতিকে যিনি নিজে দুঃখভোগ করে মুক্তির পথে নিয়ে যান, তিনিই বোধিসত্ত্ব। বোঝা যাচ্ছে, প্যালেস্টাইন অঞ্চল থেকেই এই মতবাদ বৌদ্ধধর্মে এসেছে। মহাযানপন্থার আর একটি মতবাদ হল যে, একের পরে এক অনেকগুলি স্বর্গ আছে এবং এইসব স্বর্গে অসংখ্য বোধিসত্ত্ব বাস করেন।

এইসব শতাব্দীতে জৈনধর্মের ভক্তেরও অভাব ছিল না। কিন্তু মহাবীরের উপদেশ নিয়েও দ্বিমত দেখা দিল। একদল হল— দিগম্বর বা গোঁড়াপন্থী, আর অন্যরা শ্বেতা-ম্বর বা উদারপন্থী। জৈনরা মগধ থেকে পশ্চিম দিকে এসে প্রথমে মথুরা ও উজ্জয়িনী এবং শেষে পশ্চিম উপকূলের সৌরাষ্ট্রে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করল। আরেক দল দক্ষিণদিকে কলিঙ্গতে চলে এলো। সেখানে অল্প কিছুদিন রাজা খারবেলার সমর্থনও লাভ করেছিল। দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর ও তামিল অঞ্চলেই জৈনদের সংখ্যা বেশি। মোটামুটিভাবে বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও সমাজের একই ধরনের লোকের সমর্থন পেয়েছিল এবং একই ধরনের সমস্যাতেও জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মূল উপদেশাবলী থেকে বেশি বিচ্যুতি ঘটেনি। জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যারও বেশি হেরফের হয়নি।

ব্রাহ্মণ্যবাদও এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকতে পারেনি। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিকযুগের কোনো কোনো দেবতার জনপ্রিয়তা কমে গেল। আবার, অনেক দেবতার ওপর অনেক নতুন গুণ আরোপ করা হল। এই সময়েই ব্রাহ্মণ্যবাদে যেসব নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হল, সেসব নিয়েই এখনকার হিন্দুধর্ম। এই সময়ে অবশ্য 'হিন্দুধর্ম' শব্দটা প্রচলিত হয়নি। এই নামকরণ করল আরবরা, অষ্টম শতাব্দীতে। ভারতবর্ষে প্রচলিত শিব ও বিষ্ণু উপাসক ধর্মের তারা নামকরণ করে হিন্দুধর্ম বলে। কিন্তু সুবিধের জন্যে আগের সময় থেকেই পরিবর্তিত ব্রাহ্মণ্যবাদকে আমরা হিন্দুধর্ম বলে উল্লেখ করব। কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব উপলব্ধির ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম এসেছে। একাধারে বৈদিক ধর্ম ও অন্যদিকে বিভিন্ন অর্বাচীন ধর্মের নানা বৈশিষ্ট্য

হিন্দুধর্মে সংযোজিত হয়েছে। অনেক সময় পুরোহিতরাও পূজাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে অন্যান্য ধর্মের কোনো কোনো পূজাপদ্ধতি বা বিশ্বাসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বৈদিকযুগের বলিদান প্রথা নিয়ে তখনকার প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী গোষ্ঠীগুলি যে আপত্তি তুলেছিল তার ফল হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা শক্তিশালী হতে লাগল। এই ধারণার মূলভিত্তি ছিল উপনিষদের দর্শন। ঈশ্বরের তিনরূপের ধারণাও গড়ে উঠল এবার। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা, আর শিব ধ্বংসকর্তা। যখন পৃথিবী অনাচারে ভরে যায়, শিব তখনি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেন। আবর্তনশীল প্রকৃতির রূপ থেকেই এই ধারণার উদ্ভব। প্রকৃতিতে জন্ম সংরক্ষণ ও ধ্বংস স্বাভাবিক ঘটনাপর্যায়। তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের ভক্তদের সংখ্যা ছিল অনেক। পরবর্তী যুগেও হিন্দুধর্মের দুই প্রধান মতবাদীরা হল শৈব ও বৈষ্ণব। প্রত্যেক দলেরই বিশ্বাস, তাদের দেবতাই হলেন পরমশক্তির আধার। ব্রহ্মা তেমন জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করলেন, বিষ্ণু তখন সমুদ্রের মধ্যে সহস্রফণা-বিশিষ্ট সাপের কুণ্ডলীর ওপর নিদ্রামগ্ন হলেন। জেগে উঠে বিষ্ণু উচ্চতম স্বর্গে চলে এলেন। সেখান থেকে তিনি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রাখেন। যখন অনাচার খুব বেড়ে ওঠে, বিষ্ণু বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে অনাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি এ পর্যন্ত নয়বার পৃথিবীতে এসেছেন সর্ব শেষবার এসেছিলেন বুদ্ধদেব রূপে। বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের অবতার হিসেবে গ্রহণ করা হল—যখন বৌদ্ধধর্ম আর হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। দশম অবতারের আবির্ভাব এখনো হয়নি। শেষবার তিনি আসবেন শাদা ঘোড়ায় চেপে কল্কি অবতার রূপে। এই কল্পনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ইহুদিদের উদ্ধারকর্তা মেসায়া ও মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমনের কল্পনার সঙ্গে।

বৈদিক দেবতা রুদ্র ও তামিল দেবতা মরুগণ থেকেই শিবের বিবর্তন। শিবের উপাসনার মধ্যে কয়েকটি উর্বরতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায়। লিঙ্গ বা ষাঁড়ের প্রতীকচিহ্ন এবং শিবের সঙ্গে কয়েকজন উর্বরতা-বৃদ্ধিকারী দেবীর উল্লেখ থেকে এই প্রভাবের কথা মনে হয়। শিবের উপাসনার অঙ্গ হিসেবে লিঙ্গপূজা শুরু হয়েছে, প্রায় ২ হাজার বছর আগে থেকে। এইসব দেবতার পূজার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পূজাপদ্ধতিরও বিরাম ঘটেনি। জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পাহাড় ও নদীকে পবিত্র মনে করা হতো। ষাঁড়, সাপ ও কয়েক ধরনের গাছকে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে পূজা করা হতো। গাভীকেও পূজা করা হতো। বিষ্ণুর প্রিয় পর্বত ছিল বৈকুণ্ঠ ও শিবের প্রিয় পর্বত ছিল কৈলাস। বিশ্বাস ছিল গঙ্গানদীর উৎপত্তি হয়েছে স্বর্গ থেকে। তাই গঙ্গার জলকে পবিত্র মনে করা হতো। এছাড়াও নানান উপদেবতা ও নানা ধরনের স্বর্গীয় প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল।

প্রথম দিকের হিন্দুধর্ম মূলত আনুষ্ঠানিক ছিল বটে, কিন্তু পরে বলা হল, ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠাও সম্ভব। ক্রমশ একেশ্বরবাদের ধারণা ও বিষ্ণু

বা শিবকে ঈশ্বরেরই দুইরূপে দেখার মনোভাব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। নতুন ধারণায় বলা হল, বিভিন্ন মানুষের ভক্তির পরিমাণ বিভিন্ন রকম এবং ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তকে প্রসাদ দান করতে পারেন। এই ব্যক্তিগত ভক্তির ব্যাপারটা ক্রমশ হিন্দুধর্মের এক গতিশীল শক্তিতে পরিণত হল।

বৈদিকধর্মের বলিদানের অনুষ্ঠানটা যে একেবারে বাদ গেল, এমন নয়। রাজ্যাভিষেকের সময় বলিদান হতো। কিন্তু ক্রমশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক প্রায় লোপ পেল। বৈদিক ঐতিহ্য নিয়ে মাথা ঘামাতো কেবল ব্রাহ্মণরাই। সাধারণ মানুষ আনন্দ পেত মহাকাব্য পড়ে, আর ব্রাহ্মণেরা পছন্দ করত বৈদিক সাহিত্য। মহাকাব্য ছাড়াও পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রও সাধারণ মানুষের প্রিয় ছিল। মহাকাব্যের নায়ক রাম ও কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বিষ্ণুরই মানবলীলা বলে মনে করত। মহাকাব্যগুলি প্রথমে ছিল চারণগাথা, কিন্তু পরে সেগুলিকে ঐশ্বরিক কাব্যের সম্মান দেওয়া হল। মহাকাব্যের মধ্যে আগে কোনো ধর্মীয় সুর ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা পরবর্তীকালে এগুলিকে ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে পরিমার্জনা করেছিল। জোর করে অন্যান্য বিষয়ও পুরনো রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হল। এভাবেই মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্‌গীতার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল।

ঈশ্বর-সম্পর্কিত চিন্তাধারার পরিবর্তনের উদাহরণ পাওয়া যাবে গীতার দর্শনের মধ্যে। ওই যুগের হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জন্মান্তরবাদ ও কর্ম সম্পর্কিত মতবাদ। বর্তমান জন্মের কাজকর্মের জন্যে মানুষ পরবর্তী জন্মে তার ফল পাবে। একে নিয়তিবাদ বললে ভুল হবে। কারণ, মানুষ ভালো কাজ করে পরবর্তী জন্মে পুরস্কারের অধিকারী হতে পারে বলে বিশ্বাস ছিল। কোনো কাজের ভালোমন্দ বিচার হত 'ধর্ম' বা প্রাচীন নিয়ম অনুসারে। তবে বিচারকর্তা ছিল ব্রাহ্মণরাই। গীতায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ কোনো প্রশ্ন না করে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী নিজের কর্তব্য করে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ যুদ্ধের সময় আত্মীয়-হননে অর্জুনের অনিচ্ছার উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে ন্যায়যুদ্ধে হত্যা করলেও অর্জুনের কোনো পাপ হবে না।* ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে ব্যক্তিগত পছন্দের খানিকটা অবকাশ থাকলেও ভালোমন্দ চূড়ান্ত বিচারের অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণদেরই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই গীতা একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সহজ ভঙ্গিতে কঠিন দার্শনিক চিন্তার বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি গ্রন্থটির রচনার অন্যান্য গুণও উল্লেখযোগ্য। এই সব কারণেই গীতা হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বলে পরিগণিত হয়।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে খ্রীস্টধর্ম প্রথম ভারতে এলো পশ্চিমী জগতের বাণিজ্য জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে— এডেসার ক্যাথলিক চার্চের মতে, সেণ্ট টমাস নাকি দু'বার

* অর্জুন ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবদের একজন, এক্ষেত্রে যে আত্মীয়দের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন অর্জুনের পিতৃব্যপুত্র কৌরবগণ—যাঁদের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য।

ভারতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। প্রথমবার তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্থিয়ান রাজা গণ্ডোকারনেসের কাছে যান। তবে এই কাহিনী যথেষ্ট বিশ্বাস-যোগ্য নয়, বরং দ্বিতীয়বার আগমনের কাহিনীর সত্যতা বেশি বলে মনে হয়। ৫২ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট টমাস মালাবারে এসে পেঁছান। এই উপকূলে কয়েকটি ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করে তিনি পূর্ব-উপকূলে মাদ্রাজ শহরের বেথ থুমাতে* আসেন। এখানে তাঁর ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় বাধা উপস্থিত হয়। মাদ্রাজের কাছে মায়লাপুরে ৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। এখনো মালাবার অঞ্চলে অনেকগুলি ধর্মকেন্দ্র আছে এবং এগুলি সম্ভবত প্রথম শতাব্দীতেই স্থাপিত। ওই শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যীশু খ্রীস্টের কোনো একজন শিষ্যের ভারতে আগমনের কাহিনী অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে।

* বেথ থুমা—হিব্রু ভাষায় 'টমাসের গৃহ'।

৭

'ধ্রুপদী' রীতির ক্রমবিকাশ

আনুমানিক ৩০০ খ্রীস্টাব্দ — ৭০০ খ্রীস্টাব্দ

মৌর্যযুগের পর কত রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটল। কিন্তু মৌর্যদের অনুকরণে সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনার অবসান হল না। তবে কেউই মৌর্যদের মতো সাফল্য-লাভ করেনি। উত্তর-ভারতে গুপ্তরাজবংশের (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী) শাসনকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বলে অনেকে বর্ণনা করলেও এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সাম্রাজ্য-বাদী শাসনের মূল কথা হল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু মৌর্যদের মতো গুপ্তরাজারা তেমন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেন নি। তবে ভৌগোলিক সীমাকেই যদি সাম্রাজ্যের পরিচয় বলে ধরা হয় তবে কয়েকজন রাজা সেই অর্থে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলতে হবে।

গুপ্তদের শাসনকালকে প্রাচীন ভারতের 'ক্লাসিকাল যুগ' বলে বর্ণনা করা হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীকে দিয়ে বিচার করলে এ মন্তব্যে কোনো ভুল নেই। বিশেষত উত্তর-ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ঐ যুগে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি উপভোগ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে সুদূর অতীতের গুপ্তযুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে মনে হয়েছে। এই যুগেই হিন্দু-সংস্কৃতি ভারতবর্ষে দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানত উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের সমৃদ্ধির যুগ এসেছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে।

গুপ্তদের আবির্ভাবের ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয়। হয়তো কোনো ধনী ভূম্যধি-কারী পরিবার ধীরে ধীরে মগধ অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃত্বও অধিকার করেছিল। কিন্তু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়। চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছিলেন এক লিচ্ছবি রাজকন্যাকে। লিচ্ছবিরা ছিল প্রাচীন ও সুপরিচিত জাতিগোষ্ঠী। তাদের রাজপরিবারে বিয়ের ফলে গুপ্ত-রাজবংশেরই সম্মান বাড়ল। চন্দ্রগুপ্তও এই সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সময়কার মুদ্রাগুলিতেও এই বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ দেখে সন্দেহ হয় যে, গুপ্তরা কোনো রাজবংশের সন্তান নন। চন্দ্র-গুপ্তর রাজত্বের সীমা ছিল মগধ ও উত্তর প্রদেশের পূর্বদিকের অঞ্চলগুলি। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করলেও এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। কেননা, কুষাণ রাজারাও এই উপাধি নিয়মিত ব্যবহার করেছিলেন। গুপ্তযুগের সূচনা ধরা হয় ৩১৯-২০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান ৩৩ খ্রীস্টাব্দে। সৌভাগ্যক্রমে সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় এলাহা-বাদের কাছে পাওয়া একটি স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে। মনে হয়, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে কিছু বিরোধ ছিল। কচ নামের একজন অতি

পরিচিত রাজপুত্রের নামেও কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। মনে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করেই সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি পাটলিপুত্রকে রাজধানী করে সমগ্র উপমহাদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। স্তম্ভলিপিতে বহু রাজার নাম উল্লেখ করা আছে। তাঁরা সমুদ্রগুপ্তের দেশ জয়ের সময় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। দিল্লী ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশে চারজন রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতের রাজারাও সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন; বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ থেকে মনে হয় সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব উপকূলে বর্তমান মাদ্রাজের কাছে কাঞ্চিপুরম পর্যন্ত তাঁর বিজয় অভিযান চালান। আর্যাবর্তের (গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিম অংশ) নয়জন রাজাকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেন। জঙ্গলের অধিপতিরাও (মধ্য-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উপজাতিগুলি) সমুদ্র-গুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এছাড়াও ছিলেন, পূর্ব-ভারতের আসাম ও বাংলা-দেশের রাজারা। অন্যদিকে পাঞ্জাব ও নেপালের ছোট ছোট রাজ্যও তাঁর অধিকারে এলো। রাজস্থানের নয়টি প্রজাতন্ত্র—যার মধ্যে ছিল প্রাচীন মালব ও যৌধেয় রাজ্য—গুপ্তদের অধীনে এলো। এছাড়া কয়েকজন বিদেশী রাজা দেবপুত্র শাহানুশাহী (সম্ভবত কুষাণ রাজা), শকরাজা, সিংহলের রাজা— এঁরাও সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু স্তম্ভলিপিটি মূলত প্রশস্তি গাথা বলে এইসব বর্ণনাকে সতর্কতার সঙ্গে বিচার করা দরকার। দক্ষিণ-ভারতের রাজারা সমুদ্রগুপ্তের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন না। তাঁরা কেবল সমুদ্রগুপ্তকে স্বীকৃতি দিতেন। উত্তর-ভারতের কয়েকজন রাজাও তাই। তাঁর অভিযানের শেষে তিনি উত্তর-ভারতের অনেক জায়গা জয় করে নিয়েছিলেন আর দক্ষিণ-ভারতের যেসব রাজ্য দখল করা সম্ভব হয়নি— সেগুলি থেকে কর আদায় করতেন। মনে হয়, সমুদ্রগুপ্ত অভিযানের সময় আশাতিরিক্ত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল কেবল গাঙ্গেয় উপত্যকাতে। পশ্চিম-ভারতের শকদের তিনি পরাস্ত করতে পারেন নি। রাজস্থানের উপজাতিগুলি কেবলমাত্র কর দিতেই সম্মত হয়েছিল, আর ওদিকে পাঞ্জাবও তাঁর শাসনসীমার বাইরে রয়ে গিয়েছিল।

তবে সমুদ্রগুপ্তের অভিযানের পর এইসব অঞ্চলের উপজাতীয় গণরাজ্যগুলির ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত পাঞ্জাব ও রাজস্থানে হূন আক্রমণের সময় উপজাতিগুলি আর তাদের বাধা দিতে পারেনি। গুপ্তরাজাদের সঙ্গে উপজাতীয় গণরাজ্যগুলির সম্পর্ক ছিল অদ্ভুত ধরনের। লিচ্ছবিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে গুপ্তরা একদিকে যেমন গর্বিত ছিল, অন্যদিকে আবার পশ্চিমদিকের গণরাজ্যগুলির ওপর আক্রমণ চালাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বারবার আক্রমণ সত্ত্বেও পশ্চিমাঞ্চলের গণরাজ্যগুলি বহু শতাব্দী ধরে টিকে ছিল। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের আক্র-মণেই উপজাতিগুলির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে গেল। বর্ণ ও উপজাতির প্রাচীন বিরোধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হল বর্ণ।

সমুদ্রগুপ্তের অভিযানের ব্যাপারে অন্যান্য দাবিগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কুষাণরাজারা তাঁর সময়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাদের ঠিক কেমন সম্পর্ক ছিল তা জোর করে বলা শক্ত। একটি চীনাসূত্র থেকে জানা যায়, সিংহলের রাজা সমুদ্রগুপ্তকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন এবং গয়াতে একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁর অনুমতিও চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অনুরোধকে বশ্যতা স্বীকারের উদাহরণ বলা যায় না। মনে হয়, অন্যান্য বিদেশী রাজাদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল এই ধরনেরই। এছাড়া 'দ্বীপের অধিবাসী' বলে যে কাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এখন বোঝা কঠিন। ভারতবর্ষের উপকূলের কাছাকাছি বা মালদ্বীপ বা আন্দামানও হতে পারে, কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথাও বোঝাতে পারে। ঐ সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা বড় বড় উপনিবেশ স্থাপন করে ফেলেছিল এবং ওখানকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। ৪৮ বছরের রাজত্বকালে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর অভিযান পরিকল্পনার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর অভিযানকে আরো ব্যাপক স্বীকৃতি দেবার জন্যে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। আর, এই যজ্ঞ করার অধিকার অন্যান্য বহু রাজার চেয়ে সমুদ্রগুপ্তেরই যে বেশি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সমুদ্রগুপ্ত মানুষ হিসেবে শুধু-মাত্র রাজ্যলোলুপতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহেই উৎসাহী ছিলেন না, শিলালিপি অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্তের কাব্য ও সংগীতেও আগ্রহ ছিল। একথা নিছক অতিশয়োক্তি নয়। কেননা, অনেকগুলি মুদ্রাতেই তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি দেখা গেছে।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত গুপ্তরাজাদের মধ্যে সবাপেক্ষা পরা-ক্রমশালী ছিলেন। ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৪১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। পিতার মতো তাঁর সিংহাসনারোহণের বৃত্তান্তও রহস্যাবৃত। ২০০ বছর পরে 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম' নামে একটি নাটক লেখা হয়েছিল। তার বিষয় ছিল সমুদ্র-গুপ্তের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী। ওই কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্তের পরে সিংহাসনে বসেন রামগুপ্ত। শকদের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী ধ্রুব-দেবীকে শকদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হন। তাঁর ছোটভাই চন্দ্রগুপ্ত এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এক পরিকল্পনা করলেন। রানী ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে তিনি শকরাজার প্রাসাদে ঢুকে পড়ে রাজাকে হত্যা করলেন। এই কাজের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও রামগুপ্তের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্তকে হত্যা করে ধ্রুবদেবীকে বিয়ে করলেন। শিলালিপির মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রীর নাম ধ্রুবদেবী বলে জানা যায়। এছাড়াও রামগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা- পাওয়া যাওয়ায় এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধান যুদ্ধ ছিল শকদের বিরুদ্ধে, তারও প্রমাণ আছে।

এই যুদ্ধ হয়েছিল ৩৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৪০৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এরপর শকরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয় ও পশ্চিম-ভারত গুপ্তদের দখলে চলে যায়। এই জয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে দুর্ভাবনা কমে গেল এবং সমগ্র উত্তর-ভারত গুপ্তদের অধিকারে এলো। তাছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যের

ব্যাপারেও সুবিধা হয়। কারণ, পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলি এবার গুপ্তদের করায়ত্ত হল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দক্ষিণ-ভারতে গুপ্তদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে একটি মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্ব অংশে অভিযান চালালেও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হননি। পশ্চিম অংশে যেখানে আগে তখন সাতবাহন বংশের প্রতিপত্তি ছিল সেখানে বাকাটক রাজবংশ রাজত্ব করছিল এবং তারা ক্রমশ দাক্ষিণাত্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে গুপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যার সঙ্গে বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিয়ে হয়। দাক্ষিণাত্যের অন্য কয়েকটি রাজবংশের সঙ্গেও গুপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এরূপ নানা কৌশলে তাঁর পিতার লক্ষ্য সম্পূর্ণ করলেন।

ওদিকে বাকাটক রাজবংশ খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। সাতবাহন রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তার ওপরই এই নতুন রাজবংশের পত্তন হয়। রাজা প্রথম প্রবরসেন রাজত্ব করেছিলেন খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে। তিনি দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশ ও মধ্য-ভারত জয় করেন। পরবর্তী রাজার আমলে বাকাটক রাজ্যকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়। ফলে রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এর একটি সুফল হয়, এই রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। সমুদ্রগুপ্ত বাকাটক রাজ্যের মধ্য-ভারতীয় সামন্ত রাজাদের আনুগত্য গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হলেন, মূল রাজ্যটি নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না। গুপ্ত আক্রমণ থেকে এইভাবে রক্ষা পাবার পর বাকাটক রাজারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশেও নিজেদের অধিকার বিস্তার করলেন। ওদিকে গুপ্ত রাজবংশ বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুফল পেলে অন্যভাবে। বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন পাঁচ বছর রাজত্ব করার পরই মারা যান। তাঁর ছেলেরা তখনো নাবালক বলে তাঁর বিধবা স্ত্রী (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা) ৩৯০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৪১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। এইভাবে বাকাটক রাজ্য প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর রাজত্বকাল কেবল যুদ্ধজয় ও রাজ্যবিস্তারের জন্যেই স্মরণীয় নয়। সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী হিসেবেই তিনি বেশি খ্যাত। সংস্কৃত ভাষার কবি কালিদাস তাঁর রাজসভার সভাসদ ছিলেন। এছাড়া তাঁর সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ দেখা যায়। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৪১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন ভারতীয় মঠে বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন। ফা-হিয়েনের মতে তখনকার ভারতবর্ষকে সাধারণভাবে একটি সুখী দেশ বলা চলে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও পরবর্তী রাজা কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৪৫৪ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে নতুন আক্রমণের সূচনা হয়। মধ্য-এশিয়ার হুনজাতির একাংশ আগের শতাব্দীতেই ব্যাকট্রিয়া অধিকার করেছিল। তারপর থেকে তারা আগেকার আক্রমণকারীদের মতো হিন্দুকুশ পর্বতমালা

অতিক্রম করে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে মোটামুটি শান্তিতে কেটেছিল ও রাজ্যের কোনো অঙ্গহানিও হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ১০০ বছর ধরে হূন আক্রমণের মোকাবিলা করা গুপ্ত রাজাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিল, কারণ ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের পর হূনেরা যখন শেষ পর্যন্ত আক্রমণে সাফল্যলাভ করল, তখন তারা খানিকটা হীনবল। তাদের আক্রমণে ভারতবর্ষের রোমসাম্রাজ্যের মতো দুরবস্থা হয়নি। একথা বলা যেতে পারে যে, চীন ও ভারতবর্ষে বারবার আক্রমণ ব্যাহত হবার ফলেই হূনরা ইয়োরোপের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কুমারগুপ্তের পরবর্তী রাজারা কিন্তু আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে তেমন সাফল্যলাভ করেন নি। বারংবার হূন আক্রমণের আঘাতে গুপ্তরাজারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। স্কন্দগুপ্ত বীরযোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও তাঁকে বিব্রত থাকতে হয়েছিল। সামন্ত রাজারা কেউ কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দিয়েছিল। এবং সেই কারণেই স্কন্দগুপ্তের আমলের মুদ্রাগুলি নিকৃষ্ট ধাতুতে তৈরি। এসব সত্ত্বেও তিনি ৪৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বেশ শক্তি সঞ্চয় করে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করেন। কিন্তু ৪৬৭ খ্রীস্টাব্দের পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসন দ্রুত দুর্বল হয়ে আসতে থাকে। পরবর্তী রাজাদের সম্পর্কে বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বেশ কয়েকটি সরকারি মুদ্রা পাওয়া গেছে ও তার মধ্যে বিভিন্ন রাজার নামও আছে। কিন্তু রাজাদের বংশানুক্রমিক বিবরণ কিছুটা অস্পষ্ট। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষদিকে হূনরা উত্তর-ভারতের নানা জায়গায় ঢুকে পড়ল। পরবর্তী ৫০ বছর ধরে গুপ্ত রাজবংশ আরো দুর্বল হয়ে পড়ল ও শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে যে হূনরা এলো তারা নিজেরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। হূনরাজার প্রতিনিধি হিসেবে তারা এখানে রাজ্যশাসন করত। পারস্য থেকে খোটান পর্যন্ত অঞ্চলে হূনদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। রাজধানী ছিল আফগানিস্তানের বামিয়ান। প্রথম উল্লেখযোগ্য হূনরাজা ছিলেন তোরামান, যিনি উত্তর-ভারত মধ্য-ভারতের এরন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। এঁর পুত্র মিহিরকুলের (৫২০ খ্রীস্টাব্দ) মধ্যে হূনদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল। এইসময়ে উত্তর-ভারতে ভ্রমণরত এক চীনা পরিব্রাজক তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মিহিরকুলের ব্যবহার ছিল অদ্ভুত ধরনের। তিনি মূর্তিবিনাশী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের ওপর তাঁর একটা বিদ্বেষ ছিল।* মধ্য-ভারতে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় গুপ্তরাজারা তখনো নিজেদের চেষ্টায় ও অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় হূনদের বিরোধিতার চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মিহিরকুলকে সমভূমি অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে কাশ্মীরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ৫৪২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হূনদের রাজনীতিক গুরুত্ব কমে যায়। তবে গুপ্ত রাজবংশ হূন আক্রমণ

* কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কাহিনী শোনা যায়।

ব্যতিরেকেও খুব বেশিদিন টিকে থাকত বলে মনে হয় না। হুনরা কেবল গুপ্তদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

কিন্তু হুন-আক্রমণের এটাই একমাত্র ফল ছিল না। যে সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, এবং যার একটা কাঠামোর আভাস পাওয়া গিয়েছিল— তার পতন ঘটল। কেননা, হুন আক্রমণ প্রতিহত করতেই সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত উপমহাদেশের শক্তিকে একত্র করে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হবার কথা সেযুগে কেউ ভাবত না। স্থানীয় রাজারা নিজেদের সাধ্যমতো যুদ্ধ করতেন। অনেক সময় অবশ্য কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য একত্র হয়ে পড়ত। এর ফল হিসেবে অনেক সময় রাজ্যগুলি এক সমর্থ নেতার অধীনে এক রাজ্যেও পরিণত হয়েছে। তবে সেখানে রাজবংশের সম্মানের চেয়ে সামরিক শক্তিই বড়কথা ছিল। এই অনিশ্চিত ও বিশৃংখল পরিস্থিতির মধ্যে আবার নতুন নতুন জাতিগোষ্ঠীর লোকের আগমনে সমাজে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। হুনদের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার আরো অন্য উপজাতিভুক্ত মানুষও ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল। তারা ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে একদল ছিল গুর্জর উপজাতি এবং এরা কয়েক শতাব্দী পরে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাজস্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যায় ও সেখানে নতুন উপজাতিরা এসে বসবাস শুরু করে। এরাই কিছু কিছু রাজপুত পরিবারের পূর্বপুরুষ হিসেবে উত্তর-ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে তুর্কী ও পারস্যবাসীরা হুনদের ওপর ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। এর ফলে ভারতবর্ষের ওপর হুন আক্রমণেরও ভাঁটা পড়ে। তা সত্ত্বেও হুনরা উত্তরভারতের ঘটনাপ্রবাহে পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে।

গুপ্তদের পতন ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে হর্ষবর্ধনের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃংখল ছিল এবং এ সম্বন্ধে খুবই সামান্যই তথ্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু সময় ধরে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ স্থান বদল করে অন্যত্র নতুন করে বসবাস শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। গুপ্তদেব গৌরবের উত্তরাধিকারের জন্যে ছোট ছোট রাজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছিল। উত্তর-ভারতে এই সময় প্রধান চারটি রাজ্য ছিল— মগধের গুপ্তবংশ, মৌখরি বংশ, পুষ্যভূতি বংশ ও মৈত্রক বংশ। মগধের গুপ্তদের সঙ্গে কিন্তু আগেকার গুপ্তবংশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মৌখরি বংশ পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের কনৌজ অঞ্চলে রাজত্ব করত। কিছুদিন পরে এরা গুপ্তদের মগধ থেকে বিতাড়িত করে। তখন গুপ্তরা চলে আসে মালবে। পুষ্যভূতিদের রাজ্য ছিল দিল্লীর উত্তরে থানেশ্বরে। এদের সঙ্গে মৌখরিদের একটা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। শেষ মৌখরি রাজার মৃত্যুর পর ওই রাজ্যের অভিজাত বংশীয় লোকরা পুষ্যভূতি রাজা হর্ষবর্ধনকে দুই রাজ্য এক করে দিয়ে কনৌজ থেকে রাজ্যশাসন করতে অনুরোধ করল। মৈত্রক বংশ সম্ভবত ইরান থেকে এসেছিল। ওদের রাজা ছিল গুজরাট অঞ্চলে (বর্তমান সৌরাষ্ট্র)। এই রাজ্যের রাজধানী বলভি শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই চারটি রাজ্যের আশেপাশে যে কয়েকটি ছোটখাট রাজ্য ছিল, তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। বঙ্গদেশ

আর আসামেও এই ঘটনা ঘটেছিল। চারটি রাজ্যের মধ্যে মৈত্রকদের রাজ্য সবচেয়ে বেশিদিন টিকেছিল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর আরব-আক্রমণের ফলে মৈত্রক বংশের পতন হয়।

হূন আক্রমণের পর পুষ্যভূতি বংশের সূচনা হয় এবং প্রভাকরবর্ধনের সিংহাসনারোহণের পর এরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধনের জীবনীলেখক বাণ ওঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

> …হূন হরিণের কাছে তিনি ছিলেন সিংহের মতো, সিন্ধু অঞ্চলের রাজার কাছে তপ্ত জ্বরের মতো, গুজরাটের নিদ্রার ব্যাঘাতকারী, গজহস্তী গান্ধারপতির কাছে ভীষণ ব্যাধির মতো, ন্যায়-নীতিহীন লাটদের কাছে দস্যুর মতো এবং মালবের গৌরব-লতার কাছে কুঠারের মতো।

রাজ্যবিস্তারের যে স্বপ্ন প্রভাকরবর্ধনের ছিল, তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে উঠেছিল তাঁর কনিষ্ঠপুত্র হর্ষবর্ধন বা হর্ষের সময়ে।

হর্ষ রাজা হলেন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে। বাণ তাঁর জীবনী রচনা করে গেছেন 'হর্ষচরিত' নামক গ্রন্থে। এছাড়া একজন চীনাবৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্-এর লেখা বিবরণও পাওয়া গেছে। তিনি হর্ষর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ছিলেন। ৪১ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে হর্ষ উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অংশে তাঁর রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁর অধীনে ছিলেন জলন্ধর, কাশ্মীর, নেপাল ও বল্লভির সামন্তরাজারা। হর্ষ অবশ্য দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হননি। ববং দক্ষিণ-ভারতীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হর্ষর বড় পরাজয় হয়েছিল। হর্ষ অদম্য উৎসাহ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের অবস্থা নিজে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। হর্ষর নিজের সাহিত্যপ্রতিভাও ছিল। শাসনকার্যের দায়িত্ব সত্ত্বেও হর্ষ তিনটি নাটক রচনা করে গেছেন। এর দুটি ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে লেখা কমেডি ও অন্যটি ধর্মীয় বিষয়ের ওপর লেখা নাটক।

হর্ষর রাজত্বকালের শেষদিকের ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায় চীনাসূত্রে। ঐ সময় চীনদেশের সম্রাট ছিলেন তাঙ্ বংশীয় তাঈ-সুঙ্। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ ও ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে দু'বার দূত পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার চীনাদূত এসে দেখলেন, হর্ষর মৃত্যু হয়েছে ও একজন অযোগ্য ব্যক্তি সিংহাসনে বসেছে। এই দেখে চীনাদূত নেপাল ও আসামে চলে গিয়ে এক সৈন্যবাহিনী একত্র করলেন—যাদের সাহায্যে হর্ষর মিত্রশক্তিরা যুদ্ধে জিতলেন এবং ওই অযোগ্য রাজাকে চীনদেশে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হল। তাঈ-সুঙের সমাধির পাদদেশে ওই ব্যক্তির নাম লেখা আছে। কিন্তু এরপর হর্ষবর্ধনের রাজ্য ক্রমশ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল।

হর্ষ বুঝেছিলেন ছোট ছোট রাজ্যগোষ্ঠীর দুর্বলতা। তাই তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে জয় করে সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। গুপ্তদের মতো হর্ষর অধীনেও বেশ কয়েকটি সামন্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু মৌর্যদের সাম্রাজ্যের মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন শক্তিশালী হয়নি কেন, তার কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

গুপ্তরাজারা নানারকম মহিমময় উপাধিতে নিজেদের ভূষিত করেছিলেন। যেমন

—রাজাধিরাজ, সম্রাটশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু শেষদিকের গুপ্তরাজাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপাধি ছিল নেহাতই অতিরঞ্জন। তাঁদের রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা গুপ্ত রাজাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ওখানকার শাসনপদ্ধতির সঙ্গে মৌর্য-পদ্ধতির কিছু-কিছু মিল ছিল। রাজা ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। যুবরাজ তাঁকে সাহায্য করতেন। অন্যান্য রাজপুত্ররা প্রদেশগুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। বিভিন্ন মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা রাজাকে সাহায্য করতেন। প্রদেশগুলি (দেশ বা ভুক্তি) কয়েকটি জেলায় (প্রদেশ বা বিষয়) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব শাসন-বিভাগীয় দপ্তর থাকত। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপর সাধারণত কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। স্থানীয় শাসকরাই সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় শাসকের নীতি বা আদেশের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ সেখানে থাকত না। সেখানে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেই হোক আর বিভিন্ন পরিস্থিতেই হোক, স্থানীয় সিদ্ধান্তই গৃহীত হতো। জেলার শাসনকর্তারা (কুমারামাত্য) ছিলেন কেন্দ্র ও স্থানীয় শাসনের যোগসূত্র। এইখানেই মৌর্যদের সঙ্গে গুপ্তদের শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল। অশোকের অভিমত ছিল, জেলাগুলির নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে গুপ্তরাজারা কুমারামাত্য শাসকদের ওপরই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

গ্রাম শাসনের দায়িত্ব ছিল গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ও মোড়লের ওপর। গ্রামশাসনে কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্থানীয় সুবিধা-অসুবিধাকেই বড় করে ধরা হতো। শাসনের জন্যে যে সংস্থা ছিল তার সভ্য ছিলেন ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘের প্রতিনিধি, কারিগরদের প্রতিনিধি, পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রধান করণিক। শহরের প্রতি অঞ্চলেও এই ধরনের স্থানীয় সংস্থা থাকত। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বিবরণ থেকে এই স্থানীয় সংস্থাগুলির পার্থক্য বোঝা যায়। মৌর্য আমলে সংস্থাগুলি সরকার দ্বারা নিযুক্ত হতো। গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় লোকদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হতো এবং এই সংস্থায় ব্যবসায়ীরা বেশি গুরুত্ব পেত।

হর্ষ তাঁর কর্মচারীদের মাধ্যমে ও নিজের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের ফলে জনমত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতেন। এইভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনারও সুবিধা হতো। কিন্তু খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে যেরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মৌর্যদের মতো কেন্দ্র পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অসম্ভব ছিল। দেশভ্রমণ করে হর্ষ তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতেন। কর আদায়ের কাজ হর্ষ নিজেই দেখাশোনা করতেন, অভিযোগ শুনতেন, শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করতেন এবং প্রচুর দানও করতেন।

এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বেতন সব সময় অর্থে দেওয়া হতো না, পরিবর্তে প্রায়ই ভূমি দেওয়া হতো। ভূমিদান সম্পর্কে বহু শিলালিপি ও ধাতুফলক পাওয়া গেছে এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণে এর উল্লেখ আছে। কেবল সামরিক বাহিনীকে অর্থে বেতন দেওয়ার রীতি ছিল। জমিদার ছিল দু'রকমের। কেবল ব্রাহ্মণদের জন্যে ছিল 'অগ্রহার' ভূমিদান। তার জন্যে কোনো কর দিতে হতো না। এই জমি

সাধারণত পরিবারগুলির বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করার অধিকার থাকলেও গ্রহীতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে রাজা ওই জমি চেয়ে নিতেও পারতেন। আর এক ধরনের ভূমিদান করা হতো সরকারি কর্মচারীদের—কখনো বেতন হিসেবে, কখনো ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে। প্রথমদিকে এই ধরনের ভূমিদান বেশি হতো না। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এটা প্রায় প্রথা হয়ে দাঁড়ালো। প্রথমযুগে যখন ভূমিদান একটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ছিল, 'অগ্রহার' ভূমিদানের দ্বারা সমাজে ব্রাহ্মণদের বিশেষ স্থানটিই ফুটে উঠত। ক্রমাগত ভূমিদানের ফলে পরে কিন্তু রাজার ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা ভূমিদানের সুফল পেত ও তারা কেন্দ্রীয় শাসনের আওতার বাইরে চলে যেত। রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে এরা রাজনৈতিক বিরোধিতা শুরু করতে পারত।

জমি ছিল তিন ধরনের— রাজ্যের মালিকানাভুক্ত অনুর্বর জমি, যেগুলি সাধারণত দান করা হতো ; রাজ্যের মালিকানাভুক্ত উর্বর চাষযোগ্য জমি, যেগুলি সচরাচর দান করা হতো না ; ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত জমি। ভূমি যখন বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হতো, গ্রহীতা ভূমির সম্পূর্ণ অধিকারী হতো না। গ্রহীতা ওই জমির বর্গা-দারদের উচ্ছেদ করতে পারত না। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক পেত, বাকিটা বর্গাদাররা। জমির উর্বরতা অনুসারে জমির দামের পার্থক্য হতো। অনুর্বর জমির চেয়ে উর্বর জমির দাম শতকরা ৩৩ ভাগ বেশি হতো। এই-সময়ে যেসব ফসলের চাষ হতো, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও বহুকাল পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে আখ ও গমের চাষ হতো এবং মগধ ও আরো পূর্বদিকের অঞ্চলগুলিতে ধানচাষ হতো। এছাড়া বহুরকমের সবজি ও ফলেরও উল্লেখ আছে। গ্রামাঞ্চলে চাকা ঘুরিয়ে জল-সেচের পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ছিল। মৌর্যরা যে সুদর্শন সরোবর তৈরি করে দিয়ে-ছিলেন এবং রাজা রুদ্রদামন যার সংস্কার করেছিলেন, সেটি এই যুগে আবার সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়।

জমির কর আদায় হতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কখনো সোজা জমি থেকে, কখনো বা উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে। রাজকীয় জাঁকজমক বজায় রাখতে গিয়ে যে অর্থ-নীতির ওপর অনাবশ্যক চাপ পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তযুগের শেষ-দিকের মুদ্রাগুলি থেকে। হর্ষবর্ধন জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ বরাদ্দ করেছিলেন সরকারি খরচের জন্যে। আর-এক চতুর্থাংশ ছিল রাজকর্মচারীদের বেতনের জন্যে। আর এক-চতুর্থাংশ দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের জন্যে পুরস্কার দেওয়া হতো। শেষ চতুর্থাংশ খরচ হতো উপহার ও দানের জন্যে। এই ভাগাভাগি যতই ভালো লাগুক, এর মধ্যে বাস্তব অর্থনীতির জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় ছিল না।

কর আদায় হতো প্রধানত জমি থেকে। বাণিজ্যিক কাজকর্ম থেকে আগের মতো আর আয় হতো না। আগে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থাগম হতো। কিন্তু খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে ওই বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে। তারপর হুন আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ওই বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপনের ফলে বেশ অর্থব্যয়ও হচ্ছিল। গুপ্তযুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে পূর্বযুগের অর্থনৈতিক উত্থানের শেষ অধ্যায়।

সমবায় সংঘগুলিই জিনিস তৈরি ও ব্যবসায়িক ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। সংঘগুলির পরিচালনার ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল বিরল। এগুলির নিজস্ব যেসব নিয়ম-কানুন ছিল তা তৈরি করে দিত সংঘগুলির মিলিত সংস্থা। এই সংস্থা কয়েকজন পরামর্শদাতা নির্বাচন করত ও তারাই সংস্থাটি পরিচালনা করত। কয়েকটি বড় শিল্পের সমবায় সংঘের নিজস্ব সংস্থা থাকত। এই সংস্থা বড় বড় কাজেরও দায়িত্ব নিত। যেমন, মন্দির নির্মাণে অর্থসাহায্য। বৌদ্ধ সংঘগুলি রীতিমতো ধনী ছিল ও তারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত। অনেক সময়ে বৌদ্ধসংঘ ব্যাঙ্কের মতো টাকাও ধার দিত। অবশ্য সুদও নিত। এ ছাড়া সংঘের দান হিসেবেও পাওয়া যেসব জমি ছিল, তার উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ সংঘ ভোগ করত। কর হিসেবেও চাষীকে এই একই পরিমাণ শস্য সরকারকে দিতে হতো। কিছু কিছু ব্রাহ্মণ দানের জমির ওপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করত। বাকাটক রাজারা এবিষয়ে খুব উদার ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত ঝুঁকির কাজ করা অপছন্দ করত। বৌদ্ধ সংঘগুলির চেয়ে ব্রাহ্মণরাই বেশি জমির সঙ্গে একাত্ম ছিল। ভূমিলব্ধ অর্থ ব্রাহ্মণরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করেছে, এমন ঘটনা বিরল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের নিকট সম্পর্কের জন্যেই বৌদ্ধ সংঘগুলি ব্যবসায়ে এত অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।

সুদের হার নির্ভর করত কিসের জন্যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছে তার ওপর। মৌর্যযুগে সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্যে অত্যধিক চড়াহারে সুদ দিতে হতো, কিন্তু এইযুগে তেমন দাবি করা হতো না। কেননা, এতদিনে সমুদ্র-বাণিজ্য সম্পর্কে লোকের আস্থা বেড়ে গেছে। আগের যুগে সুদের হার ছিল বছরে ২৪০ শতাংশ। এই যুগে তা এসেছিল মাত্র ২০ শতাংশে। সুদের হার বেআইনীভাবেও চড়া হতো যদি ঐ হারে দু'পক্ষেরই সম্মতি থাকত। কিন্তু সাধারণত সুদ নিম্নমুখী হবার আর একটি কারণ হল জিনিসপত্রের প্রাচুর্য্য ও লাভের হার হ্রাস। বস্ত্রবয়ন ছিল তখনকার সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ শিল্প। ভারতবর্ষের মধ্যেই বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে বস্ত্রব্যবসাই ছিল প্রধান। এ ছাড়া বিদেশের বাজারেও ভারতীয় বস্ত্রের বেশ চাহিদা ছিল। সিল্ক, মসলিন, উল, সুতি, ক্ষৌমবস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। পশ্চিম-ভারত ছিল রেশমবস্ত্র উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র। গুপ্তযুগের শেষভাগে রেশমের উৎপাদন কিছুটা কমে যায়। এর কারণ হল, ঐ অঞ্চলের একটি বড় সমবায় সংঘের কারিগররা তাদের পেশা পরিবর্তন করে। মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যপথ ও সমুদ্রপথে চীন থেকে প্রচুর চীনাংশুক আমদানি হওয়ার জন্যেও ভারতবর্ষে উৎপাদন হয়তো কমে গিয়েছিল। তবে উৎপাদনে নিম্নগতি সম্ভবত পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া হাতির দাঁতের শিল্প ও পাথরের ওপর খোদাই শিল্প এসময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। ধাতুশিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল তামা

লোহা, সীসা। ব্রোঞ্জের ব্যবহারও বাড়ছিল। আর সোনা-রুপোর চাহিদা তো সব সময়েই ছিল। পশ্চিম-ভারতের মুক্তা উৎপাদন শিল্পও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল— যখন বিদেশী বাজারে মুক্তা খুব উচ্চমূল্যে বিক্রীত হতে লাগল। বহির্বাণিজ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের পাথর। জ্যাসপার, অকীক প্রস্তর (অ্যাগেট) কর্নেলিয়াস, স্ফটিক, নীলকান্তমণি ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে রপ্তানি হতো। পাথরগুলি কেটে পালিশ করে পাঠানো হতো, মাটির পাত্রও নিয়মিত তৈরি হতো। তবে আগেকার সুন্দর কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র তখন আর ব্যবহৃত হতো না। এর বদলে সাধারণ লাল রঙের পাত্র তৈরি হতো। কখনো এগুলি তৈরির সময়ে মাটির মধ্যে অভ্র মিশিয়ে এগুলিকে আরো জৌলুস দেওয়া হতো এবং সেগুলি অনেকটা ধাতুনির্মিত পাত্রের মতো দেখাতো।

ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণদিকে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান ও পরে হর্ষবর্ধনের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়মিত সফরের ফলে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছিল। মালবাহী পশু ও বলদগাড়ি যাতায়াত করত এবং কোনো জায়গায় হাতি দিয়েও মাল বহন করানো হতো। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর নিম্নাংশে নিয়মিত জলযান চলাচল করত। পূর্ব-উপকূলের তাম্রলিপ্ত, ঘণ্টশাল ও কদুর বন্দরগুলি দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য চলত। পশ্চিম-উপকূলের ব্রোচ, চাওল, কল্যাণ ও কামবে বন্দর দিয়ে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম এশীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-ভারতের বন্দরগুলির ওপর গুপ্তদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আগের মতোই মশলা, মরিচ, চন্দনকাঠ, মুক্তা, দামী পাথর, নীল ও ওষধিলতা ইত্যাদি রপ্তানি করা হতো। কিন্তু আমদানির ধাঁচ পালটে গিয়েছিল। চীন থেকে সিল্ক ও ইথিওপিয়া থেকে হাতির দাঁতের আমদানি শুরু হয়েছিল। আরবদেশ, ইরান ও ব্যাকট্রিয়া থেকে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ঘোড়া আমদানি শুরু হয়েছিল। ঘোড়া জলপথে বা স্থলপথে আসত। আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষে ভালো ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির চেষ্টা কখনো হয়নি।* এর ফলে ভারতীয় সেনাদলের ঘোড়সওয়ার বাহিনী মধ্য-এশিয়ার ঘোড়সওয়ারদের তুলনায় নিতান্তই দুর্বল ছিল।

এইসময়ে ভারতীয় জাহাজগুলি নিয়মিত আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের বন্দরগুলিতে যাতায়াত করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে ভারতীয় জাহাজগুলি যেত, তাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে— ঐগুলিতে ছিল 'চৌকো পালমাস্তুল, মসৃণ উপরিভাগ ও পাটাতনের নিচে দু'সারি দাঁড়।' ঐ বর্ণনায় 'কৃষ্ণবর্ণ যবনদের দ্বীপ' বলে যে অঞ্চলের উল্লেখ আছে তা সম্ভবত মাদাগাসকার বা জাঞ্জিবারের নিগ্রো জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেই বলা হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে। এই যুগে বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়ে উঠল। পূর্ব-আফ্রিকার বন্দরে

* এর একমাত্র সম্ভাব্য কারণ এই যে, এদেশের জলবায়ু ও বিশেষ ধরনের তৃণের অভাবে উচ্চ শ্রেণীর ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না।

চীনারাও বাণিজ্য করত। এই যুগে ভারতবর্ষে সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য সম্পর্কে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা অনুশাসন দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। এর ফলে বহুলোক সমুদ্রবাণিজ্য থেকে বিরত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি নিয়ে এই সময়কার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকেরা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছিল। দূরদেশে গেলে ম্লেচ্ছ ও বর্ণ-বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা হবে এই ছিল আপত্তি। বিদেশে নিজের বর্ণের বিশিষ্ট নিয়মকানুন পালন করাও সম্ভব ছিল না। বিদেশযাত্রায় আপত্তি তুলে ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাফল্যকে সীমিত করতে চাইছিল।

নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হবার ফলে ও রাজ্যের প্রদেশগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব-বৃদ্ধির জন্যে যেসব শহরগুলির কেবলমাত্র স্থানীয় গুরুত্ব ছিল, সেগুলি আরো প্রাধান্য লাভ করল। হর্ষবর্ধনের সময়ে পাটলিপুত্রের (পূর্বতন অধিকাংশ উত্তর-ভারতীয় রাজ্যের রাজধানী) গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তার বদলে কনৌজের (উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশে) প্রাধান্য বেড়ে গেল। মথুরা ও বারাণসী মন্দিরও বয়নশিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠল। থানেশ্বর সামরিক দিক থেকে গুরুত্ব পেল— এখান থেকেই উত্তর গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। হরিদ্বার একটি নতুন তীর্থস্থান হয়ে উঠল। অধিকাংশ শহরের পরিকল্পনা ছিল সহজ সরল—চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র হিসেবে সাজানো। বাড়িগুলির উঁচু বারান্দা ও জানালা ছিল। যেসব প্রধান রাস্তায় বাজার ও দোকান বেশি থাকত, সেখানকার বাড়িগুলি হতো ছোট আকারের। ওপরের বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যেত। এসময়ে শহরের ধনীব্যক্তিরা কাঠের বদলে ইটের তৈরি বাড়িই পছন্দ করত। দরিদ্ররা বাঁশ ও গাছের ডাল দিয়ে ঘর তৈরি করত। বাড়িগুলির গঠন এবং প্রচুর কুয়ো ও পয়ঃপ্রণালী দেখে বোঝা যায়, শহরের পরি-কল্পনা বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছিল।

খননকার্যের ফলে গুপ্তযুগের সময়কার যেসব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, সেগুলির উন্নত গঠনভঙ্গি এবং সমসাময়িক সাহিত্যে জীবনের বর্ণনা ইত্যাদি থেকে মনে হয় ঐ সময় জীবনযাত্রার মান ছিল বেশ উঁচু। শহরের ধনী অধিবাসীরা আরামে থাকত ও দামী কাপড়, পাথর ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করত। মুখ-বিশিষ্ট মাটির পাত্র ও প্রচুর তামা ও লোহার জিনিসপত্র দেখে মনে হয়, অন্তত শহরাঞ্চলে আরামের জীবন কেবলমাত্র ধনীদের একচেটিয়া ছিল না। কিন্তু এই সভ্যতায় জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল বহু বিভিন্ন রকম। সুখী নগরবাসীদের চারিপাশে নগরের আওতার ঠিক বাইরে থাকত বর্ণবহির্ভূত মানুষেরা— অনেকটা আজকের যুগের শহরের বাইরে বস্তির মতো। একবার গ্রামে গেলে অবশ্য জীবনযাত্রার এতটা প্রভেদ চোখে পড়ত না। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, গ্রামের মানুষের অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল।

'কামসূত্র' বইটির মধ্যে শহরের ধনী নাগরিকদের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। নাগরিকদের অবসর ছিল এবং অবসর বিনোদনের আর্থিক সঙ্গতিও ছিল। সূক্ষ্ম কলা ও শিল্পে নৈপুণ্যলাভ এই জীবনের বিশেষ কাম্য ছিল। শহরের নবীন নাগ-

রিকদের কাব্য সংগীত ও শিল্পচর্চায় অনুরাগ হবে, এটাই আশা করা হতো এবং তার জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। সভা-সমাবেশে কাব্যপাঠ হতো। শিল্পীদের বাড়ির সব সময়েই চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা দেখা যেত। এছাড়া বীণা বাজিয়ে সংগীতচর্চা করা হতো। তাছাড়া তরুণরা প্রণয়ের ব্যাপারে যাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে 'কামসূত্র' ও অন্যান্য বই রচিত হয়েছিল। 'কামসূত্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই বইতে প্রণয় ও কামকলার সমস্ত দিক নিয়ে এত সহজ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে যে তার সঙ্গে এ বিষয়ের আধুনিক বইয়ের বিশেষ কোনো পার্থক্যই নেই। বারাঙ্গনারা ছিল নগরজীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ— এদের ঘৃণা করাও হতো না, অথবা এদের প্রতি অধিক ভাবালুতা দেখানো হতো না। 'কামসূত্রে' বারাঙ্গনাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির যে বিবরণ আছে তা থেকে বোঝা যায়, তাদের পেশা কিছু সহজ ছিল না। জাপানের গেইশা বা গ্রীসের হেটেরাদের মতো ভারতীয় বারাঙ্গনারাও প্রয়োজনে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করার শিক্ষা পেত।

সাহিত্য ও শিল্পে ভারতীয় নারীকে যতই মর্যাদা দেওয়া হোক-না-কেন, বাস্তবে নারীর সামাজিক মর্যাদা পুরুষের সমান ছিল না। উচ্চবর্ণের নারীরা পড়াশোনার সীমিত সুযোগ পেত। কিন্তু তাতে তাদের কথাবার্তায় কিছুটা বুদ্ধিমত্তার ছাপ পড়া ব্যতীত আর কোনো কাজ হতো না। জনজীবনের কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করা এই সামান্য শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হতো না। নারীশিক্ষিকা বা দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম। এই যুগে এমন কয়েকটি প্রথা চালু হল যা পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সমাজে নারীর মর্যাদা সীমিত করে রেখেছিল, যেমন বাল্যবিবাহ। এমনকি রজোদর্শনের আগেও মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী বাকি জীবনটা কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে কাটাবে, এই হল নতুন বিধান। এমনকি স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে মেয়েদের 'সতী'* আখ্যা দেওয়া হতে লাগল। উত্তর-ভারতের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে ব্যাপক সহমরণের রীতি ছিল। কিন্তু পুণ্য অর্জনের জন্যে তারা ঐ প্রথা পালন করত না। যুদ্ধে সৈনিক স্বামীর মৃত্যু হলে বিজয়ীপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের অপমান এড়ানোর জন্যেই সৈনিকদের বিধবা স্ত্রীরা আগুনে পুড়ে মরত। এরন অঞ্চলে পাওয়া একটি শিলালিপিতে এই প্রথার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ৫১০ খ্রীস্টাব্দে। কেবল মধ্যভারত, পূর্বভারত ও নেপালের উচ্চবর্ণের মধ্যেই এই প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ সামাজিক প্রথার বাইরে বেরিয়ে গেলে তবেই নারীদের স্বাধীনভাবে থাকা সম্ভব ছিল। বেরিয়ে যাওয়ার তাৎপর্য হল— হয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠের জীবন বেছে নেওয়া, আর নয়তো অভিনেত্রী, রাজনর্তকী কিংবা বারাঙ্গনার জীবন বেছে নেওয়া।

নাট্যাভিনয় ঐ যুগে বেশ জনপ্রিয় ছিল। গানবাজনা ও নাচের আসর বসত প্রধানত ধনী ও সমঝদার ব্যক্তিদের বাড়িতে। জুয়ার আসরে পুরুষদের আগের

* ইংরেজিতে এই 'সতী' কথাটির অনেক সময় অপপ্রয়োগ হয়। আক্ষরিকভাবে সতী কথাটির অর্থ—পুণ্যবতী নারী। একজন রমণী স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে তিনি পুণ্যবতী নারীর অধিকার অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ইংরেজি বাক্যাংশ 'to commit *sati*' সম্পূর্ণ অর্থহীন।

মতোই আগ্রহ ছিল। আর ছিল জানোয়ারের লড়াই, বিশেষ করে ভেড়া, মোরগ এবং গ্রামাঞ্চলে তিতির পাখির লড়াই। খেলাধুলার মধ্যে শরীরচর্চা ও মল্লক্রীড়া বেশি জনপ্রিয় ছিল। তবে গ্রীক বা রোমানদের মতো কখনো খেলাধুলা নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। সমস্ত উৎসবেই জনপ্রিয় প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। বসন্ত উৎসবের সময় প্রচুর পানভোজন করে সবাই আনন্দ করত। ফা-হিয়েন যদিও লিখে গেছেন যে ভারতীয়রা নিরামিষাশী ছিল, প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ লোকই মাংস খেত। দেশী বা বিদেশী মদও রোজই পান করা হতো। এছাড়া মশলা দিয়ে পান চিবোনোও নিত্য অভ্যাস ছিল।

এই যুগেও বর্ণ ও পেশার নিকট সম্বন্ধ বজায় ছিল। তবে, সবসময় সামাজিক নিয়ম ও আইনের বই অনুসরণ করা হতো না। বর্ণচ্যুতরা পৃথক একটি শ্রেণী ছিল। তবে মৌর্যযুগের তুলনায় শূদ্রদের মর্যাদা বেড়েছিল। আইনে শূদ্র ও ক্রীতদাসের আলাদা মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। মৌর্যদের মতো গুপ্তরা ততটা সরকারী নিয়ন্ত্রণে সক্ষম না হওয়ায় শূদ্রদের ওপর রাজনৈতিক চাপও ছিল কম।

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে 'দ্বিজ' আখ্যাটি এই যুগে বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের পবিত্রতার ওপর যত জোর দেওয়া হচ্ছিল, বর্ণচ্যুতদের অপবিত্রতার ব্যাপারটাও তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফা-হিয়েন লিখেছেন, বর্ণচ্যুতদের কাছাকাছি গেলেই অপবিত্র হয়ে যাবার ভয় পেত ব্রাহ্মণরা। অর্থাৎ, কোনো ব্রাহ্মণ যদি কোনো বর্ণচ্যুত ব্যক্তির কাছাকাছি এসে পড়ত, তাহলেই ধর্মীয় রীতি অনুসারে স্নান করে শুদ্ধ হতে হতো। আইনগ্রন্থেও এই ধরনের নিয়মকানুনই লেখা ছিল।

শিলালিপি থেকে জানা যায়, উপবর্ণগুলির মধ্যে তখনো পর্যন্ত এত কড়াকড়ি ছিল না। এর একটা উদাহরণ হল, পশ্চিম-ভারতের একদল রেশম তন্তুবায় যখন এই পেশা ছেড়ে অন্য অঞ্চলে চলে এলো, তখন তারা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছিল। যেমন— তীরন্দাজ, সৈনিক, কবি, পণ্ডিত প্রভৃতি। এইভাবে বর্ণের দিক দিয়েও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হল। তবে, পেশার পরিবর্তন সত্ত্বেও পুরণো পেশার কথা তারা তখনি ভুলে যায়নি। এরা আগে ছিল সূর্য-উপাসক। এরপর তারা একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করে মন্দিরের মধ্যে তাদের সমবায় সংঘের ইতিহাস লিখে রাখল।

অধিকাংশ আইনগ্রন্থই মনুর ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। এই যুগের বিখ্যাত আইনগ্রন্থগুলির রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন। যৌথ পরিবার প্রথাও এইযুগে প্রচলিত ছিল। পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের সমান অধিকার ছিল। পিতার সম্পত্তিতে প্রত্যেক পুত্রের সমান অধিকার ছিল।

কাত্যায়ন আইন-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। অন্যান্য বিচারপতি, মন্ত্রী, প্রধান পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা রাজাকে বিচারে সাহায্য করত। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিরও সাহায্য নেওয়া হতো। রাজা ছাড়া বিচার করার অধিকার ছিল সমবায় সংঘ ও গ্রামসভাগুলির; রাজা তাঁর জায়গায় অন্য কাউকেও (সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ) বিচারক হিসেবে

নিয়োগ করতে পারতেন। বিচারের ভিত্তি ছিল আইনগ্রন্থ, প্রচলিত প্রথা ও রাজার আদেশ। সাক্ষ্য হিসেবে দলিল, সাক্ষী ও প্রমাণস্বরূপ জিনিসপত্রের সাহায্য নেওয়া হতো। কাত্যায়ন নিজে বর্ণগত শাস্তির সমর্থক ছিলেন। তবে সবক্ষেত্রে তা করা হতো কিনা সন্দেহ। সাধারণত পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে ও বৌদ্ধ-মঠে। যদিও নিয়ম ছিল যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে ৩০ থেকে ৩৭ বছর সময় লাগবে, এই নিয়ম মানা হতো কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণরা নিজেরাও সম্ভবত এত বছর ধরে ছাত্রজীবন যাপন করেনি। বৌদ্ধমঠে শিক্ষাকাল ছিল ১০ বছর, তবে কোনো ছাত্র সন্ন্যাসী হতে চাইলে তার শিক্ষা সমাপ্ত হতে আরো সময় লাগত। পাটনার কাছে নালন্দায় বৌদ্ধশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুদূর চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। নালন্দায় খননকার্যের ফলে বিরাট জায়গা জুড়ে সুনির্মিত মঠ ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। দানের অর্থে নালন্দার মঠ বহু গ্রামের অধিকারী হয়েছিল এবং গ্রামগুলিতে উৎপাদিত শস্যের অর্থে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হতো। নালন্দায় ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার খরচের দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের।

পাঠ্যসূচির মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হতো ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, গদ্য ও পদ্যরচনা, যুক্তিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে। পাঠ্যসূচিতে চিকিৎসা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে লাভজনক হয়নি। কেননা, এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র ক্রমশ তত্ত্বনির্ভর হয়ে পড়ল ; সেজন্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো উন্নতি হতে পারেনি। এযুগের প্রধান চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল আগের যুগের বইগুলিরই সংকলন। নতুন কোনো অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু এর মধ্যেও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এযুগে পশু-চিকিৎসা সম্পর্কে বই লেখা হল প্রথম। প্রধানত সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে ঘোড়া ও হাতির চিকিৎসা সম্পর্কে বই বেরোলো। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা পশ্চিম জগতেও ছড়িয়ে পড়ল এবং পশ্চিম-এশিয়ার চিকিৎসকদের কৌতূহল জাগ্রত করল। ষষ্ঠ শতকে অন্যান্য অনেকের মধ্যে একজন পারস্যদেশীয় চিকিৎসকও ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসেন।

ধাতুবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু এযুগের বিশেষ কোনো ধাতুনির্মিত দ্রব্য পাওয়া যায়নি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দিল্লীর বিখ্যাত ২৩ ফুট উঁচু লোহার স্তম্ভটি ; এটিতে আজও মরচে পড়েনি। এছাড়া তামা-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে (মূর্তিটি এখন বার্মিংহাম মিউজিয়ামে)। এটি দু'-ভাগে ঢালাই করা হয়েছিল। মুদ্রা ও শীলমোহরের মধ্যেও ধাতুবিদ্যার উন্নতির নমুনা পাওয়া যায়। মুদ্রার ছাঁচ খুব স্পষ্ট। তামার পাতের সঙ্গে সংযুক্ত শীল-মোহরগুলির খুঁটিনাটি কাজগুলিও উচুদরের। সমবায় সংঘগুলিতে কারিগররা পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠত বলে যেকোনো প্রয়োগবিদ্যাও সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার অধিকারী ছিল এই সংঘগুলির। এগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। কেবল অঙ্ক-শাস্ত্রই ছিল ব্যতিক্রম। দুই পদ্ধতির শিক্ষার মধ্যে কেবল অঙ্কই ছিল যোগসূত্র।

এইযুগে অঙ্কশাস্ত্রের যথেষ্ট অগ্রগতিও হয়েছিল। সংখ্যাসূচকের ব্যবহার ভারতবর্ষ থেকে শিখে আরবরা সেটি পশ্চিমী জগতে চালু করে এবং সকলের ধারণা ছিল যে, সংখ্যাসূচক আরবদেরই আবিষ্কার। এই সংখ্যাসূচক পরে রোমান সূচকের পরিবর্তে সর্বত্রই ব্যবহৃত হতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা দশমিকের ব্যবহার শুরু করেন।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়—খ্রীস্টজন্মেরও কয়েকশো বছর আগে। ঐ সময়কার দু'টি বই জ্যোতিষ বেদাঙ্গ ও সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিতে এবিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার পর গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার কিছু গ্রহণ করা হল, কিছু বা বর্জন করা হল। জ্যোতির্বিদ্যার নানা মূলসমস্যা তুলে ধরলেন আর্য্যভট্ট ৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে। প্রধানত তাঁর আগ্রহেই জ্যোতির্বিদ্যাকে অঙ্কশাস্ত্র থেকে আলাদা করে নিজস্ব মর্যাদা দেওয়া হল। তিনি সৌর বছরের দৈর্ঘ্য হিসেব করে বললেন—৩৬৫'৩৫৮৬৮০৫ দিন। আর এর মূল্য ধরলেন—৩'১৪১৬। দু'টি হিসেবের সঙ্গেই আধুনিক হিসেবে প্রায় মেলে। ত'ার ধারণা ছিল, পৃথিবী গোলাকার ও তা নিজের অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপরে পড়লে গ্রহণ হয়। তিনি আরো কিছু বৈপ্লবিক মতামত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জ্যোতির্বিদরা ধর্ম ও প্রচলিত বিশ্বাসকে উপেক্ষা করতে না পেরে এইসব মতামত আর গ্রহণ করেননি। ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আর্যভট্টের মতামত ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর মতামতকে পরে উপেক্ষার কারণ হয়তো গোঁড়া শাস্ত্রজ্ঞদের রোষ উৎপাদনের ভয়। আর্যভট্টের সমসাময়িক বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন—জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্ক, কোষ্ঠীপত্রিকা ও জ্যোতিষবিদ্যা। আর্য্যভট্ট এই বিভক্তিকরণে সায় দিতেন বলে মনে হয় না। বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যার পরিবর্তে জ্যোতিষবিদ্যাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। বরাহমিহিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ছিল—'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'। এর মধ্যে তৎকালীন পাঁচটি পদ্ধতির জ্যোতির্বিদ্যার বিবরণ আছে। এর মধ্যে দুটির সঙ্গে গ্রীক-জ্যোতির্বিদ্যার কিছু মিল আছে।

স্বয়ং রাজারাও সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য ছিল সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের জন্যে। এর পাঠক ছিল রাজপরিবার, অভিজাত বংশীয় মানুষ, রাজসভার সভাসদ প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কালিদাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কালিদাস প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক। ত'ার বিখ্যাত নাটক 'শকুন্তলা'র নাম ইয়োরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে কবি গ্যেটের মাধ্যমে। ত'ার 'মেঘদূত' কাব্য ওইযুগে যে খুবই জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপিতে। ওইসব লিপিতে মেঘদূতের ছায়া পাওয়া যায়। নাটকের উদ্দেশ্য ছিল আনন্দদান। এই কারণে বিয়োগান্ত নাটক বিশেষ রচিত হতো না। সবই ছিল রোমান্টিক মিলনান্তক নাটক। এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল শূদ্রক রচিত—'মৃচ্ছকটিক'। গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে হর্ষের জীবনীকার

বাণ উল্লেখযোগ্য। ত'ার রচনা প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃত গদ্যের উদাহরণ। বাণ গদ্যে উপন্যাসও রচনা করেছিলেন এবং সাহিত্য-সমালোচনার বইতে এইসব রচনা থেকে উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি নিয়ে আরো বৃহদাকার কাহিনীর রচনা শুরু হয়। সাহিত্যবিচারের জন্যে দেখা হতো সাহিত্যে 'রস' কিভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সৎসাহিত্যের পরিচয় ছিল রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে। ভালো সাহিত্য হৃদয়ের অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করবে, এই ছিল ধারণা।

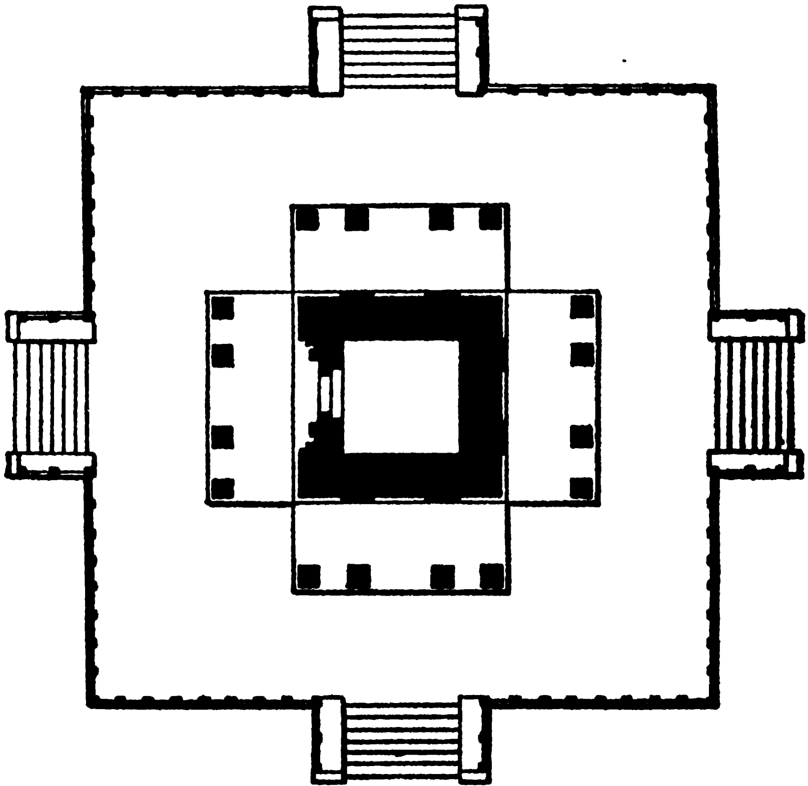
সংস্কৃত সাহিত্য যেমন রাজসভা কেন্দ্রিক ছিল, তেমনি সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর লোকের জন্যে ছিল প্রাকৃতভাষায় (ওইযুগে এই ভাষাতেই কথা বলা হতো) সাহিত্য। জৈনদের রচিত প্রাকৃত সাহিত্য অবশ্য প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষামূলক। উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত নাটকেও উচ্চশ্রেণীর চরিত্ররা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত, আর নিম্নশ্রেণীর চরিত্রদের ভাষা ছিল প্রাকৃত। এর থেকেও দুটি ভাষার সামাজিক মর্যাদার পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

'ক্লাসিক্যাল' যুগের প্রচলিত সংজ্ঞা হল, এমন যুগ যখন সাহিত্য, স্থাপত্য ও চারুকলার বিশেষ উন্নতি ঘটে। এই উন্নতির মান পরবর্তী যুগেও অনুসরণ করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, গুপ্তযুগের স্থাপত্যের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রায়ই শোনা যায়, গুপ্তযুগের ৫০০ বছর পরে মুসলিম আক্রমণে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং গুপ্তযুগের স্থাপত্যও এইভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যার চেয়ে আর একটি ব্যাখ্যাই বোধহয় বেশি সত্য যে, ওইযুগের মন্দিরগুলির স্থাপত্য তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাসগৃহে রূপান্তরিত হয় ও অন্যান্যগুলিকে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়। বৌদ্ধরা মঠনির্মাণে বিরতি দেয়নি এবং সেগুলির অনেকগুলি এখনো রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-ভারতীয় মন্দিরগুলির কোনো উল্লেখযোগ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল না।

হিন্দু-মন্দিরের প্রাচীন আকারে প্রথমত ছিল গর্ভগৃহ। এর মধ্যে ঢোকবার জন্যে একটি গলির মধ্য দিয়ে যেতে হতো। আবার, এই গলি শুরু হতো একটি বড় হলঘর থেকে এবং এই হলঘরের বাইরে থাকত চত্বর। এসবের চারদিক ঘিরে থাকত প্রাঙ্গণ। পরে সেখানেও নতুন নতুন উপাসনাগৃহ তৈরি হতো। গুপ্তযুগের পর থেকে মন্দির-নির্মাণের জন্যে ইট বা কাঠের বদলে পাথরের ব্যবহার শুরু হল। পাথরের ব্যবহার থেকে এলো উঁচু সৌধ নির্মাণের প্রথা। এর পর থেকে ভারতীয় স্থাপত্যে এই রীতিই শুরু হয়ে গেল। মূর্তি উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ছোট আকারের গর্ভগৃহের মধ্যে মূর্তি রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ক্রমশ প্রধান মূর্তির সঙ্গে অন্যান্য মূর্তিও রাখা শুরু হল। যুগের পরিবর্তনে মূর্তিগুলির ভাস্কর্য আরো আলংকারিক হয়ে উঠল। পাথরের মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত বইও লেখা হল এবং বইয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া ছিল এবং নির্মাণের সময় সেই নির্দেশ সঠিক মেনে চলা হতো।

'ক্লাসিক্যাল' ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল সারনাথে পাওয়া বুদ্ধ মূর্তিগুলি।

এগুলির মধ্যে প্রশান্তি ও সন্তোষের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা বোধহয় ওইযুগের ধর্মীয় আবহাওয়ারই পরিচায়ক। বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরির পর গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তিও ওইভাবে তৈরি করা শুরু হল। তবে হিন্দুদের কাছে মূর্তি ছিল প্রতীক মাত্র। এইভাবে ঈশ্বরকে বিমূর্তরূপে বর্ণনা করা হলেও দেবতাদের মানবমূর্তিতে চারটি বা আটটি হাত এবং এক-একটি হাতের মধ্যে নানারকম প্রতীক বা অস্ত্র কল্পনা করে নেওয়া হল। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের অধিকাংশই মথুরাশৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। এইযুগের উত্তর-ভারতের হিন্দু দেবমন্দির অধিকাংশ ছিল বিষ্ণুরই বিভিন্ন রূপ। শিবের উপাসনার মধ্যে লিঙ্গপুজোই ছিল প্রধান ও সেজন্যে ভাস্কর্যের কোনো সুযোগ ছিল না।



বিষ্ণু মন্দির, দেওগড়

তবে এইযুগের সবকটি হিন্দু মন্দিরই খাড়া ধরনের ছিল না। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধরা তখনো পাহাড়ের গা কেটে তাদের মঠ তৈরি করত। হিন্দুরা এবং পরবর্তী-কালে জৈনরাও এই পদ্ধতি অনুকরণ করত। অনেক সময় বৌদ্ধ মঠগুলির কাছা-

কাছিও হিন্দু ও জৈন মন্দির নির্মিত হয়েছে। কয়েকটি গুহা-মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে ছবি এঁকে দেওয়া হতো। যেমন— অজন্তা। চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে এত বেশি উল্লেখ পাওয়া গেছে যে মনে হয়, চিত্রাঙ্কণের যথেষ্ট সমাদর ছিল। অন্য জায়গার চেয়ে উত্তর-ভারতেই পোড়ামাটির কাজ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব-ভারতে ও গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে এর যথেষ্ট নমুনা ছড়িয়ে আছে। এগুলির কিছু কিছু ছাঁচে ফেলে প্রচুর সংখ্যায় তৈরি করা হতো। কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশই খেলনা বা সাজানোর কাজে লাগত।

এইযুগে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের উভয়ের প্রতিই যথেষ্ট জনসমর্থন ছিল। হিন্দু-ধর্মের তৎকালীন বৈশিষ্ট্যগুলি এখনো টিকে আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ওইযুগে যে পরিবর্তন এলো, তার ফলে বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচনা হল। পুঁথিগতভাবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতির আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের এতই প্রভাব পড়েছিল যে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে ধরা যেতে পারত। জৈনধর্মের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি ও পশ্চিম-ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সমর্থনও অটুট রয়েছে। দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি জায়গায় জৈনধর্ম রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পরে তার অবসান হয়। ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে বলভীতে দ্বিতীয় জৈন মহাসভা বসেছিল। এই সভায় জৈন-ধর্মের যেসব অনুশাসন নির্ধারিত হয়েছিল, এখনো তাই আছে। সংস্কৃত ভাষার একটা আলাদা মর্যাদা ছিল বলে সব ধর্মই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার শুরু করে দিল। কিন্তু সব ধর্মের ক্ষেত্রেই ফলও হল একই রকম। ধর্মযাজকরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। জৈনরাও এই সময় মূর্তি নির্মাণ শুরু করল। মহাবীর ও অন্যান্য জৈন সাধুদের পদ্মাসন মূর্তি অথবা ঋজু দণ্ডায়মান মূর্তি জৈন-ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ালো।

খ্রীস্টধর্ম মালাবার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লেখকরা মরিচ-উৎপাদনকারী মালে অঞ্চলে (অর্থাৎ মালাবার) একটি সিরীয় চার্চের উল্লেখ করেন। কালিয়ানা বন্দরে (অর্থাৎ বোম্বাইয়ের কাছে কল্যাণ) পারস্য থেকে একজন বিশপ নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে ভারতের সীমানা পেরিয়ে মধ্য এশিয়া, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে মহাযান পন্থার প্রাধান্য হীনযান পন্থাকে কয়েকটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল ছাড়া অন্য জায়গা থেকে বিলুপ্ত করে দেয়। পঞ্চম শতাব্দীতে নতুন ধরনের উপাসনার প্রচলন ঘটল। এবার দেবীপূজা ও তার সঙ্গে উর্বরতা শক্তির পূজা-পদ্ধতি শুরু হল। এগুলিকে কেন্দ্র করে নানারকম যাদুবিদ্যারও প্রচলন হল। সব মিলিয়ে এগুলি তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের এক নতুন ধারা দেখা দিল। তার নাম বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধ-মন্দিরে পুরুষ মূর্তির পরিবর্তে নতুন বজ্রযান মতাবলম্বীরা স্ত্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করল। ওই মূর্তিগুলিকে বলা হতো তারা (রক্ষাকর্ত্রী)। তারা উপাসনা এখনো তিব্বতে ও নেপালে দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্মের তিনটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এইযুগে দানা বেঁধে ওঠে। উপাসনার কেন্দ্র হল দেবমূর্তি। বলিদানের পরিবর্তে পূজার গুরুত্ব বাড়লেও বলিদানও পূজা-পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে বজায় রইল। এর থেকে ভক্তিবাদের উৎপত্তি হল। পুরোহিতের গুরুত্ব বলিদানের অনুষ্ঠানে যতটা ছিল, ভক্তিমতবাদে তা কমে গেল। ঈশ্বরের উপাসনা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য হতে লাগল। কিন্তু মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ নির্ধারণের অধিকার রইল ব্রাহ্মণদেরই। মানুষের তৈরি সামাজিক নিয়ম ক্রমে ক্রমে পবিত্র নিয়ম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছিল এবং গোঁড়া নিয়মরক্ষকরা কড়া হাতে বিরুদ্ধবাদীদের বহিষ্কার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কিন্তু এর মধ্যেও কেউ কেউ বুঝল যে পুঁথিগত সমস্ত নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে সমস্যা দেখা দেবেই। এরা বললো যে, মানুষের জীবনের চারটি লক্ষ্য আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রথম তিনটির যথার্থ সামঞ্জস্য হলে তবে চতুর্থটির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। সামঞ্জস্য বিধান কেমন কবে সম্ভব, তা স্থির করার দায়িত্ব ছিল সামাজিক নীতি প্রণয়ণকারীদের ওপর। বাস্তবে অবশ্য জাগতিক জীবনের প্রয়োজন ঠিকই মেটানো হতো।

হিন্দুদের মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ ছিল। একদল শিবকে প্রধান দেবতা বলে দাবি করত আর বাকিরা বিষ্ণুকে। উত্তর-ভারতে বিষ্ণুর বেশি উপাসক ছিল ও দক্ষিণভারতে ছিল শিবের উপাসক। এখনো তাই আছে। তান্ত্রিক মতবাদ হিন্দুধর্মের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মে শক্তিপূজার সূচনা হয়। এর মূল-কথা ছিল, প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ব্যতিরেকে পুরুষ কর্মশীল হয়ে উঠতে পারে না। অতএব, দেবতাদের স্ত্রী হিসেবে নতুন করে দেবীপূজা শুরু হল। লক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুর স্ত্রী। শিবের স্ত্রীর বিভিন্ন রূপ হল—পার্বতী, কালী ও দুর্গা। মনে হয়, দীর্ঘদিন প্রবর্তিত মাতৃদেবতার পূজাও এই মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। ওই পূজাপদ্ধতিকে কোনোদিন বন্ধ করা যায়নি বলে পুরোহিতরা শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিকে শক্তিপূজা নামে গ্রহণ করে ধর্মীয় স্বীকৃতি দিয়েছিল। হিন্দু দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে বৃত্তাকার কাল সম্বন্ধে একটি ধারণার বিবর্তন হয়েছিল। বৃত্তের প্রতিটি আবর্তনকে বলা হতো কল্প। এর ব্যাপ্তি হল ৪,৩২০০ লক্ষ বছর। প্রতি কল্পকে ১৪টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি পর্যায়ের শেষে ব্রহ্মাণ্ড পুনর্বার সৃষ্ট হয় ও মনু (আদি মানব) নতুন করে মানবশক্তির জন্ম দেন। এই মুহূর্তে আমরা বর্তমান কল্পের চতুর্দশটি পর্যায়ের সপ্তম পর্যায়ে বাস করছি। সেগুলির মধ্যে আবার ৭১টি মহাবিরামকাল আছে এবং প্রতিটি বিরামকাল চারযুগে বিভক্ত। যুগগুলির বর্ষসংখ্যা হল যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ ঐশ্বরিক বর্ষ। (প্রতিটি ঐশ্বরিক বর্ষ ৩৬০টি মানব বর্ষের সমতুল্য)। বলা হয়, মানবসভ্যতার ক্রমাবনতি হতে থাকবে বছর বছর। আমরা এখন চতুর্থ যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এর নাম— কলিযুগ। এই সময় পৃথিবী অন্যায় ও অশুভ শক্তিতে আচ্ছন্ন। সুতরাং এ পৃথিবীর ধ্বংসের সময়ও এগিয়ে আসছে। অবশ্য ধ্বংসের আগে আরো কয়েক লক্ষ বৎসর অতিক্রম করতে হবে। কলিযুগের অবসানে আসবেন কল্কি। তিনি হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এই ধরনের বিশ্বাসের সঙ্গে এক-সময় ইয়োরোপ ও অন্যত্র প্রচলিত মিলেনিয়াম সম্বন্ধে ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

এই যুগের চিন্তাজগতের আরেক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের দার্শনিক বিতর্ক। ক্রমশ বিতর্ক থেকে হিন্দুধর্মে ছয় ধরনের দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হল। যদিও ষড়াঙ্গ দর্শনের বীজবপন হয়েছিল গুপ্তযুগেরও আগে, মতবাদের মূল-সূত্রগুলি এই যুগেই পরিস্ফুট হয়েছিল। এই ছয়টি দর্শন হল :

ক. ন্যায়— এর ভিত্তি হল যুক্তিতর্ক। যেসব বৌদ্ধ দার্শনিকরা তাঁদের উন্নত জ্ঞান ও তর্কবিদ্যার কুশলতা নিয়ে গর্বিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই এই ন্যায়দর্শনের যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিতর্ক চলত।

খ. বৈশেষিক— এটি একধরনের পারমাণবিক দর্শন। এতে বলা হয়, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল অনেকগুলি পরমাণু থেকে। কিন্তু পরমাণু ও আত্মা অভিন্ন নয়। তাই আত্মা ও জড়বস্তুর আলাদা দুটি জগত আছে।

গ. সাংখ্য— এটি মূলত নিরীশ্বরবাদী দর্শন। বলা হয়, ২৫টি মূল উপাদানের সাহায্যে জগত সৃষ্টি হয়েছিল। আত্মা ও জড়বস্তুর পার্থক্যের কথা এখানেও বলা হয়েছে। সাংখ্য-দার্শনিকদের মতে, নৈতিক উৎকর্ষ, আবেগ ও স্থূলবুদ্ধি — এই তিনটি গুণের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটলেই স্বাভাবিকত্ব অর্জন করা যায়। সমসাময়িক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচলিত ধারণা এই মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

ঘ. যোগ— এতে বলা হয়েছে যে, নিজের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ওপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকলে পরমসত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়ে উঠবে। মানব দেহের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানও প্রয়োজন। এই কারণে যোগদর্শন চর্চা করার জন্যে শারীরবিদ্যার সঙ্গে সম্যক যোগাযোগ প্রয়োজন ছিল।

ঙ. মীমাংসা— এই দর্শনের প্রচারকারীদের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল-শক্তি বেদকে অবহেলা করা হচ্ছে। তাই তাঁরা বেদের মতবাদ ও রীতিনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে বেদ পরবর্তী চিন্তাধারাকে তর্কদ্বারা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। এই দর্শনের প্রধান সমর্থক ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণরা।

চ. বেদান্ত— এই দর্শনই শেষপর্যন্ত অন্য দর্শনগুলির তুলনায় প্রাধান্যলাভ করে বেশি এবং পরবর্তী যুগে বহুল প্রচারিত হয়। অ-ব্রাহ্মণ চিন্তাধারাকে বেদান্ত-দর্শন দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল। এই দর্শন প্রকৃতপক্ষে বেদ থেকেই উদ্ভূত বলে দাবি করা হয়। এই দর্শনে সমস্ত বস্তুর মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্বের কথা বলা হয়। জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য হল, জড়দেহের অবসানের পর পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তি-আত্মার মিলন।

উল্লেখযোগ্য যে, ওই সময়ে কেবল শেষোক্ত দুটি দর্শনই সম্পূর্ণভাবে অধিবিদ্যা বিষয়ক ছিল। অন্য চারটি জোর দিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ওপর। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অন্যসব দর্শনকে পেছনে ফেলে বেদান্তদর্শনই প্রধান হয়ে উঠল। বৈদিকযুগের সঙ্গে তখন সময়ের অনেক ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। সেজন্যে সুপ্রাচীন অতীতে রচিত বেদের দোহাই দিয়ে সবকিছুকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আখ্যা দেওয়া হতো। বেদ দেবতাদের সৃষ্টি, এমন কথাও বলা হতে লাগল। সমস্ত জ্ঞানের উৎস ছিল

বেদ। পরবর্তীকালেও বেদান্ত ছিল ভারতীয় দর্শনের চিরন্তন মূলকথা। ইসলাম সৃষ্ট ধর্ম বা ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রভাব বেদান্তের ওপর পড়লেও মূলকথাগুলি ওই-যুগ থেকে এযুগেও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এখনকার অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকও নিজেদের বৈদান্তিক বলে মনে করেন, অথবা বেদান্তের প্রভাব স্বীকার করেন।

পুরাণগুলির যে রূপ আমরা আজ দেখি তাও রচিত হয়েছিল ওই যুগেই। পৃথিবীর জন্ম থেকে বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ব্রাহ্মণরা পুরাণগুলিতে লিখে রেখে গেছেন। প্রথমে পুরাণের রচয়িতা ছিলেন কবিরা। কিন্তু পরে পুরোহিতরা পুরাণগুলির মধ্যে হিন্দু আচার-ব্যবহার পুজোপদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য যোগ করে সংস্কৃত ভাষায় নতুন করে পুরাণগুলি লিখলেন। ফলে এগুলি অলংঘনীয় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হল। অদ্ভুত ব্যাপার হল, রাজবংশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী করার ভঙ্গিতে। পরে আবার সব রাজবংশকেই দৈবজাত আখ্যা দেওয়া হল। এইভাবে ইতিহাসের বর্ণনা ক্রমশ দৈববার্তা ঘোষণার রূপ নিল। এর ফলে অতীতের বর্ণনা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুনর্লিখিত হল।

বহির্ভারতে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে বাণিজ্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বৌদ্ধধর্ম এভাবেই এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার স্থানীয় শাসক ও ব্যবসায়ীরা সমস্ত মরুদ্যান ও বাণিজ্যকেন্দ্রে বৌদ্ধমঠ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় লিপি সেখানে ব্যবহৃত হতো ও বৌদ্ধধর্মের নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন করা হতো। যেসব ভারতীয় মধ্য-এশিয়ায় বসবাস শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক বৌদ্ধ দার্শনিক কুমারজীব। এঁর বাস ছিল কুচিতে। সেখানে তঁার বাবা চতুর্থ শতাব্দীতে এক কুচি রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। বামিয়ান-এ পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের নিকট সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল।

বহু ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে চীনদেশে চলে গিয়েছিলেন। চীনে ৩৭৯ খ্রীস্টাব্দে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করায় আরো বহুলোক এই ধর্ম গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু পরবর্তীকালে চীনা বৌদ্ধদের ওপর খুব অত্যাচারও হয়েছিল। চীনা বৌদ্ধরা সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত মূল বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিকে চীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ফা-হিয়েন, সুঙ্ ইউন, হিউয়েন-সাঙ্ ও ঈ-সিঙ্ ভারতে এসেছিলেন। ফলে চীনা সংস্কৃতির ওপর ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল। এরমধ্যে ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণের কথা উল্লেখযোগ্য। মধ্য-এশিয়ার গুহা মন্দিরগুলির অনুকরণে চীনেও ওইরকম মন্দিরনির্মাণ শুরু হয়। ভারতীয় শিল্পীদের ডাক পড়ল মন্দিরগুলির দেয়ালে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ছবি এঁকে দেবার জন্যে। পরে চীনাশিল্পীরা ওই কাজের ভার নিলেও ভারতীয় রীতি-পদ্ধতির ছাপ থেকে গেল বহুদিন পর্যন্ত। এছাড়া সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রভাব এলো। দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য শুরু হওয়ার ফলেও দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বেড়ে গেল। তাঙ্ যুগে (৬১৮—৯০৭ খ্রীস্টাব্দে) ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্যান্টন

শহরে বাস করত এবং ওই যুগের মুদ্রা দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া গেছে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর চীনা রাজদূত যে এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে হস্ত-ক্ষেপ করতে পেরেছিলেন— সে ঘটনাও দু'দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই প্রমাণ। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে বৌদ্ধধর্ম চীন হয়েই জাপানে এসে পৌঁছলো। অষ্টম শতাব্দীতে এক ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জাপানে এসে দেখলেন যে ওখানে বেশকিছু বৌদ্ধধর্মা-বলম্বী রয়েছেন এবং তাঁরা ভারতীয় বর্ণমালার সঙ্গেও পরিচিত।

রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে পড়েছিল। রোমানদের চাহিদার নানা জিনিস সংগ্রহ করতে হতো এই অঞ্চল থেকে। যেমন— সোনা, মশলা, সুগন্ধি, রজন ও কাঠ। রোমানরা পার্থিয়া দখল করে নেবার পর থেকে সাইবেরিয়ার সোনা আর ভারতবর্ষে আসত না। তাই ভারতীয়রা অন্যত্র সোনার খোঁজ করল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যবসার সাফল্য দেখে রোমের সঙ্গে বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ার পরও ভারতীয়রা এই অঞ্চলে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে লাগল। বাণিজ্যসূত্রে কেউ কেউ বসবাস শুরু করল। তারপর উপনিবেশ গড়ে উঠল। থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া ও জাভা অঞ্চলের জীবনযাত্রার মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রবিষ্ট হয়। এজন্যে ভারতকে সৈন্যসামন্ত পাঠাতে হয়নি। এই সাংস্কৃতিক বিজয় ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।

এইযুগের চীনা নথিপত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে মেকঙ্ বদ্বীপ অঞ্চলের ফুনান-এর বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। ভারতের পূর্ব-উপকূলের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মালয় উপদ্বীপেও ছোট ছোট ভারতীয় বসতি গড়ে উঠেছিল। তাম্রলিপ্ত ও অমরাবতী থেকে বর্মা, মার্তাবান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ আসত। দক্ষিণ-ভারতীয় বন্দর থেকে জাহাজ যেত তেনাসিরিম, মালাক্কা ও জাভায়। পশ্চিম-উপকূলের বন্দর থেকেও কিছু কিছু বাণিজ্য জাহাজ এখানে আসত।

ভারতীয় প্রভাব অবশ্য সর্বত্র একরকম ছিল না। প্রথমদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেছিল। ক্রমশ রাজদরবারে ব্রাহ্মণ্য পূজানুষ্ঠানে রীতি ও সংস্কৃতভাষা অনুসৃত হওয়ার ফলে হিন্দুধর্মের প্রভাব-বৃদ্ধি ঘটে। এই অঞ্চল থেকে অনেকগুলি বিশিষ্ট সংস্কৃত লেখ পাওয়া গেছে। নতুন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক নামও গৃহীত হয়েছিল। যেমন, থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথিয়ার নামকরণ হয়েছিল রামায়ণের নায়ক রামের রাজধানী অযোধ্যার নাম অনুসারে। এই অঞ্চলের মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মূর্তি-রীতি অনুসৃত হল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্থানীয় সংস্কৃতির মূল চেহারা পাল্টায়নি।

একটি উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর সভ্যতার সংস্পর্শে এলে যা হয় এখানেও তাই হয়েছিল। ওই দেশগুলির শিক্ষিত ও উন্নত লোকেরা ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হল। কিন্তু এজন্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলিকে 'বৃহত্তর ভারত' আখ্যা দিলে ভুল হবে। ওই দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় তাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল। যেমন, জাভায় যে রামায়ণ

প্রচলিত ছিল তাতে মূল রামায়ণের কাঠামোটুকুই ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল জাভার পৌরাণিক উপকথা। কাম্বোডিয়ার খমের শাসকদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন রাজার কল্পনা ভারতীয় প্রভাবের আগে থেকেই ছিল, কিন্তু পরে ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে হিন্দুধর্মের প্রভাব কমে গেলেও বৌদ্ধধর্ম টিঁকে রইল।* বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতবাদ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব প্রচলিত ছিল। একই সময়ে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতেও প্রবেশ করেছিল। কিন্তু দুইক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, কাম্বোডিয়ার বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাজসভায় ভারতীয় বা চীনা রীতিনীতির (চীন-সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে) অনুকরণ চলত। কিন্তু দেশের আর সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষ নূতন আগত প্রথা মেনে নিলেও প্রধানত নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখত।

গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতে আর্য-সংস্কৃতি স্বীকৃত হয়েছিল—যার একটা ফল হল ব্রাহ্মণরা সামাজিক পদমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। পুরনো শাস্ত্র গ্রন্থগুলি এইযুগে ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুর্ণালিখিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের পর ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যে কেবল নিজেদের আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মনে করত তাই নয়, শিল্পপদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পায়।

আর্যদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজই ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রচলিত হল। পরবর্তীকালে সমাজে নারীর মর্যাদা অবমূল্যায়নের মধ্যে আর্য-পূর্ববর্তী সংস্কৃতির অবসানই চিহ্নিত হল। এই দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে কিন্তু সারাদেশ বা জীবনের সবক্ষেত্রে আর্য-সংস্কৃতির জয় হয়নি। সমাজের উচ্চ পর্যায়ভুক্ত মানুষের ওপর আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বেশি হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব তত ব্যাপক ছিল না। একদিকে যেমন আর্যপ্রবাহে সমাজে গরীব অবমূল্যায়ন শুরু হল, অন্যদিকে মাতৃদেবতা ও উর্বরা শক্তির উপাসনা বেড়ে গেল। সমাজের সর্বস্তরে যে আর্য-সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেনি তার আরেকটি প্রমাণ হল, হিন্দু পূজাপদ্ধতি প্রায়শই স্থানীয় পূজাপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের পরই এ ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া, দক্ষিণ-ভারত ও উত্তর-ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে প্রচলিত শিবলিঙ্গের পূজাও আর্য-সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, যদিও উত্তর-ভারতের সমভূমিতে আর্য-সভ্যতার রীতিনীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দক্ষিণাঞ্চলের অবদান ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। এ অবদান উত্তর-ভারতের অবদানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক নয়।

* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য কালে কালে অস্পষ্ট হয়ে আসে। এখনো ব্যাঙ্ককে থাইল্যাণ্ডের রাজপরিবার সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করেন। অথচ থাইল্যাণ্ডের রাষ্ট্রধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম।

৮

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে সংঘর্ষ

আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টাব্দ - ৯০০ খ্রীস্টাব্দ

উত্তর-ভারতে গুপ্ত রাজবংশ ও তাদের উত্তরসূরীদের ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসানের সঙ্গে ঘটনার কেন্দ্র সরে গেল দক্ষিণদিকে—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে এবং আরো দক্ষিণে তামিলনাদে। এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটেছিল বিন্ধ্য-পর্বতমালার দক্ষিণদিকে এবং সেগুলি কেবল বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনাই ছিল না। এই যুগের প্রধান সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক প্রভাবজাত সমন্বয়ও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিলন। দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন প্রথা ইত্যাদি এই সময়েই আরো গভীরভাবে শিকর গাড়ে এবং বহু বছর ধরেই সেগুলি অপরিবর্তিত রয়ে যায়। পল্লব রাজাদের যুগে আর্যসংস্কৃতির আত্তীকরণের (assimilation) শেষ পর্যায় চলেছিল। তবে, আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বেশি করে পড়েছিল সমাজের উচুশ্রেণীর মানুষের ওপর। সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতিতেই নতুন করে অাঁকড়ে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে বলা চলে পল্লবযুগে তামিল বৈশিষ্ট্যের পুনর্বিকাশ ঘটল। ভারতীয় সভ্যতায় তার দান কম নয়। আর্যসভ্যতা গ্রহণ ও বর্জনের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন, প্রথমদিকে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি লেখা হলেও পরে তামিল ভাষার ব্যবহার শুরু হল এবং প্রত্নলেখগুলি প্রধানত সংস্কৃত ও তামিলে লেখা। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সেতুর কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভূমিকার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ছিল না। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে স্থাপত্যে। স্থাপত্যে দাক্ষিণাত্য শৈলী উত্তর-ভারত এবং দ্রাবিড় শৈলী উভয়কেই নতুন রূপ দেয়।

দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক রাজনীতির প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থেকেছে। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের উপকূল অঞ্চলের পর্বতবেষ্টিত বৃহৎ মালভূমি অঞ্চল আর তামিলনাদের উর্বরা সমভূমি, এই দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে এই রাজনৈতিক ধারার জন্ম। পশ্চিমের পর্বতমালা থেকে নদীগুলি বার হয়ে প্রবাহিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। একদিকে মালভূমি অঞ্চলের রাজ্য ও অন্যদিকে উপকূল অঞ্চলের রাজ্য, উভয়েই সমগ্র নদীপথটি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত। বিশেষত কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী দুটি। আধুনিক অন্ধ্রপ্রদেশের বেঙ্গি অঞ্চল ছিল দুই নদীর মাঝখানে। এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। এই বিরোধ যত না রাজ্যগত, তার চেয়ে বেশি ভৌগোলিক। এই কারণে

নানা রাজবংশের উত্থান-পতন সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে সংঘর্ষ চলেছিল।

হিউয়েন সাঙ বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, যত দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই চাষের জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উর্বর বৃহৎ সমভূমির অভাবে কোনো কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। স্থানীয় সংগঠনকে ভিত্তি করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠার প্রবণতা দক্ষিণ-ভারতে আদি থেকেই নিয়মিতভাবে দেখা দিয়েছিল। উত্তরের রাজ্যগুলির তুলনায় সেজন্যে দক্ষিণ-ভারতে আগেই আঞ্চলিক আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজ্য গড়ে উঠেছিল, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ৩০০ বছর ধরে তিনটি বড় রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। রাজ্যগুলি ছিল বাদামীর চালুক্য রাজবংশ, কাঞ্চীপুরমের পল্লব রাজবংশ ও মদুরার পাণ্ড্য রাজবংশ। সাতবাহনদের রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর বাকাটক রাজবংশ রাজ্যস্থাপন করেছিল। আবার, তাদের রাজ্যের ভগ্নাবশেষের ওপর রাজ্যস্থাপন করল চালুক্যরা। বাকাটক রাজাদের সঙ্গে গুপ্তদের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং গুপ্তদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পতন হল। চালুক্যরা প্রথমে উত্তর-কর্ণা-টকের বাতাপী বা বাদামী অঞ্চল ও নিকটবর্তী অইহোল অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করে। তারপর উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে বাকাটক রাজাদের রাজ্য অধিকার করে নেয়। নাসিক ও গোদাবরীর ওপরদিকের অংশে বাকাটক রাজাদের রাজ্য ছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে সাতবাহন রাজ্যের পূর্বদিকের অংশ জয় করে নিয়েছিল ইক্ষ্বাকু রাজবংশ তৃতীয় শতকে। পল্লবরা আবার এদের পরাজিত করল। পল্লবরা এছাড়া কদম্ব রাজাদেরও হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজ্য অধিকার করে নেয়। তাদের রাজ্য ছিল চালুক্য রাজ্যের দক্ষিণদিকে।

পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, পল্লব শব্দটি পহ্লব (পার্থিয়ান) শব্দের রূপভেদ এবং পল্লবরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিয়ার অধিবাসী। দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক ও সাতবাহনদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে পার্থিয়ানরা পশ্চিম-ভারত থেকে দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব-উপকূলে চলে আসে। আবার কারো কারো মতে, এরা বেঙ্গি অঞ্চলের এক উপজাতি। পল্লব নামটিকে ঘিরে আবার একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। কথিত আছে, এক তরুণ রাজপুত্র একবার পাতালের এক নাগ রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। তারপর রাজকন্যাকে ছেড়ে আসার সময়ে রাজপুত্র তাকে বলে যে, তাদের শিশুটিকে যদি শরীরের সঙ্গে একটি লতা বা পল্লব বেঁধে ভাসিয়ে দেয়, রাজপুত্র তাকে পরে ওই চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে ও রাজ্যের কিছু অংশ শিশুটিকে দিয়ে দেবে। রাজকন্যা এই পন্থা অবলম্বন করার ফলে শিশুটিকে চেনা যায় এবং তাকে রাজ্য দেওয়া হয়। ওই শিশুটিই পল্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই কাহিনী অনুযায়ী, পল্লবরা বিদেশী এবং বিবাহ সম্পর্কের মাধ্যমে তারা রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছিল। নাগদের স্থানীয় শাসকদের প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে এই একই কাহিনী কাম্বোডিয়ার খমের রাজাদের উৎপত্তি সম্পর্কেও শোনা যায়। সম্ভবত খমের রাজারা পল্লবদের কাছ থেকে এ কাহিনী ধার নিয়েছিলেন। খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত না জানা থাকায়

এই বংশের রাজাদের পক্ষে বানানো বংশতালিকার সাহায্যে উচ্চবর্ণভুক্ত বলে দাবি করা সহজ হয়েছিল।

পল্লবদের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় প্রাকৃতভাষায় লিখিত প্রস্থলেখ থেকে। পরবর্তী লিপিগুলি সংস্কৃত ও তামিলভাষায় রচিত। কাঞ্চীপুরমে পল্লবরা যখন কেবলমাত্র ছোট একটি রাজ্যশাসন করছিল, তখনই প্রাকৃত লিপিগুলি রচিত। পরবর্তী লিপিগুলি রচনার সময় পল্লবরা সমগ্র তামিলনাদের শাসক। এরাই প্রথম উল্লেখযোগ্য তামিল-রাজবংশ। প্রথমদিকের লিপি অনুসারে পল্লবরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অন্যান্য বৈদিক অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন দক্ষিণ-ভারতে এইসব অনুষ্ঠানের প্রকৃত কোনো তাৎপর্য ছিল কিনা তা নির্ণয় করা শক্ত, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এদের গুরুত্ব কতটা ছিল তা বোঝাও সহজ নয়। সম্ভবত অনুষ্ঠানগুলি আর্য-সংস্কৃতির কিছু কিছু দিককে গ্রহণ করারই প্রতীক। আর একজন রাজা প্রজাদের প্রচুর সোনা ও ১ হাজার বলদটানা হাল দান করেছিলেন। এ থেকে ধারণা হয়, ওই যুগের পল্লবরাজারা নতুন জমিতে চাষবাস শুরু করার উৎসাহী ছিলেন এবং পশুপালনের চেয়ে নগদ অর্থ ও কৃষিপণ্যের দিক থেকে কৃষি উৎপাদনই যে লাভজনক, তাও বুঝতে শিখলেন।

পরের দিকের পল্লব রাজাদের মধ্যে প্রথম মহেন্দ্র বর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলেন। তাঁর সময় থেকে পল্লব রাজবংশ প্রাচীন তামিল সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। ইনি ছিলেন থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং হর্ষের মতোই ইনিও কাব্য ও নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এঁর রচিত নাটকটি হল— 'মত্তবিলাস প্রহসন'। এঁর রাজত্বকালেই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পাহাড়খোদা পল্লব-মন্দির নির্মিত হয়। তার মধ্যে মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলিও আছে। প্রথম জীবনে মহেন্দ্রবর্মণ ছিলেন জৈন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী আপ্পারের প্রভাবে তিনি শিবের উপাসক হয়ে ওঠেন। এই ঘটনায় তামিলনাদে জৈনধর্মের ওপর ভবিষ্যতে বড় আঘাত আসে। কাব্য, সংগীত ও মন্দিরনির্মাণ ছাড়াও এঁর রাজত্বকালে কয়েকটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল। সুদূর উত্তরাঞ্চলে হর্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কিন্তু তাঁর রাজ্যের পাশেই তৎকালে প্রতিষ্ঠিত চালুক্য রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবদের অগ্রগতি খর্ব করতে আগ্রহী ছিলেন। চালুক্যও পল্লবদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল। দুই রাজবংশের পতনের ওপর পরবর্তী রাজবংশগুলি পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

পুলকেশী তাঁর যুদ্ধযাত্রা শুরু করলেন কদম্ব ও গঙ্গা রাজ্যগুলি আক্রমণ করে। এদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্যের পর অন্ধ্র অঞ্চল আক্রমণ করে সেখানেও বিজয়ী হলেন। এর পর নর্মদার তীরে হর্ষবর্ধনের আক্রমণ প্রতিহত করে হর্ষের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলেন। তারপর লাট, মালব ও গুজরাটকে নিজের অধীনে আনলেন। বাদামীতে ফিরে এসে পল্লবরাজা মহেন্দ্রবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে জয়ী হলেন। এই জয়ের ফলে পল্লবরাজ্যের উত্তরাংশে চালুক্যদের দখলে চলে এলো।

কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের উত্তরাধিকারী প্রথম নরসিংহবর্মণ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ

নিয়ে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারে আগ্রহী ছিলেন। সিংহলের রাজার সহায়তায় তিনি সফলও হলেন। তিনি ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে চালুক্যরাজ্যের রাজধানী বাদামী অধিকার করে নতুন উপাধি নিলেন 'বাতাপীকোণ্ডা' (বাতাপী-বিজেতা)। যুদ্ধে এর পরের চালটি চালুক্যদের জন্যে তোলা রইল। ইতিমধ্যে পল্লবরা সিংহলরাজের হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে গিয়ে নৌযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

১২ বছর ধরে চালুক্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা চলার ফলে যুদ্ধে বিরতি ছিল। পল্লবরা তখন সিংহল নিয়ে ব্যস্ত। চালুক্যরা তখন রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখতে ও তাদের অধীনস্থ রাজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পর্যুদস্ত হচ্ছে। তারপর ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে পুলকেশীর এক পুত্র রাজ্যের মধ্যে মোটামুটি একটা ঐক্যভাব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন। পল্লবদের কাছ থেকে হৃত অঞ্চল ফিরে পাবার পর চালুক্যদের শক্তি বৃদ্ধিও ঘটল। নর্মদা নদীর উত্তরে চালুক্য রাজ্যের যে অঞ্চল ছিল, তার শাসনকর্তা ছিলেন মূল পরিবারের এক রাজকুমার। তাঁর বংশধররা পরে লাট চালুক্য নামে পরিচিত হন। তাঁদের শাসিত অঞ্চলের নামানুসারেই এই নামকরণ। পল্লবরা ইতিমধ্যে আবার যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। দীর্ঘযুদ্ধের পর পল্লবরা আবার বাদামী অধিকার করে নিল। কাঞ্চীর কাছে পাওয়া এর লিপির সজীব বর্ণনা থেকে জানা যায়, দু'পক্ষেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছিল প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে এই দুই শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষে প্রতিবারই প্রচুর প্রাণহানি হয়েছে এবং জয়লাভ ঘটেছে সামান্য ব্যবধানে। অধিকৃত অঞ্চল কেউই বেশিদিন দখল করে রাখতে পারত না। এ থেকে দু'পক্ষের সামরিক শক্তির সমতার কথা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য পল্লব রাজাদের তুলনায় দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের ৪০ বছর রাজত্বকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই সুদিন শেষ হয় যখন ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে চালুক্য ও গঙ্গরাজারা একসঙ্গে পল্লবরাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে পল্লবরাজ নিহত হলেন। কোনো প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় মন্ত্রীপরিষদ পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজবংশের আরেকটি সমান্তরাল শাখাতে উদ্ভূত এক ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে মনোনীত করলেন। তিনি দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ নামে রাজত্ব করেন। চালুক্যরা পরাজয়ের শোধ নিল কাঞ্চী অধিকার করে নিয়ে। এরপর পল্লবদের প্রতিশোধ নেবার পালা। কিন্তু তার আগেই মাদুরায় পাণ্ড্যরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। চালুক্যদের সঙ্গে এদের বেশি শত্রুতা থাকলেও এরা পল্লবদের প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরা তামিলনাদের দক্ষিণাংশের অঞ্চলে যে আধিপত্য স্থাপন করেছিল তা বজায় ছিল অনেক শতাব্দী ধরে। অবশ্য এই অঞ্চলের ওপর তাদের কর্তৃত্ব কতটা তা নির্ভর করত তামিলনাদের রাজাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ওপর। তামিল রাজবংশগুলিকে বারংবার বিব্রত করলেও তারা কখনো পাণ্ড্যদের ধ্বংস করতে পারেনি।

দক্ষিণের শক্তিগুলির মধ্যে এই ক্রমাগত সংঘর্ষের ব্যতিক্রম হল পল্লব ও চের রাজ্যদুটির মৈত্রীর সম্পর্ক। চের রাজ্য ছিল আধুনিক কেরলের মালাবার উপকূলে। ওই রাজ্যে তখন রাজত্ব করত পেরুমল রাজবংশ। চের ও পল্লব রাজ্যের নিকট-সম্পর্কের নানা উদাহরণ আছে। মহেন্দ্রবর্মণের 'মত্তবিলাস' নাটকটি মালাবারের

অভিনেতারা বহুবার অভিনয় করেছিল। পল্লবদের রাজ্যে যেসব সংস্কৃত বিবরণী লেখা হয়েছিল তার মধ্যে কেরল সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে মালাবার উপকূলে পশ্চিমী জগৎ থেকে আরব ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করেছিল। রোমান ব্যবসায়ীরা এদেশে বসবাস করেনি, কিন্তু আরবরা দক্ষিণ-ভারতের উপকূল অঞ্চলে প্রথম থেকেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে দিল। আরবদের ব্যবসাকেন্দ্রের জন্যে জমিও দেওয়া হয়েছিল। আগের শতাব্দীর খ্রীস্টানদের মতো আরবদেরও নিজস্ব ধর্মাচরণে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। এখনকার মালাবার মুসলিম বা মোপলারা এই আরবদেরই বংশধর। এই মুসলিমরা মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে ইসলাম ধর্মপ্রচার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তাই, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যেতেও এদের অসুবিধে হয়নি।

আগের শতাব্দীতে আরব সেনাবাহিনী পারস্য জয় করে এবং জোর করে বহু জরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেক পারসি সমুদ্রপথে ও উপকূলপথ ধরে পশ্চিম-ভারতে পালিয়ে আসে। সেখানে তাদের আশ্রয় দেন চালুক্য রাজারা। এরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং এরাই বর্তমান পারসি সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ।

ইতিমধ্যে চালুক্যরাজ্যের পশ্চিমাংশে আরব আক্রমণের আশংকা দেখা দিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে চালুক্য রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। লাট চালুক্যরা আরবদের অগ্রগতি রোধ করে ও সেই অবসরে দক্ষিণ-ভারতের রাজারা অস্ত্র সংগ্রহের সুযোগ পেলেন। আরবদের ভয় আপাতত কেটে গেলেও চালুক্যদের অন্য বিপদ দেখা দিল। তাদের রাজ্যের অন্তর্গত সামন্তরাজা দন্তিদুর্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাঁর বংশধররা ধীরে ধীরে চালুক্যদের উৎখাত করে নতুন রাজবংশ স্থাপন করলেন— রাষ্ট্রকূট রাজবংশ। পল্লবরা আরো ১০০ বছর রাজত্ব করলেও নবম শতাব্দীতে তাদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। শেষ পল্লব-রাজা এক সামন্তরাজার পুত্রের হাতে নিহত হন।

রাষ্টকূট রাজ্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলির দুর্বলতার সুযোগে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পল্লবদের তখন শেষ অবস্থা, তাদের উত্তরাধিকারী চোল রাজারা তখনো সংঘর্ষের মধ্যে আসেননি। উত্তর-ভারতে এমন কোনো শক্তিশালী রাজ্য ছিল না— যার পক্ষে উত্তর-দাক্ষিণাত্যে মাথা গলানো সম্ভব ছিল। রাষ্ট্রকূটদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রায়শই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা চলত। রাষ্ট্রকূটরা কনৌজের রাজনীতিতে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতো এবং তা করতে গিয়ে অনেকবার তাদের যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছিল। কেবল একবারই, দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তারা অল্পদিনের জন্যে কনৌজ অধিকার করে নিয়েছিল।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রকূট রাজা বোধহয় ছিলেন অমোঘবর্ষ। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকাল (৮১৪-৮০ খ্রীস্টাব্দ) সামরিক সাফল্যের জন্যে স্মরণীয় নয়। কিন্তু এই সময়েই জৈনধর্ম ও স্থানীয় সাহিত্য রাজকীয় আনুকূল্য লাভ করে। অমোঘবর্ষের সমস্যা ছিল কয়েকজন সামন্তরাজাকে নিয়ে যাঁরা প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন।

চালুক্যরা তখন সামন্তরাজায় পর্যবসিত হয়ে আবার নতুন করে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত তারাই আবার রাষ্ট্রকূট বংশকে উৎখাত করে সিংহাসন পুনরধিকার করে নিল। এছাড়া, তামিলনাদের শক্তিশালী চোল রাজাদের কাছ থেকেও রাষ্ট্রকূটদের ভয় ছিল। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটদের প্রতিপত্তি ছিল তুঙ্গে। একজন রাজা 'কাঞ্চী-বিজেতা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই দাবি বেশিদিন টেঁকেনি। দশম শতাব্দীর শেষদিকে কাঞ্চী ও চালুক্যরাজারা মিলিতভাবে রাষ্ট্রকূট বংশের পতন ঘটালেন। চালুক্য রাজবংশের দ্বিতীয় ধারা রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যশাসন করতে শুরু করল।

বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে ঘন ঘন উত্থান-পতনের কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেকেই রাজনীতিক ও সামরিক দিকে দিয়ে প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন ছিল। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত ছিল না। গ্রাম ও জেলার শাসনকাজে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপ ঘটত না। এই স্বায়ত্তশাসন বেশি করে প্রচলিত ছিল তামিলনাদে। পশ্চিম-ভারতের তুলনায় বহু শতাব্দী ধরে এখানে এই ব্যবস্থা চলেছিল। এই প্রসঙ্গে 'অধীন রাজা' কথাটি শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তার অর্থনৈতিক দিকটা সব সামন্তরাজার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও 'সামন্ত' শব্দের স্বাভাবিক সংজ্ঞা প্রচলিত হয়েছিল আরো পরে।

রাজশক্তির উৎস দৈব এবং তা বংশ পরম্পরায় ভোগ্য, পল্লবদের এই মত ছিল। তারা দাবি করত, ভগবান ব্রহ্মা থেকে তাদের উৎপত্তি। একবার অবশ্য প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে ঘটনাটিকে অভূতপূর্ব বলে মনে করা হয়নি। রাজারা বড় বড় উপাধি গ্রহণ করতেন। এর মধ্যে কিছু কিছু, যেমন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিটি উত্তর-ভারত থেকে নেওয়া। এছাড়া স্থানীয় নিয়মানুসারে উপাধি ছিল 'ধর্মমহারাজাধিরাজ' (যিনি রাজাদের মহান অধিরাজ এবং যিনি ধর্মবিধান অনুযায়ী শাসন করেন) কিংবা 'অগ্নিষ্টোম-বাজপেয়-অশ্বমেধ যাজী (অর্থাৎ যিনি ওই তিনটি যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন)। শেষোক্ত উপাধিটি মনে হয় যেন বৈদিক ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করে নেওয়ার সচেতন ঘোষণা। শাসনকাজে রাজাকে সাহায্য করতেন মন্ত্রীপরিষদ। পল্লবযুগের শেষভাগে মন্ত্রীপরিষদ রাজ্যের নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কয়েকজন মন্ত্রীর প্রায় রাজকীয় উপাধি ছিল ও এঁরা হয়তো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামন্তরাজা।

তামিলনাদে প্রদেশগুলির শাসনভার ছিল আবার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীর ওপর। প্রদেশ-শাসক উপদেশ ও সাহায্য পেতেন জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে। জেলা কর্মচারীরা মুখ্যত উপদেশক হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতেন। উত্তর-ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-ভারতেই এই ধরনের ব্যবস্থা এই যুগে বেশি প্রচলিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংগঠিত হতো বর্ণ, পেশা, ধর্ম ইত্যাদির স্থানীয় সম্পর্ককে ভিত্তি করে। শাসন পরিচালনার জন্যে নানাধরনের সভা ডাকা হতো। এই সভায় সমবায় সংঘের

সভ্য, কারিগর, ছাত্র, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের ডাকা হতো। এছাড়া গ্রামেও এই-রকম সভা হতো। বড় সভা হতো বছরে একবার, কিন্তু নীতি কার্যকর করার জন্যে ছোটখাটো সভা প্রায়ই ডাকা হতো। উপযুক্ত লোকদের নিয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠী গঠন করা হতো এবং তারা সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব নিত। এ ছিল আধুনিক কমিটির মতো।

গ্রামে শাসন পরিচালনার ভার ছিল সভার ওপর। সেচ, কৃষি, অপরাধীকে শাস্তিদান, জনগণনা ও নথিপত্র রাখার দায়িত্ব ছিল এই সভার ওপর। ছোট অপ-রাধের জন্যে গ্রামেই বিচারের ব্যবস্থা ছিল। এর চেয়ে উঁচুস্তরে, শহরে ও জেলায় শাসনের দায়িত্ব ছিল রাজকর্মচারীদের ওপর। তাছাড়া রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। সভা ছাড়াও গ্রামের সব অধিবাসীকে নিয়ে গঠিত হতো—উরর। সভা ও উরর পরামর্শ করে কাজ করত। এরপর জেলাভিত্তিক গোষ্ঠীর নাম ছিল নাড়ু। যেসব গ্রামে কেবল ব্রাহ্মণদেরই বাস ছিল, সেখানে বিভিন্ন সভা ও গোষ্ঠীর কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। তা থেকে সন্দেহ হয়, কেবল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামেই স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত ছিল। অব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত থাকলে নথিপত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। তেমনি আবার একথাও মনে হয়, একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন শাসনরীতি কেন থাকবে,— বিশেষত যখন একটা শাসননীতি সফল প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামসভা ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন গ্রামপ্রধান।

দাক্ষিণাত্যের আরো উত্তরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন ছিল কম। চালুক্যরাজ্যে রাজকর্ম-চারীরা দৈনন্দিন শাসনকাজে বেশী জড়িয়ে ছিলেন। এমনকি গ্রামশাসনেও তাঁদেরই ভূমিকা ছিল বেশি। গ্রামে সভা ছিল বটে, কিন্তু তা রাজকর্মচারীর অধীনে কাজ করত। গ্রাম-প্রধানেরও প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল সামান্যই। অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে দাক্ষিণাত্যের রাজারা শাসিত অঞ্চল বিভাগের কাজে দশমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা শুরু করেন। দশটি গ্রাম বা দশটির কয়েকগুণ সংখ্যার গ্রাম নিয়ে জেলা গঠিত হতো। বারোটি গ্রামকে একক করে তার কয়েকগুণ সংখ্যা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের কথাও জানা গেছে, তবে সেগুলি সংখ্যায় কম।

রাজা ছিলেন জমির মালিক। তিনি তাঁর ব্রাহ্মণদের জমিদান বা কর্মচারীদের কর আদায়ের অধিকার দান করতে পারতেন। অথবা জমিদার ও ছোট চাষীদের দিয়ে জমি চাষ করাতে পারতেন। তবে দ্বিতীয়টিই বেশি প্রচলিত ছিল। রাজার নিজস্ব জমিগুলি বর্গাদারদের সাহায্যে চাষ করা হতো। সাধারণ জমির মালিকেরা জমি কিনতে পারত এবং তার ফলে জমি বিক্রয় বা দান করার অধিকারও তাদের ছিল। কর্মচারীদের যে রাজস্ব দান করা হতো, তা ছিল বেতনের বিনিময়ে। ওই রাজস্ব থেকে রাষ্ট্রকে সেনাবাহিনী বা রাজস্ব কিছু দিতে হতো না। সেদিক থেকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিয়মিত 'ফিউডাল' ব্যবস্থার পার্থক্য আছে।

গ্রামের মর্যাদা নির্ভর করত কর সম্পর্কিত চুক্তির ওপর, যা তিনটি বিভিন্ন রকমের হতে পারত : (ক) সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছিল সেই ধরনের গ্রাম, যেখানে অনেক বর্ণের মানুষের বাস ছিল, তারা রাজাকে কর দিত ভূমিরাজস্বের আকারে।

(খ) সংখ্যায় কম ছিল 'ব্রহ্মদেয়' গ্রাম, এইসব গ্রামে হয় সমস্ত গ্রাম নয়তো জমি এক বা একাধিক ব্রাহ্মণকে দান করা ছিল। ব্রাহ্মণদের কোনো কর দিতে হতো না বলে এই গ্রামগুলি বেশি সমৃদ্ধিশালী হতো। এছাড়া কোনো গ্রামে যদি কেবল ব্রাহ্মণদেরই বাস হতো, গ্রামের জমি 'অগ্রহর' দান হিসেবে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেওয়া হতো। এখানেও রাজাকে কোনো কর দিতে হতো না। তবে ব্রাহ্মণদের ইচ্ছে হলে স্থানীয় লোকদের অবৈতনিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারত। (গ) আর ছিল 'দেবদান' গ্রাম, এগুলি অনেকটা প্রথমদিকের গ্রামের মতোই ছিল। কেবল গ্রামের খাজনা জমা হতো মন্দিরে। রাজকোষে কোনো কর দিতে হতো না। মন্দির পরিচালকরা মন্দিরের কাজের জন্যে কিছু কিছু গ্রামবাসীকে নিয়োগ করতেন। পরের যুগে মন্দিরগুলিই গ্রামজীবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠায় এই ধরনের গ্রামগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পল্লবযুগে প্রথম দুই ধরনের গ্রামই বেশি ছিল।

গ্রাম অর্থে বোঝাতো গ্রামবাসীদের বাড়ি, উদ্যান, সেচের জন্যে প্রধানত পুকুর বা কুয়ো, গোশালা, পতিতজমি, সাধারণের জমি, গ্রামের চারপাশের বনভূমি, ছোটনদী, মন্দির, মন্দিরের জমি, শ্মশান এবং শুকনো ও সেচপ্রাপ্ত জমি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন জমি— যা গ্রামসাধারণের যৌথ সম্পত্তি আর যা বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন— ধানমাড়াইয়ের জমি। ধান ছিল প্রধান ফসল। ধান দিয়ে বিনিময় প্রথায় বেচাকেনা চলত। আবার, ধানের উৎপাদনে যখন উদ্বৃত্ত থাকত তখন তার ব্যবহার হতো বাণিজ্যিক (Commercial) শস্যরূপে। এছাড়া, নারকেলের চাষও হতো প্রচুর। নারকেল নানাভাবে ব্যবহার হতো। তাছাড়া, বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাল ও সুপারীর চাষও হতো। আম ও কলাগাছের বাগান ছিল অনেক। তুলোবীজ ও আদাজাতীয় ঝাঁঝালো বীজ থেকে পাওয়া তেলের প্রচুর চাহিদা ছিল।

শুধু দক্ষিণ-ভারতেই এক বিশেষ ধরনের জমি ছিল, যার নাম— 'এরিপত্তি', অর্থাৎ পুকুরজমি। এই জমি গ্রামের ব্যক্তিরা দান করত এবং এই জমির শস্য বিক্রী করে গ্রামের পুকুর সংরক্ষণ করা হতো। বোঝা যাচ্ছে, গ্রামগুলি সেচের জন্যে পুকুরের জলের ওপর নির্ভর করত। বৃষ্টির জল পুকুরে ধরে রেখে গ্রীষ্মের সময়ে ওই জলে সেচের কাজ চলত। গ্রামের সমস্ত লোকের শ্রম দিয়েই পুকুর তৈরি হতো। পুকুরের পাড় ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হতো। সমস্ত চাষীই সেচের সুবিধে পেত। পুকুরের সংরক্ষণ স্বভাবতই খুব প্রয়োজনীয় ছিল। পল্লবযুগের প্রায় সব শিলা-লিপিতেই পুকুরের সংরক্ষণের জন্যে গ্রামবাসীর কাজকর্মের কথার উল্লেখ আছে। পুকুরের পরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কুয়ো। পুকুর বা কুয়ো থেকে খাল কেটে সেচের জল নিয়ে যাওয়া হতো। মাঝে মাঝে স্লুইস গেট রেখে জলের স্তর ও উৎসের কাছে জলের প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সেচের জল বণ্টনের কড়াকড়ি তদারকীর জন্যে গ্রামে বিশেষ কমিটি থাকত। নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি জল নিলে চাষীকে আলাদা কর দিতে হতো।

জমিদানের সময়ে তাম্রফলকে তার বিবরণ লেখা হতো। কিছু তাম্রফলক এখনো অক্ষত আছে ও তার মধ্যে জমির কর ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। গ্রামে

দু' ধরনের কর ছিল। রাজাকে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ থেকে এক-দশমাংশ পরিমাণ দিতে হতো কর হিসেবে। গোটা গ্রামের কর একসঙ্গে সংগ্রহ করে তা রাজ-কর্মচারীকে দিয়ে দেওয়া হতো। আরেক ধরনের স্থানীয় কর ছিল। তা গ্রামেরই নানা প্রয়োজনে ব্যয় হতো। যেমন, সেচের খালের সংস্কার, মন্দিরের সাজসজ্জা ইত্যাদি। রাজাকে দেয় ভূমিকরের পরিমাণ বেশি ছিল না। তা ছাড়াও ভারবাহী পশু, মদ, বিয়ের উৎসব, কুমোর, স্যাকরা, ধোপা, তাঁতী, মহাজন, পত্রবাহক ও ঘি-এর কারিগরদের ওপরে আলাদা কর বসত। করের পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সবকিছুর জন্যে একরকম কর ছিল বলে মনে হয় না। রাজ-কোষের অধিকাংশ অর্থ আসত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কর থেকে। ব্যবসাবাণিজ্য বা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশেষ করধার্য করা হতো না।

তাম্রফলকে জমিদান সম্পর্কে কি লেখা থাকত, তার একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। পণ্ডিচেরীর কাছে একটি গ্রামে ১৮৭৯ সালে তাম্রফলকটি পাওয়া যায়। এগারোটি ফলক একটি তামার আঙটায় আটকানো ছিল। দুই প্রান্তে রাজকীয় শীলমোহরে ষাঁড় ও লিঙ্গ (পল্লবদের প্রতীক) উৎকীর্ণ ছিল। রাজা নন্দি-বর্মণের ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে একটি গ্রামদানের বিবরণ এতে পাওয়া যায়। প্রথমেই রয়েছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রশস্তি। তারপর তামিল ভাষায় দান সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আছে। পরিশেষে রয়েছে সংস্কৃত শ্লোক। নিচের উদ্ধৃতিটি তামিল ভাষায় লেখা অংশ থেকে। উল্লেখযোগ্য যে, এই দানপত্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়নি।—

> উপর্যুক্ত প্রশস্তির রচয়িতা ত্রিবিক্রম। উক্ত আদেশটি রাজার রাজত্বকালের দ্বাবিংশ বর্ষে রচিত। ব্রহ্ম যুবরাজের অনুরোধে প্রাক্তন ভূস্বামীদের উৎখাত করে এবং ঘোরশর্মনকে দানের অছি নিযুক্ত করে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের দেশের কোড়ু-কল্লি গ্রাম ভারদ্বাজগোত্রীয়, ছান্দোগ্যসূত্রানুসারী, পুনি-নিবাসী শেত্তিরঙ্গসোমায়-জীনকে ব্রহ্মদেয় হিসেবে দান করেন। দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণদের পূর্বে দেওয়া দান ও কৃষকদের আবাসের দু' পত্তি জমি এই দান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। রাজার এই দানের আদেশ দেখে আমরা গ্রামবাসীরা গ্রাম সীমানাগুলির কাছে গিয়ে-ছিলাম, যে সীমানা নাড়ু (জেলার)-র প্রধান ব্যক্তি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, গ্রামটিকে দক্ষিণদিক থেকে বামদিক ধরে ঘুরে হেঁটে দেখলাম এবং লতাগুল্ম রোপণ করে তার চারিদিকে পাথর রেখে দিলাম। এই গ্রামের সীমান্ত হল— পূর্ব সীমান্ত পলাই-যুরের সীমান্তের পশ্চিমে, দক্ষিণ সীমান্ত পলাইযুরের সীমান্তের উত্তরে, পশ্চিম সীমান্ত মানরপক্কম ও কোল্লিপক্কম-এর সীমান্তের পূর্বে ও উত্তরসীমান্ত ভেলি-মানাল্লুর-এর সীমান্তের দক্ষিণে।

এই চার সীমান্তের মধ্যবর্তী যে শুষ্ক ও সিক্ত জমি আছে ও যেখানে কচ্ছপ ও গোসাপের বাস, সেই জমি গ্রহীতারা ভোগ করবেন। তিরাইয়ানের পুষ্করিণী, সেজারাউ ও ভেতলা নদী থেকে জল আনার জন্যে খাল খননেরও অধিকার থাকবে।...যাঁরা এইসব খালে পাত্র ডুবিয়ে কিংবা খাল থেকে নালা কেটে জল

নেবেন, রাজাকে সেজন্যে জরিমানা দিতে হবে। গ্রহীতা ও তাঁর বংশধররা বাসগৃহ, বাগান ইত্যাদি ভোগ করতে পারবেন এবং নতুন গৃহ ও পোড়ামাটির টালির শালা নির্মাণ করতে পারবেন। এই সীমান্ত মধ্যবর্তী জমির ওপর সমস্ত কর রেহাই দেওয়া হল। তেলের ঘানি, তাঁত ও কুয়া খননকারীদের ওপর দেয় করও রেহাই দেওয়া হল। আরো যা যা করমুক্ত থাকবে তা হল— ব্রাহ্মণ ও রাজাকে দেয় ভাগ, শেঙ্গোদি লতার অংশ, কল্লাল (ডুমুর) ও কান্নিত্তু গাছের অংশ, শস্য-বীজের অংশ, গ্রামপ্রধানকে দেয় অংশ, কুম্ভকারের অংশ, ধানমাড়াইয়ের অংশ, ঘি-এর মূল্যের অংশ, বস্ত্রমূল্যের অংশ, বস্ত্রের ভাগ, শিকারী, পত্রবাহক, নদী, ঘাস, গরু, ষাঁড়, জেলার ভাগ, সুতো, ভৃত্য, তালগুড়, মন্ত্রী ও হিসাবরক্ষককে দেয় জরিমানা, জলপদ্ম চাষের কর, জলপদ্মের ভাগ, সুপারি ও তালগাছ সমেত অন্যান্য পুরনো গাছের গুঁড়ির এক-চতুর্থাংশ··· ।

স্থানীয় শাসকবৃন্দ, মন্ত্রিগণ ও সচিবদের উপস্থিতিতে এই দান করা গেল।[১]

গাঙ্গেয় সমভূমির মতো বিস্তৃত চাষের জমি দক্ষিণ-ভারতে ছিল না। তাই, পল্লব ও চালুক্যরা জমি থেকে বেশি কর আদায় করতে পারেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যও এমন কিছু উন্নত ছিল না— যা থেকে প্রচুর কর আদায় সম্ভব হতো। রাজকোষের এক বিপুল অংশ ব্যয় হতো সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে। সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় হতো বটে, কিন্তু তার ওপর তেমন ভরসা করা যেত না। রাজারা সেনা-বাহিনীকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। সেনাবাহিনীতে ছিল পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ও অল্প কয়েকটি রণহস্তী। রথের ব্যবহার কমে এসেছিল। তাছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের সময়ে রথ কোনো কাজে আসত না। অশ্বারোহী বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ হলেও তার ব্যয় ছিল প্রচুর। ঘোড়ার সরবরাহ ছিল অপ্রতুল আর পশ্চিম এশিয়া থেকে ঘোড়া আমদানি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। প্রয়োজনে সামরিক কর্মচারীদের অসামরিক কাজেও নিয়োগ করা হতো। তবে সাধারণত সামরিক ও অসামরিক কাজের স্পষ্ট ব্যবধান ছিল। পল্লবদের আমলে নৌবাহিনীও গঠিত হয়েছিল এবং মহাবলীপুরম্ ও নাগপত্তিনম-এ দুটি বন্দর নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য পরে চোলদের আমলে দক্ষিণ-ভারত যে নৌশক্তির অধিকারী হয়েছিল সে তুলনায় পল্লবদের নৌবাহিনী ছিল সামান্য।

যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও পল্লবদের নৌবাহিনীকে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নৌবাহিনী সাহায্য করত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তখন তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল : কম্বোজ (কম্বোডিয়া), চম্পা (আন্নাম) ও শ্রীবিজয় (দক্ষিণ-মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা)। ভারতের সঙ্গে রাজ্যগুলির নিয়মিত যোগাযোগ ঘটত দক্ষিণ-ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে। পশ্চিম-উপকূলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারটা ক্রমশ বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছিল। এই বিদেশীরা অধিকাংশই ছিল আরব এবং এরা উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। ¯.রতীয় বণিকরা বিদেশে দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার বদলে সরবরাহকারীর কাজই করতে লাগল বেশি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমে গিয়ে আরবদের

মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রইল। তবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেড়ে উঠল। এই অঞ্চলের রাজারা পল্লবদের স্থাপত্যরীতি ও তামিললিপি নিজেদের রাজ্যেও ব্যবহার শুরু করলেন। এই অঞ্চলের যে সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রভাবিত করেছিল তাতে তামিলনাদের দান উল্লেখযোগ্য।

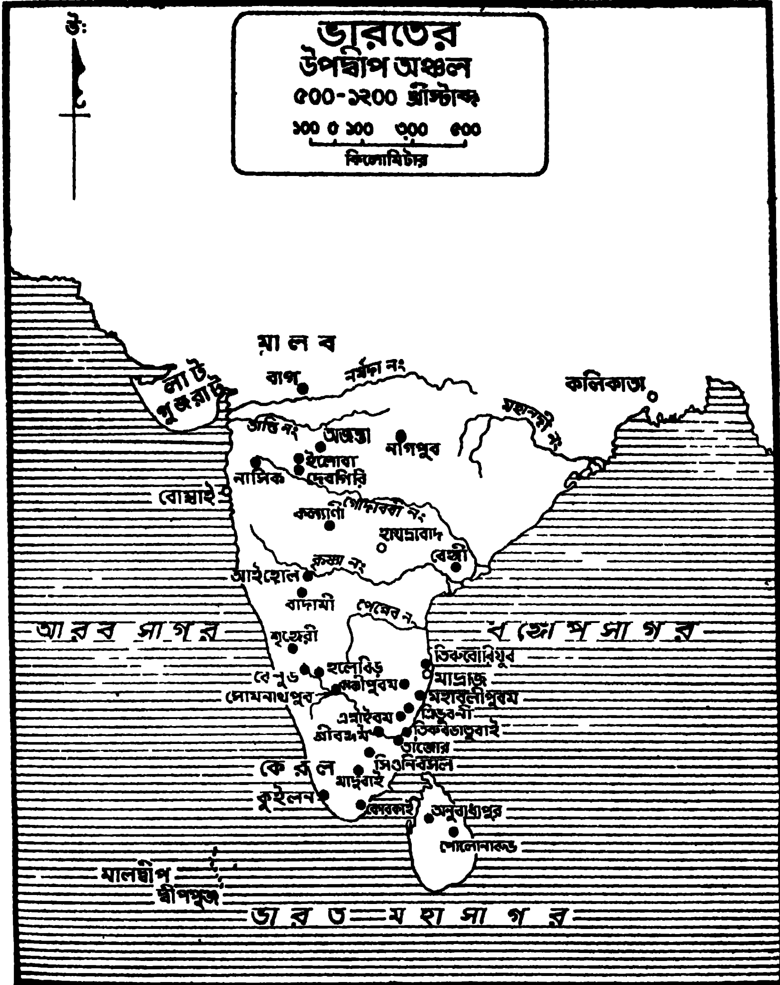
দক্ষিণ-ভারতে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল সমাজের ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ সম্মান। পল্লব রাজাদের সময়কার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আর্যপ্রভাব দেখা গেছে। এই যুগের গোড়ার দিকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল বৌদ্ধ ও জৈনদের ওপর। কিন্তু ক্রমশ এই দায়িত্ব চলে গেল ব্রাহ্মণদের হাতে। জৈনদের ধর্মীয় সাহিত্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আসার পর তামিলের ব্যবহারও শুরু হল। জৈনধর্ম খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমে গেল। তাছাড়া, প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ জৈনধর্মে আস্থা হারিয়ে শিবভক্ত হয়ে উঠলেন। এর ফলে জৈনরা রাজকীয় সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হল। জৈনরা মাদুরা ও কাঞ্চীতে শিক্ষাকেন্দ্র এবং শ্রবণবেলগোলাতে ধর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু অধিকাংশ জৈন সন্ন্যাসীই পাহাড় ও অরণ্যের মধ্যে নির্জনবাসই পছন্দ করতেন। এর মধ্যেও সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটি ছিল পুদুক্কোট্টাই-এর সিত্তান্নাভাসাল-এ। সেখানে দেওয়ালে আঁকা সুন্দর ছবি এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মঠগুলি। কাঞ্চী অঞ্চলে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় ও নেলোর জেলায় এই সবগুলি অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশেষত এই যুগে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল। তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের অবশ্য তখন হারবার পালা। রাজকীয় আনুকূল্য পেয়ে হিন্দু ধর্মপ্রচারকরা শক্তিশালী হয়ে উঠল।

হিন্দু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সাধারণত মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকত। প্রথমদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার ছিল 'দ্বিজ' হিন্দুদের। ক্রমশ এগুলি কেবল ব্রাহ্মণদেরই শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হল এবং কেবল উচ্চশিক্ষারই ব্যবস্থা রইল। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ব্যবসায়ীদের সাহায্য পেত। রাজকীয় আনুকূল্যের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ হল। প্রতিষ্ঠানগুলি হয় রাজার সমর্থক, নয়তো রাজপরিবারের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সমর্থকদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই খ্যাতি পেয়েছিল। এছাড়া ছিল আরো কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র।* অষ্টম শতাব্দীতে মঠগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মঠে শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও বিশ্রামকেন্দ্র ও ভোজনালয় থাকত। ফলে যে মঠ যে ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, সেই ধর্মের প্রচারও হতো। তীর্থস্থানের মঠগুলিতে বহু তীর্থযাত্রী আসত ও রীতিমতো ধর্মালোচনা চলত।

* পত্তির কাছে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্যে যে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল, তার ব্যয়নির্বাহ হতো রাজা নৃপতুঙ্গের-এর কর্মচারীর দান করা তিনটি গ্রাম থেকে। এখানে অত্যন্ত রক্ষণশীল ধরনের শিক্ষা দেওয়া হতো। এন্নিয়িরাম মন্দির-শিক্ষাকেন্দ্রে ৩৪০ জন ছাত্রকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হতো ও ১০ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। তাছাড়া রাজসভার ভাষাও ছিল সংস্কৃত। তাই সাহিত্যের ভাষা হিসেবেও সংস্কৃতের ব্যবহার শুরু হল।



দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভারবির 'কীরাতার্জুনীয়' ও দণ্ডিন-এর 'দশকুমারচরিত'। ওই যুগের ভাষার মারপ্যাঁচের একটা সচেতন চেষ্টা চলত। দণ্ডিন-এর একটি কবিতা এমন কায়দায় লেখা হয়েছিল যে সেটি শুরু থেকে বা শেষ থেকে দু'ভাবেই পড়া যেতে পারত। এর একদিক থেকে পড়লে রামায়ণের কাহিনী ও বিপরীত দিক থেকে পড়লে মহাভারতের কাহিনী। ভাষার এরকম কৃত্রিমতা যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা বোঝেননি যে, তামিল ও কানাড়া ভাষা দুটি

ক্রমশ নতুন সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে উঠছে। এই যুগের কানাড়া সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বাদামীর চালুক্যরাজার সপ্তম শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে কানাড়া ভাষাকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতি চর্চার ভাষা। তামিল ভাষায় ছোট কবিতা ও মহাকাব্য দুইই লেখা হয়েছিল। এমনকি, জৈনধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত উপদেশমূলক কবিতাও লেখা হতো ও আবৃত্তি করা হতো। যেমন— 'কুরাল' ও 'নালাদিয়ার'। তারপর এলো দুটি তামিল মহাকাব্য— 'শিলপ্পাদীগরম' ও 'মনিমেগলাই'। দুটির মধ্যেই সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যসুলভ অলংকারের বাহুল্য নেই। একদল জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক স্তবগানের মাধ্যমে তামিল ভাষার চর্চার আরো উন্নতি করলেন। এই ধর্মপ্রচারকদের এখন তামিল সন্তসাধক বলে বর্ণনা করা হয়। এদের রচনায় তামিলের ব্যবহার ছিল বেশি এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষার তুলনায় তামিল বেশি এগিয়ে গেল।

দাক্ষিণাত্যের ওপর উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে উত্তর-ভারতের অনেক ধারণা, রীতি ও প্রতিষ্ঠান যেমন দক্ষিণ-ভারতেও গ্রহণ করা হল অনেক কিছু আবার বর্জনও করা হয়েছিল। পারস্পরিক প্রভাবে দুই অঞ্চলেই নতুন নতুন চিন্তাভাবনারও জন্ম হল। এর মধ্যে একটি হল— তামিল ভক্তিবাদ। ব্যবসার প্রয়োজনে দুই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের ফলে নতুন রীতিনীতি দুই অঞ্চলেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল।

ব্রাহ্মণরা বৈদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে বৈদিক সংস্কৃতি উত্তর-ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র। তাছাড়া শক, কুষাণ ও হুণ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শ থেকে বেদকে রক্ষা করারও একটা দায়িত্ব ছিল। দক্ষিণ-ভারতে এইসব ঐতিহ্য রক্ষাকারীদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো। অন্যান্য অঞ্চলের মতো দাক্ষিণাত্যের রাজারাও ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে নিজেদের সম্মানিত মনে করতেন। আবার ব্রাহ্মণরাই ছিল এই ঐতিহ্যের ব্যাখ্যাকারী। ঐতিহ্য অনুসরণের জন্যে কখনো বৈদিক বলিদান অনুষ্ঠান করতে হতো কিংবা ব্রাহ্মণদের প্রচুর দানধ্যান করতে হতো। রাজারাও জানতেন যে, এইসব রীতি মেনে চললে নিজেদেরই সম্মান বাড়বে। স্থানীয় পুরোহিতদের তুলনায় ব্রাহ্মণদের ওপরই রাজাদের বেশি আস্থা ছিল। ব্রাহ্মণরা দাবি করত, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং তারা অদৃশ্য শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বৈদিক রীতি মেনে চললে স্বর্গেও পুরস্কার পাবার আশা ছিল।

আরো অন্যান্য ঘটনার সাহায্যেও বৈদিক ঐতিহ্য বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। এক নতুন আন্দোলন শুরু হল— বৈদিক দর্শন থেকে সমস্ত অস্পষ্টতা ও অসংগতি দূর করার জন্যে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বৈদিক ধর্ম আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। এর মূলে ছিলেন শঙ্করাচার্য্য। তখন বিভিন্ন ভক্তি মতবাদ ও প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদকে দৃঢ়তে হচ্ছিল। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন কেরলের লোক। তিনি বেদান্ত চিন্তারীতির নতুন ব্যাখ্যাকর্তা ও অদ্বৈত মতবাদের প্রচারক।

শঙ্করাচার্য্য বললেন, আমাদের চারিদিকে যে পৃথিবীকে আমরা দেখি তা প্রকৃতপক্ষে মায়া। প্রকৃত সত্য এসবের বাইরে এবং মানব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ওই সত্যকে অনুভব করা যায় না। কঠোর তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ওই সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর তাঁর মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে বেদ শুধু পবিত্রই নয়, বেদ প্রশ্নাতীত। অকারণ আচার-অনুষ্ঠান শঙ্কর পছন্দ করতেন না। হিন্দু পুজাপদ্ধতি থেকে অবান্তর অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মঠে সরল পুজোপদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। এই মঠগুলি ছিল হিমালয়ের বদ্রিনাথে, উড়িষ্যার পুরীতে, পশ্চিম-উপকূলের দ্বারকায় ও দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরীতে। প্রত্যেকটিই ছিল তীর্থস্থান। মঠগুলি প্রচুর দানের অর্থে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং আরো শাখামঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলি শঙ্করের মতবাদ শিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এছাড়াও তিনি তাঁর ভক্ত সন্ন্যাসীদের তাঁর মতবাদ প্রচারের উপদেশ দেন। শঙ্করের দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের মিল আছে। স্বভাবতই নিজেদের ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয়ে বৌদ্ধরা শঙ্করাচার্য্যের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না।

শঙ্কর সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। নানা জায়গায় বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বহু মানুষকে বেদান্ত ও অদ্বৈত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। বেদান্ত বিরোধীদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কের ফলে দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রগুলি আগেকার জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন চিন্তায় বিকশিত হয়ে উঠল। কিন্তু শঙ্করের মতবাদের মধ্যেই বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বীজ লুকিয়ে ছিল। যদি এই পৃথিবী কেবল মায়াই হয়, তাহলে এ পৃথিবীর নানা ঘটনার ব্যাখ্যা বা তা নিয়ে গবেষণা করারও কোনো সার্থকতা নেই। এই যুক্তিনির্ভর অনুসিদ্ধান্ত থেকেই পরবর্তী যুগের পুঁথিগত চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়।

কেবল বৈদিক সংস্কৃতিই দাক্ষিণাত্যে আসেনি। ধর্মের ক্ষেত্রে অবৈদিক বা বেদ-বিরোধী চিন্তাধারারও আগমন হয়েছিল। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও বিষ্ণু ও শিবের উপাসক ভাগবত পাশুপত ধর্মবিশ্বাসও দাক্ষিণাত্যে এসে পড়ল। এতে বলিদানজাতীয় পুজারীতির বদলে ব্যক্তিগত উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পুজার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল। রাজসভায় বৈদিক রীতির প্রচলন হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নতুন ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে অন্যসব ধর্মের চেয়ে ভক্তিবাদই বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও রাজারাও তা মেনে নিয়েছিলেন।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকেও তামিল সাধকদের নতুন ভক্তিবাদের কাছে হার স্বীকার করতে হল। ভক্তিবাদ ক্রমশ একটা আন্দোলনে পরিণত হল। আগেকার হিন্দু দর্শনে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ভালোবাসার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা কখনো বলা হয়নি। ভক্ত তার মনের অভাব দূর করার জন্যে ভগবানকে নিজের ভালোবাসা জানাবে এবং ভগবান্‌ও ভক্তকে সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবেন। এই অনুভূতি একটি তামিল কবিতায় মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

তুমি যখন তাঁকে দেখ, আনন্দে তাঁর বর্ণনা কর,
করজোড়ে নতজানু হয়ে তাঁকে পুজো কর,

যেন তোমার মাথা তাঁর পায়ে ছোঁয়া পায়,
তিনি পবিত্র ও বিশাল—
তিনি আকাশচুম্বী, কিন্তু তাঁর কঠিন মুখ
তিনি লুকিয়ে রাখবেন, তোমাকে দেখাবেন
তাঁর তরুণ মূর্তি, সুন্দর সুরভিত
এবং তাঁর বাণী হবে প্রেমময় ও ক্ষমাশীল—
নির্ভয় থাকো, আমি জানতাম তুমি আসবে।[২]

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তামিল ভক্তিবাদ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নয়নার (শিব উপাসক সন্ন্যাসী) ও আলওয়ারদের (বিষ্ণু উপাসক সন্ন্যাসী) স্তবগান ও উপদেশের মধ্যে পরেও এই ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত স্তবগুলি দুটি বিভিন্ন সংকলনে সংরক্ষিত আছে। সেগুলি হল 'তিরুমুরাই' ও 'নলইয়প্রবন্ধম'। শৈব সন্ন্যাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন আপ্পার (ইনি নাকি রাজা মহেন্দ্রবর্মনকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন), সম্বন্দর, মাণিক্যবসগর এবং সুন্দরর। বৈদিক দেবতাদের অস্বীকার বা উপেক্ষা করে উপাসনার মধ্যে ঈশ্বর ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল।

মাণিক্যবসগর তাঁর স্তবে এই কথাই বলছেন—

ইন্দ্র বা বিষ্ণু বা ব্রহ্মা
তাঁদের আশীর্বাদের জন্যে আমার আকাংক্ষা নেই,
আমি তাঁর সন্ন্যাসীদের প্রেম কামনা করি
তাতে যদি আমার বাসগৃহ ধ্বংস হয়ে যায়ও
নিম্নতম নরকেও আমি যাব
যদি তোমার আশীর্বাদ পাই ;
সবচেয়ে বড় কথা কি করে আমার হৃদয়
তোমাকে ভিন্ন অন্য ঈশ্বরের কথা চিন্তা করবে ?···
আমার নেই কোন গুণ, অনুতাপ, জ্ঞান বা আত্মনিয়ন্ত্রণ;
একটা পুতুলের মতো
অন্যের ইচ্ছায় আমি নেচেছি, শিক্ষা দিয়েছি,
পড়ে গেছি। কিন্তু আমার
প্রতিটি অঙ্গ তিনি ভরে দিয়েছেন
প্রেমের উন্মাদনায়, যাতে আমি উঠে যেতে পারি সেখানে
যেখান থেকে ফিরতে হয় না।
তিনি আমাকে তাঁর সৌন্দর্য দেখিয়েছেন,
কাছে টেনেছেন। আহা কবে
যাবো আমি তাঁর কাছে ?[৩]

নাম্মালবার একই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত একটি স্তবে—

তুমি এখনো দয়া করে ছড়িয়ে দাওনি তোমার

করুণা তোমার সঙ্গীকে (গায়ক)। হতাশায়
তোমার উদাসীনতা দেখে সে তার আত্মাকেও
ত্যাগ করার আগে তোমার দয়ালু দূত ও
বাহন গরুড়ের মাধ্যমে খবর পাঠাও তোমার
সঙ্গীকে, সে যেন ক্ষয় না পায়, সাহস
সঞ্চয় করে যতক্ষণ তুমি প্রভু ফিরে না
আসো এবং তা নিশ্চয়ই শীঘ্রই ঘটবে।[৪]*

স্তব রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ হলেও অধিকাংশ ছিলেন নিম্নবর্ণভুক্ত—কারিগর বা কৃষক। এ'রা তামিলদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ও নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। সবচেয়ে বৈপ্লবিক ব্যাপার হল এ'দের মধ্যে সন্ন্যাসিনীরাও ছিলেন, যেমন— অন্দাল। এ'দের স্তবও জনপ্রিয় ছিল। অন্দাল ছিলেন বিষ্ণুভক্ত এবং তিনি বিষ্ণুর প্রতি ত'ার ভালোবাসা নিয়ে স্তবগান করতেন। এ'র সঙ্গে রাজস্থানের মীরাবাঈ-এর মিল আছে। মীরাবাঈ বহু শতাব্দী পরে ভক্তিগীতির গায়িকা হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালের তামিল সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মকে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং জৈনধর্মের প্রতিও বিশেষ আনুগত্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তামিল ভক্তিবাদের ওপর দুটি ধর্মেরই কিছু কিছু প্রভাব আছে। ভক্তিবাদ প্রচলিত বর্ণবিভক্ত সমাজকে অস্বীকার করেছিল এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সমর্থন পেয়েছিল। ভাগবত মতবাদের ঈশ্বরভক্তির উৎস ছিল উপনিষদ ও বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতবাদ। তামিলদের ঈশ্বরভক্তিরও ওই একই উৎস। ঈশ্বরের করুণাময়তার ধারণা এসেছিল বৌদ্ধধর্ম থেকে। তবে এ ব্যাপারে মালাবারের খ্রীস্টানদেরও ভূমিকা আছে। মানবজীবনের অসম্পূর্ণতা ও পাপবোধ তামিল মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই ধারণাও বৈদিক ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম দ্বারাই বেশি প্রভাবিত। প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতবাদগুলির পতন আর তামিল মতবাদের উত্থান ঘটল একই সময়ে। মনে হয়, প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রাহ্মণরা স্বীকার না করলেও তামিল ভক্তিবাদ আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে আর্যসংস্কৃতির প্রসারের প্রতি প্রতিরোধ। ব্রাহ্মণরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করলেও ভক্তিবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এর জনপ্রিয়তার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও কিছুটা আপস করতে হয় এবং রাজারাও ভক্তিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করা শুরু করেন। গূঢ় ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম প্রচার করত। কিন্তু ভক্তিবাদের তত্ত্ব ছিল সহজ ও প্রচারের মাধ্যম ছিল তামিলভাষা। ব্রাহ্মণরা বর্ণাশ্রমকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারত না এবং কোনো অব্রাহ্মণকে ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী করতে রাজী হতো না। তামিল সাধকরা বর্ণাশ্রমকে স্বীকারই করতেন না এবং বর্ণের অজুহাতে কাউকে জ্ঞানলাভে বঞ্চিত

* এক্ষেত্রে রচয়িতা নিজে পুরুষ হলেও কবিতার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুভূতিকে কোনো নারীর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

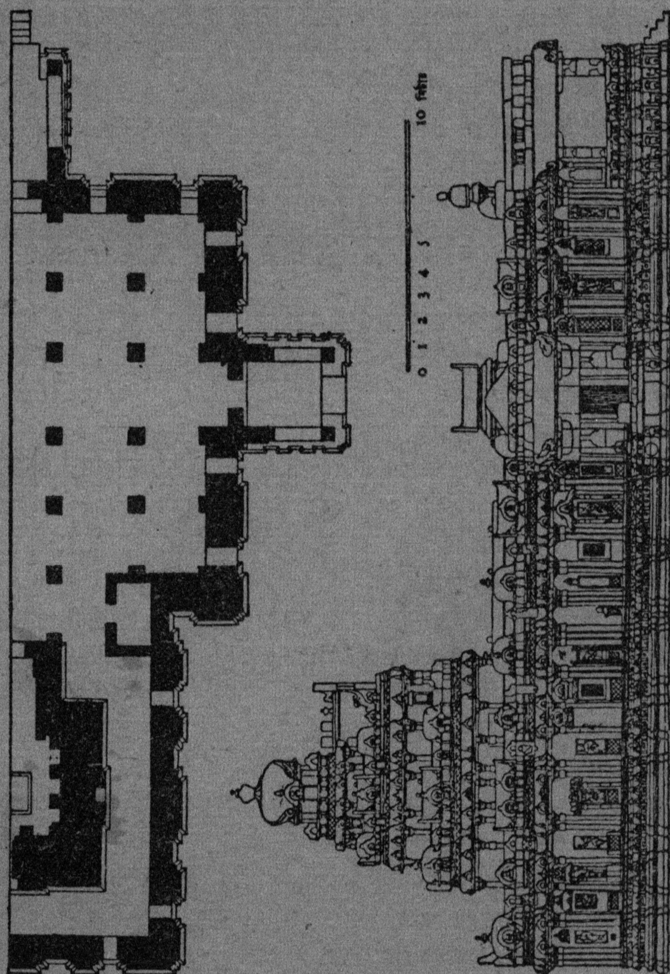
করতেন না।

ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অর্থ বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হয়নি। রাজপরিবার বা ধনী ব্যবসায়ীদের সবসময়েই সমর্থন ছিল। স্থানীয় মন্দির ছিল সব ধর্ম চর্চার কেন্দ্র এবং স্থানীয় মন্দিরই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ভক্তিবাদের মিলনস্থান। মন্দিরের ব্যয়নির্বাহ হতো দানের সাহায্যে। রাজকীয় দান ছিল গ্রাম বা কৃষিজমি, আর ব্যবসায়ী বা সমবায় সংঘগুলি মন্দিরের জন্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে রাখত। মন্দিরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন গৌণ মূর্তি, প্রদীপ, তেল ইত্যাদির জন্যে সমাজের অন্যান্য বর্ণের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দান করত। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখত, অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাতো, বাতি জ্বালাতো, পুজার ফুল ও মালা যোগাতো। তবে পুজার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণদেরই। কিন্তু শূদ্ররা, অর্থাৎ কুম্ভকার, চর্মকার ও অস্পৃশ্যরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না। কেননা, তারা এলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে। মন্দিরের অর্থস্বাচ্ছল্য বাড়লে ও পরিচারকদের সংখ্যা বাড়লে একটি কার্যকরী সমিতি নিয়োগ করা হতো এবং এই সমিতি দানের অর্থের হিসেব রাখা ও পরিচারকদের পরিচালনার দায়িত্ব নিত।

তামিল সাধকরা ধর্মীয় সংগীত ও স্তবগান জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। স্তবগান মন্দিরের নিয়মিত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেল। বীণাযন্ত্রের ব্যবহার হতো বোধহয় সবচেয়ে বেশি। ভারত ও প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের ধনুকাকৃতি হার্প থেকে বোধ হয় এর উৎপত্তি। পঞ্চম শতাব্দীতে বীণা নাশপাতির আকার নেয়। আরো ২০০ বছর পরে বীণা বর্তমান আকার পরিগ্রহ করে। মন্দিরের অনুষ্ঠানে নৃত্যেরও প্রচলন হল। লোকনৃত্য থেকেই এর শুরু। পরে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে জটিল ধরনের নৃত্যরীতির জন্ম হল। তখন এর নাম ভরতনাট্যম্ (ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই নৃত্যের বিভিন্ন নিয়ম বলে দেওয়া আছে)। পল্লবযুগের পরবর্তীকালে স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থায় মন্দিরগুলি ভরতনাট্যম নৃত্যের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত।

পল্লবযুগের মন্দিরগুলি সাধারণত খাড়াভাবে উঠে যেত। তবে বৌদ্ধ-পদ্ধতির গুহামন্দিরও নির্মাণ হতো। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন পাহাড়ের গায়ে মন্দির নির্মাণ নিয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা পরস্পর প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। তবে, যে ধর্মেরই মন্দিরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই সেখানে গিয়ে উপাসনা করতে পারত। তার ফলে সাধারণ মানুষ দুই ধর্মের বিবাদ তেমন অনুভব করেনি। গুহা মন্দিরগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল অজন্তায় বৌদ্ধমন্দির ও ইলোরায় বৌদ্ধ ও হিন্দুমন্দির। এরপর জৈনরাও মন্দির নির্মাণ শুরু করে দিল এবং ইলোরায় কয়েকটি মন্দির তৈরি করেছিল।

বৌদ্ধ গুহামন্দিরের দেওয়ালে বৌদ্ধকাহিনী চিত্রিত করা হতো। ওইসব ছবির মধ্যে সমকালীন জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। এইসব গুহায় আলোর অভাব ও অন্যান্য অসুবিধের মধ্যেও যে দেওয়াল ভরে ছবি আঁকা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। এখান থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে গুহামন্দিরে চিত্রাঙ্কনের রীতি শুরু হলেও অজন্তার অপূর্ব সুন্দর চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল পঞ্চম ও ষষ্ঠ



বিরূপাক্ষ পট্টদকল : অর্ধেক পরিকল্পনা ও বিভাগ

শতাব্দীতে চালুক্য ও বাকাটক রাজাদের আমলে। ছবি আঁকার পদ্ধতি ছিল ফ্রেস্কো-সেকো ধরণের। শুকনো জমির ওপর ছবিটি প্রকৃতপক্ষে আঁকা হতো। পাথরের গুঁড়ো, কাদা অথবা গোবরের সঙ্গে ভূষি ও গুড় মিশিয়ে দেওয়ালে লেপে দেওয়া হতো। এগুলি ঠিকমতো লাগানো হয়ে গেলে ভিজে থাকতে থাকতেই দেওয়ালটি চুনের জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হতো। দেওয়াল শুকিয়ে গেলে রঙ্ দেওয়া হতো। সবশেষে ছবির ওপর বার্নিশ লাগানো হতো। খনিজ পদার্থ ও নানা ধরনের লতা থেকে রঙ্ তৈরি করা হতো এবং তখনকার রঙ্ এযুগেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগের মতোই উজ্জ্বল রয়েছে।

কেবল গুহামন্দিরেই নয়, দক্ষিণ-ভারতের খাড়া ধরনের মন্দিরগুলির দেওয়ালেও ছবি আঁকার প্রথা ছিল। গুহামন্দিরে সন্ন্যাসীরা ছবি আঁকতেন। তবে পেশাদার শিল্পীও নিয়োগ করা হতো ছবির উৎকর্ষের জন্যে। নইলে অজন্তা, সিত্তন্নাভাসাল, বাঘ ও কাঞ্চীপুরমের মন্দিরের দেওয়ালচিত্র সৃষ্ট হতো না। সাহিত্যগ্রন্থে বিবৃত বর্ণনায় মনে হয়, মন্দির ছাড়া বাসগৃহেও দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হতো। দুর্ভাগ্যক্রমে তার কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই।

ভারতীয় অঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল সুদূর মধ্য-এশিয়াতেও। আফগানিস্তানের বানিয়ান থেকে শুরু করে মধ্য-এশিয়া ও গোবি মরুভূমিতে বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। এগুলিও পাহাড়ের গা কেটে তৈরি হতো এবং ভেতরের দেওয়াল চিত্রিত করা থাকত। মিরান ও তুন-হুয়াঙ-এ এই ধরনের চমৎকার কিছু দেওয়ালচিত্র এখনো আছে। সম্ভবত মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ার জন্যেই এগুলি অক্ষত আছে।*

পল্লবযুগের পাহাড়কাটা মন্দিরগুলি বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলির সমতুল্য। মহাবলীপুরমের পাহাড়কাটা মন্দিরে দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ মন্দিরের মতো পিপ্পাজাতীয় খিলান ও তোরণ দেখা যায়। মহাবলীপুরমের সমুদ্রের তীরে ও কাঞ্চীতে প্রথম পাথরের তৈরি মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু এই রীতির পুনর্বিকাশ ঘটে চোলযুগে। গুপ্তদের মন্দিরের অনুকরণে চালুক্যরা মন্দির নির্মাণ করেছিল। আবার, একসময়ে চালুক্য নির্মাণরীতি উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। বোম্বাইয়ের কাছে এলিফ্যান্টা দ্বীপের পাহাড়কাটা মন্দির এই রীতিতে নির্মিত। অইহোলে ও বাদামীর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকেও এই বিশেষ শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরের মধ্যে পাহাড়-কাটা-মন্দির হতে ভূমি-থেকে-ওঠা-মন্দিরে ক্রমবিবর্তনের একটা চেহারা দেখা যায়. অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট বংশের এক রাজার আমলে এই মন্দির নির্মিত হয়। পাহাড়ের ধারে পাথর কেটে এই সুউচ্চ মন্দিরটি তৈরি হয়। কিন্তু এই মন্দির নির্মাণের সময় ভূমি থেকে ওঠা রীতি অনুসরণ করা হয়। সেদিক দিয়ে দ্রাবিড় মন্দিরের সঙ্গেই এটির সাদৃশ্য আছে। এথেন্সের পার্থেনমের চেয়ে এটি দেড়গুণ উঁচু। মন্দির নির্মাণের ব্যয় নিশ্চয়ই

* বিংশ শতাব্দীতে কিছু কিছু দেওয়ালচিত্র মধ্য-এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ইয়োরোপের নানা মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভালো সংগ্রহ ছিল বার্লিনে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এগুলি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কোনো বড় যুদ্ধের ব্যয়ের মতোই প্রচুর হয়েছিল। তবে ' া সত্ত্বেও ভূমি থেকে ওঠা মন্দিরের চেয়ে পাহাড়কাটা মন্দিরের ব্যয় কম ছিল। এই কারণেই হয়তো পাহাড়কাটা মন্দির বেশি জনপ্রিয় ছিল।

অইহোলে, বাদামী, কাঞ্চীপুরম ও মহাবলীপুরমের ভূমি থেকে ওঠা মন্দিরগুলিতে অবশ্য পাহারকাটা মন্দিরের চেয়ে বেশি স্থাপত্যকলা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্যের সঙ্গে গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের সাদৃশ্য আছে। পল্লবযুগের ভাস্কর্যে বৌদ্ধরীতির প্রভাব আছে। সেগুলির দৈর্ঘ্য বেশি ও অলংকারের বাহুল্য বর্জিত। প্রভাব সত্ত্বেও দক্ষিন-ভারতের স্থাপত্যকে উত্তর-ভারতের স্থাপত্যের অনুকরণ বললে ভুল হবে। এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। কেবল স্থাপত্যের মূলভিত্তি পুরনো রীতিনির্ভর ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ মন্দিরের মধ্যে স্থানীয় স্থাপত্যরীতির সৃষ্টিশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই পরিবর্তনগুলি ছিল এই যুগের উপদ্বীপ অঞ্চলের, বিশেষ করে সুদূর দক্ষিণেরই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণের সাংস্কৃতিক চেহারা আর্য ও দ্রাবিড় রীতির সংমিশ্রণে স্পষ্টরূপ নেবার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঘটল আরো পরিবর্তন। ভারতীয় সংস্কৃতি এর আগেও নানা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এবার যোগ হল দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রভাব। এই পর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে এবার সমগ্র উপমহাদেশকেই ভেবে নেওয়া হয়, কারণ দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রকৃত যোগাযোগ এই সময়েই আরো নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল। শঙ্করাচার্য্যের ভাবধারার দ্রুত প্রসার থেকে এই কথাই প্রতিপন্ন হয়। একথা বোঝা যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান থেকেও। অবশ্য ভক্তিবাদের প্রকাশ শুধু সেই যুগেই ঘটেনি, একথাও ঠিক যে এর সূচনা তামিল ভক্তিরীতির `উপাসনা থেকে। তবু এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এর অভ্যুত্থান থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত কিছু কিছু সাধারণ সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে শুরু করেছিল।

৯

দাক্ষিণাত্যের উত্থান

আনুমানিক ৯০০—১৩০০ খ্রীস্টাব্দ

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের এই ধারা চলেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে চোলরা প্রাধান্যলাভ করলেও প্রতিবেশি রাজ্যগুলি সবসময়ই তাদের বিব্রত রেখেছে। পল্লবরাজারা নবম শতাব্দীতে তাদের রাজ্যের দক্ষিণদিকের প্রতিবেশী পাণ্ড্যরাজ্য ও অধীনস্থ চোলদের আক্রমণে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে। ৩০০ বছর ধরে পল্লবরা চোলরাজ্যের সামন্তরাজা হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজার রাখার পরে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। এই ৩০০ বছর ধরে চোলরা ক্রমাগত যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। চোলদের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ক্ষীয়মাণ রাষ্ট্রকূট বংশ এবং তারপর তাদের জায়গায় পুনরুজ্জীবিত চালুক্য বংশ। এই চালুক্যরা 'পরবর্তী চালুক্য' হিসেবে পরিচিত ও এদের রাজ্য ছিল পশ্চিম-দাক্ষিনাত্যে। এই যুগের দক্ষিণ-ভারত সমক্ষমতাসম্পন্ন বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং একসময়ে এদের সকলের সঙ্গেই চোলরাজ্যের যুদ্ধ চলছিল। চোলদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল 'পরবর্তী চালুক্যরা,' দেবগিরির (ঔরঙ্গাবাদ অঞ্চল) যাদবরা, ওয়ারঙ্গলের (অন্ধ্র) কাকতীয়রা ও দোরসমুদ্রের (মহীশূর) হোয়সলরা। রাজত্বের শেষদিকে হোয়সল ও পাণ্ড্যদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে চোলরা হতশক্তি হয়ে পড়ল।

কেবলমাত্র চোলরাজবংশের পরাক্রমই দাক্ষিণাত্যের উত্থানের একমাত্র কারণ নয়। এই সময়ে তামিল সংস্কৃতি দানা বেঁধে উঠেছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম বা শিল্পকলায় এযুগে যে উন্নতি হল, তাকে ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই যুগের রীতিনীতি পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যের জীবনরীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনও এনে দিয়েছিল (তবে পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে এই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি)। এই যুগেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চোল-সংস্কৃতির প্রসার হয়। এই অঞ্চলের রাজনীতিতে দক্ষিণ-ভারতের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ ও আগের যুগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে তামিলনাদে চোলরা গোষ্ঠীপতি হিসেবে শাসন করা শুরু করেছিল। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোল বংশের এক গোষ্ঠীপতি তাঞ্জোর অঞ্চল (তামিলনাড়ুর কেন্দ্রীয় অঞ্চল) অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন রাজা হিসেবে গ্রহন করেন। তিনি আপন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে নিজেকে সূর্যবংশজাত বলে দাবি করলেন। ৯০৭ খ্রীস্টাব্দের চোল বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য

রাজা প্রথম পরন্তক সিংহাসনে বসেন। তিনি পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে পাণ্ড্যদের রাজধানী মাদুরা অধিকার করে নিজের রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তকে সুরক্ষিত করলেন। পাণ্ড্যদের সঙ্গে সিংহলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং পাণ্ড্যদের পরাজয়ের ফলে সিংহল ও তামিলনাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হল তা কয়েক দশক ধরে চলেছিল। পরন্তকের রাজত্বকালের শেষদিকে রাষ্ট্রকূটদের হাতে চোলরা পরাস্ত হয় এবং চোলরাজ্যের উত্তরাংশের কয়েকটি জেলা রাষ্ট্রকূটরা দখল করে নেয়। এরপর ৩০ বছর ধরে কয়েকজন দুর্বল রাজার রাজত্বে চোলরা হতশক্তি হয়ে পড়ল। কিন্তু ওদিকে রাষ্ট্রকূটরা চালুক্যদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়ল এবং এই সুযোগে হৃত অঞ্চলগুলি চোলরা পুনরুদ্ধার করল। রাজা প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রীস্টাব্দ) ও তাঁর ছেলে রাজেন্দ্রর ৫০ বছর যাবৎ রাজত্বকালে চোলরাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠল।

পিতাপুত্রের রাজত্বকালে নানাদিকে বহু যুদ্ধাভিযান ঘটেছিল। রাজরাজ আক্রমণ করলেন কেরল, সিংহল ও পাণ্ড্যরাজ্যের সম্মিলিত শক্তিকে। এই তিনটি রাজ্য পশ্চিম জগতের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। আরবরা ততদিনে পশ্চিম-উপকূলের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেরলের রাজারা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে আরবদের প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার জন্যে চোলরা মালাবারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিল। পরে রাজরাজ আরব-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র মালদ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে নৌ-আক্রমণ চালান। আরব ব্যবসায়ীদের একেবারে উৎখাত করতে না পারলেও সিংহলে চোলরা বিধ্বংসী আক্রমণ চালিয়েছিল। রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস করে চোলরা পোলন্নারুবা-য় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করল। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল। বেঙ্গি ছিল একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ। আগের যুগে বেঙ্গির দখল নিয়ে পল্লব ও চালুক্যদের যুদ্ধ হয়েছিল। পরের যুগে আবার যুদ্ধ বাধল 'পরবর্তী' চালুক্য ও চোলদের মধ্যে।

প্রথম রাজেন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গে যৌথভাবে দুবছর রাজত্ব করার পর ১০১৪ খ্রীস্টাব্দে নিজেই সিংহাসনে বসেন। তিনি চালুক্যদের রাজ্যের দক্ষিণাংশ (আধুনিক হায়দ্রাবাদ অঞ্চল) দখল করে রাজ্যবিস্তার অভিযান অক্ষুণ্ণ রাখলেন। সিংহল ও কেরলের বিরুদ্ধেও আবার অভিযান শুরু হল। এরপর রাজেন্দ্র উত্তর-ভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকা জয় করার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর সেনাবাহিনী উড়িষ্যা অতিক্রম করে গঙ্গার তীরে গিয়ে পৌঁছল। গঙ্গার পবিত্র জল রাজধানীতে নিয়ে আসা হল। কিন্তু রাজেন্দ্র উত্তর-ভারতীয় অঞ্চলগুলি বেশিদিন অধিকারে রাখতে পারেন নি। এদিক দিয়ে প্রায় ৭০০ বছর আগে সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সঙ্গে রাজেন্দ্রর উত্তর-ভারত অভিযান তুলনীয়।

এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রীবিজয় রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। বলা হয়, রাজেন্দ্র বিদেশেও সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু একথা সত্যি হলে এই অভিযানের পর সেখানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করা হতো এবং উপকূল থেকে অভ্যন্তরে আরো অঞ্চল জয় করার প্রচেষ্টা হতো। যেহেতু তেমন কিছুই করা হয় নি, সেজন্যে মনে

হয়, ভারতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্যেই যুদ্ধ চালানো হয়। দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারত ও চীনের মধ্যে রীতিমতো বাণিজ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি শ্রীবিজয় রাজ্যের (দক্ষিণ-মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা) সংলগ্ন সমুদ্রপথ দিয়ে চীনে যেত। শ্রীবিজয় রাজ্য বুঝতে পারে যে, ভারতীয় জাহাজের পণ্যসামগ্রী তাদের রাজ্যে নামিয়ে নিয়ে যদি শ্রীবিজয়ের ব্যবসায়ীরা ওই পণ্য চীনে নিয়ে যায়, তাদের পক্ষে তা খুবই লাভজনক হবে। এরপর শ্রীবিজয়ে ভারতীয় বণিকদের নানাভাবে ভয় দেখানো হতে লাগল। এই অবস্থা দেখে চোল-রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এই বাণিজ্যে তাঁদেরও অংশ ছিল বলে মনে হয়। এর-পরই চোলরা শ্রীবিজয় আক্রমণ করল। শ্রীবিজয় রাজ্য নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যেই চীন-ভারত বাণিজ্যে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সামরিক শক্তি দিয়েই এই বিবাদের শেষ মীমাংসা হয়। চোলদের অভিযানের ফলে মালাক্কা প্রণালীর কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান চোলদের অধিকারে এলো। এইভাবে অন্তত কিছুদিনের জন্যে শ্রীবিজয় রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাহাজ নিরাপদে চীনে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল।

প্রথম রাজেন্দ্রের পরবর্তী রাজারা ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। বেঙ্গি প্রদেশ নিয়ে চালুক্যদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু হল। দুই রাজ্য একে অপরের ওপর বিদ্যুৎগতি আক্রমণ করে এলাকা দখল করার চেষ্টা করতে লাগল। এরকম একটি আক্রমণের দ্বারা চোলরা কল্যাণীতে চালুক্য রাজধানী লুণ্ঠন করে নিল। আবার, ১০৫০ খ্রীস্টাব্দে চালুক্যরাজা এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। চোলরাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকালে (১০৭০-১১১৮ খ্রীস্টাব্দে) দুই রাজ্যের সংঘর্ষ তত তীব্র রইল না। এর কারণ হল, রাজার মা ছিলেন চালুক্য বংশজাত। এবং এর ফলে দুই রাজ্যের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। দক্ষিণের পুরনো শত্রু পাণ্ড্য, কেরল ও সিংহলের সঙ্গে যুদ্ধে জারি রইল। শ্রীবিজয় রাজেন্দ্রের হাতে পরা-জয়ের আঘাতে তখনো ম্রিয়মাণ ছিল। সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ফলে দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটে। চীনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হল। রাজা কুলোত্তুঙ্গ ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে চীনে ৭২ জন ব্যবসায়ীর এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে-ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে চোলদের গৌরবের দিনের সমাপ্তির সূচনা হল। প্রতি-বেশীরা চোলরাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি দখল করে নিতে লাগল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সামন্ত রাজারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে চোল রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ছিল। প্রকৃতপক্ষে চোলরা নিজেদের আধি-পত্য বিস্তার করতে গিয়ে নিজেদের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এছাড়া চালুক্যদের শক্তি খর্ব করার ফলে চালুক্য রাজ্যের সামন্ত রাজারা শক্তিশালী হয়ে উঠল। তাঁরা এবার নিজস্ব রাজ্য স্থাপন করে চোলদের পাল্টা আক্রমণ করল।

এবার সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল যাদব, হোয়সল ও কাকতীয়রা। যাদবরা ছিল দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে এবং চোলদের পতনের মূলে এদের ভূমিকা সামান্যই।

হোয়সল ও কাকতীয়রা দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কাকতীয়রা চালুক্যদের কাছ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা আদায় করেছিল। চোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া এরা নিজেদের স্বাধীনতা ভোগেই ব্যাপৃত ছিল। হোয়সলরা পশ্চিম দিক থেকে চোলদের আক্রমণ করল। কিন্তু চোলরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের পুরনো শত্রু পাণ্ড্যরা এই সুযোগে আবার যুদ্ধ শুরু করল। ফলে, চোলরা একই সঙ্গে রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

হোয়সলদের উত্থানের সঙ্গে এই যুগ ও পরবর্তী যুগের দাক্ষিণাত্যের আরো কয়েকটি রাজবংশের উত্থানের মিল আছে। হোয়সল বংশ ছিল পার্বত্য উপজাতি-ভুক্ত। দস্যুতা করে এরা অর্থোপার্জন করত। ওই পার্বত্য অঞ্চলে দস্যুতার যথেষ্ট সুযোগও ছিল। বিভিন্ন রাজবংশের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে উপজাতীয়রা নিজেদের একজন উপযুক্ত নেতার প্রয়োজন অনুভব করছিল। এদের সাহায্যেই হোয়সলরা পাহাড় থেকে সমভূমিতে নেমে আসতে থাকে। এখানে নিয়মিত কর আদায় করেও তাদের ভালো অর্থাগম হচ্ছিল। উপজাতীয়দের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সমভূমির মানুষ তাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল। করপ্রদান থেকে রাজনৈতিক আনুগত্য সৃষ্টি হল এবং এইভাবে পার্বত্য উপজাতীয় নেতারা ছোট ছোট রাজ্যের রাজা হয়ে বসল। তবে এরকম সবকটি রাজবংশ বেশিদিন টেঁকেনি। প্রতিবেশী বৃহৎ রাজ্যগুলি এদের অধিকার করে নেবার চেষ্টা করত। তা সত্ত্বেও যারা টিকে গেল তারা পরে আরো শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হল।

হোয়সলদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন বিষ্ণুবর্ধন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করেন। তখন অবশ্য তত্ত্বগতভাবে হোয়সলরা চালুক্যদের সামন্তরাজা। হোয়সল রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল মহীশূরের কাছে দোরসমুদ্র। বিষ্ণুবর্ধন ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলেন। ইনি আর একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজের প্রভাবে বিষ্ণুবর্ধন জৈনধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণুবর্ধনের পৌত্র রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সময় পর্যন্ত হোয়সল রাজ্যের প্রসারের কাজ চলছিল। এইভাবেই হোয়সলরা দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণাংশ নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। কিন্তু উত্তরদিকে রাজ্য সম্প্রসারণ করতে গিয়ে দেবগিরির যাদবদের কাছ থেকে বাধা এলো। যাদবরাও চালুক্যরাজ্যের কিছু অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাজ্য সম্প্রসারণ করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা অল্পকালের জন্যে গুজরাটও অধিকার করেছিল। যাদব ও হোয়সল রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল। তারপর উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দিল্লীর তুর্কী সুলতানরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ শুরু করলে এইসব রাজবংশের পতন হয়, নতুন নতুন রাজ্য ও রাজবংশের সূচনা হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ তামিলনাদ অঞ্চলে চোলদের জায়গায় পাণ্ড্যরা বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ তখন দিল্লীর সুলতানদের দখলে। সুলতানী হস্তক্ষেপ না ঘটলে পাণ্ড্যরা হয়তো আরো অনেকদিন রাজত্ব করে যেতে পারত। তারপর পাণ্ড্যরা এই অঞ্চলের পরিবর্তনশীল শাসকবৃন্দের অধীনে আঞ্চলিক

নেতা ও সামন্ত রাজায় পরিণত হল। মার্কোপোলো ১২৮৮ ও ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ্যে এসে সেখানকার ভূমিসম্পদ ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা লিখে রেখে গেছেন।

বিপরীত উপকূল অঞ্চল, অর্থাৎ কেরলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত ছিল। চের রাজ্যের সঙ্গে চোলদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ এবং মাঝে মাঝে শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেও চের রাজাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। একমাত্র রাজা রবিবর্মণ কুলশেখর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজ্যবিস্তারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। মালাবার উপকূলে কৃষি উৎপাদন ভালোই হতো ও পশ্চিমী বাণিজ্য থেকেও যথেষ্ট অর্থাগম হতো। তাই, রাজ্যবিস্তারের কোনো অর্থনৈতিক প্রয়োজনও ছিল না। দশম শতাব্দীতে সেমিটিক জাতীয় আর একদল লোক ভারতে এসেছিল। চের রাজা এক ভূমিদানপত্রের মাধ্যমে জোসেফ রব্বানকে কিছু জমি দান করেন। ভারতে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের এটিই প্রথম নজির। তবে, বলা হয় কোচিনে নাকি প্রথম শতাব্দীতেই একদল ইহুদি বসতিস্থাপন করেছিল। ত্রিবাঙ্কুরের ইহুদিরা, অর্থাৎ জোসেফ রব্বনের বংশধররা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল নিজেদের আলাদা রেখে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম মেনে চললো। অন্যদল স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে গিয়েও নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করত।

দাক্ষিণাত্যে অনেক রাজবংশের অস্তিত্বের ফলে এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসনের কোনো সুযোগ ছিল না। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব বা হোয়সলদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হতে দেয়নি। একমাত্র চোলরাই সামন্ত রাজাদের কিছুটা বশে আনতে পেরেছিল। কেবল চোলদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কৃষকদের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক বজায় ছিল এবং কেন্দ্রীয় শাসনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যেত। চোলরাজা প্রথম রাজরাজের রাজনৈতিক মর্যাদার সঙ্গে রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষ বা হোয়সল রাজা বিষ্ণুবর্ধনের মর্যাদার পার্থক্য ছিল। গোড়ার দিকের চোলরাজারা উপাধি নিয়ে তত মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু পরবর্তী রাজারা বড় বড় উপাধি (যেমন— চক্রবর্তীগল অর্থাৎ সম্রাট, উত্তর-ভারতের চক্রবর্তিন্ উপাধির সঙ্গে সমার্থক) গ্রহণ শুরু করলেন। রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করাও শুরু হল। মৃত রাজাদের স্মরণে মন্দির তৈরি করা হল। রাজপ্রাসাদে বিলাসের অন্ত ছিল না এবং রাজকীয় দানও ছিল প্রচুর। উত্তর-ভারতে রাজপুরোহিতের যে ভূমিকা ছিল, চোলরাজ্যে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল। চোলদের রাজগুরু পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরামর্শদাতা তো ছিলেনই, তাছাড়াও গোপন ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হতে লাগল। এছাড়া, কিছু কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পরিষদও রাজাকে পরামর্শ দিতেন। তবে স্থায়ী মন্ত্রিসভার কথা শোনা যায় নি।

সুসংহত রাজকর্মচারী-সংগঠনের হাতে শাসনের দায়িত্ব ছিল। কর্মচারীদের নিয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে, উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে হয়তো কোনো পার্থক্য ছিল না। সেখানে বংশ, বর্ণ, যোগাযোগ ও অন্যান্য গুণের

কথা বিবেচনা করা হতো। রাজা প্রথমে মৌখিক আদেশ দিতেন এবং পরে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে ওই আদেশে কর্মচারীদেরও স্বাক্ষর থাকত। চোলরাজ্য কয়েকটি প্রদেশে (মণ্ডলম্) বিভক্ত ছিল। প্রদেশের সংখ্যা ছিল আট বা নয়। প্রত্যেকটি মণ্ডলম্ জেলা বা বলনাড়ুতে বিভক্ত ছিল। সেগুলির মধ্যে থাকত কয়েকটি করে গ্রামের সমষ্টি। সেগুলিকে বলা হতো কুরম। নাড়ু বা কোট্টম। অনেক সময় খুব বড় গ্রামকে আলাদা করে শাসন করা হতো। এরকম গ্রামকে বলা হতো তানিয়ুর।

শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম এবং এই ব্যাপারে চোল ও গুপ্ত শাসন-পদ্ধতির কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে গ্রামশাসনের ব্যাপারে চোলদের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। গ্রামগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হতো। চোল রাজকর্মচারীরা গ্রামের শাসনব্যবস্থায় শাসকের পরিবর্তে পরামর্শদাতার ভূমিকা নিত। এই কারণে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব গ্রামে বেশি পড়ত না এবং গ্রামগুলি অব্যাহত গতিতে উন্নতিলাভ করছিল। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তামিলনাদে যে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তার মূলেও হয়তো রয়েছে চোলদের গ্রামশাসন পদ্ধতি।

গ্রামশাসনে এই স্বাধীনতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যে গ্রামবাসীরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে গ্রামের শাসনকাজ চালাবে। এইজন্যে একটি গ্রামপরিষদ গঠন করা হতো এবং পরিষদের হাতেই শাসনভার থাকত। বড় গ্রামে শাসনব্যবস্থা আর একটু জটিল হতো এবং সেখানে শাসন পরিচালনার জন্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকত। গ্রামবাসীরা প্রয়োজন অনুসারে দুই বা ততোধিক পরিষদের সভ্য হতে পারত। গ্রামগুলি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত থাকত এবং পাড়াগুলির নিজস্ব পরিষদ থাকত। এই পরিষদের সভ্যদের মধ্যে পেশাদার কারিগর, যেমন ছুতোর বা কামারদের প্রতিনিধিও থাকত। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গ্রামের সমাজজীবনের মূলভিত্তি। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী নিয়েই গ্রামের মূল পরিষদ গঠিত হতো।

সাধারণ পরিষদগুলিতে অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসীই সদস্য হতে পারত। পরিষদ ছিল তিন ধরনের : ক. যেসব গ্রামবাসী কর দিত তাদের সভার নাম ছিল 'উর' ; খ. গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিয়ে অথবা ব্রাহ্মণদের জন্যে দানকরা গ্রামগুলিতে যে পরিষদ থাকত, তার নাম ছিল 'সভা' ; গ. এছাড়া ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে যে পরিষদ থাকত, তার নাম ছিল 'নগরম'। কোনো কোনো গ্রামে উর ও সভা দুইই থাকত। বড় গ্রামে কাজের সুবিধের জন্যে প্রয়োজন মতো দুটি উরও থাকত।

স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে এই পরিষদগুলির কাজকর্মও বিভিন্ন রকম হতো। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ উর-এর সভ্য ছিল, তবে প্রবীণরাই প্রধানত কাজ চালাতেন। নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে প্রবীণরা অনেক সময় কার্যকরী সমিতি গঠন করে নিতেন। সভার ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া, সভার ক্ষমতা ছিল বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে সমিতি গঠন করে দেবার। সভায় সভ্য নির্বাচনের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে লটারি হতো।

সভার কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় উত্তর-মেরুর গ্রামের মন্দির-গাত্রের লেখা থেকে। এই গ্রামটি কেবল ব্রাহ্মণে অধ্যুষিত ছিল। এই দেওয়াল-লিপিটি দশম শতাব্দীর। লেখা আছে :

"...তিরিশটি পাড়া থাকবে।

এই তিরিশটি পাড়ার অধিবাসীরা মিলিত হয়ে লটারি-দ্বারা নির্বাচনের জন্যে একজন করে প্রার্থী স্থির করবেন। প্রার্থীর গুণাবলী হবে—

তিনি করদায়ী জমির এক-চতুর্থাংশের বেশির অধিকারী হবেন। তিনি নিজের জমির ওপর নির্মিত বাসগৃহের অধিবাসী হবেন। তিনি ৭০-এর কম ও ৩৫-এর বেশি বয়স্ক হবেন। তিনি মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবেন। প্রার্থীর যদি মাত্র এক-অষ্টমাংশ জমি থাকে, কিন্তু তাঁর যদি অন্তত একটি বেদ ও চারটির একটি ভাষ্যে পাণ্ডিত্য থাকে, তাঁকে নির্বাচনের জন্যে বিবেচনা করা হবে। যাঁদের এইসব গুণাবলী আছে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও যাঁদের নৈতিক চরিত্র উত্তম, তাঁদের বিবেচনা করা হবে। যাঁরা সৎপথে উপার্জন করেছেন, মন পবিত্র এবং গত তিন বছরে কোনো পরিষদের সদস্য ছিলেন না, তাঁদেরও গ্রহণ করা হবে। যাঁরা পরিষদের সদস্য ছিলেন, কিন্তু আয়ব্যয়ের হিসেব দাখিল করেন নি, তাঁরা এবং তাঁদের নিম্নলিখিত আত্মীয়-স্বজনরা প্রার্থী হতে পারবেন না :—

মায়ের বড় বোন ও ছোট বোনের পুত্ররা ;
বাবার বোন ও মায়ের ভাইয়ের পুত্ররা ;
মায়ের সহোদর ভাই ;
বাবার সহোদর ভাই ;
নিজের সহোদর ভাই ;
নিজের শ্বশুর ; স্ত্রীর ভাই ; সহোদর ;
সহোদর বোনের স্বামী ;
সহোদর বোনের পুত্র ;
নিজের জামাতা ;
নিজের পিতা ; নিজের পুত্র।

যাঁর বিরুদ্ধে অনাচার বা পাঁচটি প্রধান পাপের প্রথম চারটি পাপের অভিযোগ থাকবে, তারাও প্রার্থী হতে পারবেন না। (পাঁচটি প্রধান পাপ হল— ব্রাহ্মণ-হত্যা, মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার ও অপরাধীদের সঙ্গে সংসর্গ)—তাঁর উপরিউক্ত আত্মীয়রাও লটারির জন্যে প্রার্থী হতে পারবেন না। যিনি অস্পৃশ্যদের সংস্পর্শে এসেছেন বা নিম্নবর্ণের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত তাঁর নামও বিবেচিত হবে না।

এছাড়াও যিনি হঠকারী ··· যিনি অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন ... যিনি নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করেছেন, যিনি পাপকাজের জন্যে শুদ্ধি অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়েছেন···

এই সমস্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত আর সকল প্রার্থীর নাম ৩০টি পাড়ায় নির্বাচনের জন্যে লটারির কাগজে লেখা হবে। প্রত্যেক পাড়ার জন্যে প্রার্থীদের নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গুচ্ছ করে নিতে হবে। গুচ্ছগুলি একটি পাত্রে রাখা হবে। লটারির কাগজ তোলার সময় বৃহৎসভার সমস্ত বৃদ্ধ ও তরুণ সদস্যকে ডাকা প্রয়োজন। মন্দিরের যেসব পুরোহিত সেদিন গ্রামে উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা সকলেই পরিষদের ভেতরের কক্ষে আসন নেবেন। প্রবীণতম পুরোহিত কাগজভর্তি পাত্রটি তুলে ধরে সকলকে দেখিয়ে দেবেন। এরপর একটি ছোট ছেলেকে বলা হবে এক-একটি কাগজের গুচ্ছ তুলে অন্য একটি শূন্যপাত্রে রাখতে। কাগজের টুকরোগুলি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এইবার পাত্রটি থেকে একটি কাগজের টুকরো তুলে নিতে হবে। কাগজের টুকরোয় লেখা নামটি প্রত্যেক পুরোহিত পড়ে শোনাবেন। এই নামটিই গ্রহণ করা হবে। এইভাবেই ৩০টি পাড়ার প্রতিনিধি নির্বাচন চলবে।

নির্বাচিত ৩০ জন সভ্যের মধ্যে যাঁরা ইতিপূর্বে উদ্যান-সমিতি ও পুষ্করিণী-সমিতিতে ছিলেন, যাঁরা বয়সে প্রবীণ ও যাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁদের বাৎসরিক সমিতিতে মনোনীত করা হবে। অবশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ১২ জনকে উদ্যানসমিতি ও ৬ জনকে পুষ্করিণী-সমিতিতে নেওয়া হবে। এই ৩টি সমিতির প্রধান ব্যক্তিরা ৩৬০ দিনের জন্যে কার্যভার নেবেন ও তারপরে অবসর গ্রহণ করবেন। কোনো সভ্য কোনো অপরাধ করলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ অপসারণ করা হবে। এঁরা অবসর গ্রহণের পর নতুন সমিতি গঠনের জন্যে ১২টি রাস্তার 'ন্যায়রক্ষা সমিতি' মধ্যস্থের সাহায্যে আবার সভার অধিবেশন ডাকবেন। সেখানে লটারির সাহায্যে আবার নতুন সমিতি নির্বাচিত হবে।···

স্বর্ণসমিতি ও পঞ্চমুখী সমিতির জন্যে আগের পদ্ধতিতেই ৩০টি পাড়ায় লটারি হবে। যে ব্যক্তিকে গাধার পিঠে চড়ানো হয়েছে (অর্থাৎ শাস্তি দেওয়া হয়েছে), বা যে কখনো জাল জুয়াচুরি করেছে তাকে নির্বাচন করা হবে না।

গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসেব লেখার দায়িত্ব দিতে হবে এমন একজনকে, যিনি সৎপথে উপার্জন করেন। তিনি যতদিন না প্রধান সমিতির কর্মকর্তাদের কাছে হিসাব দাখিল করছেন এবং তাদের হিসেব ত্রুটিহীন বলে গৃহীত হচ্ছে, ততদিন হিসেবের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে নতুন কোনো হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করা হবে না। হিসাবরক্ষক হিসেব মেটানোর আগে অন্য কাউকে হিসেব শেষ করার ভার দিয়ে চলে যেতে পারবেন না। যতদিন চন্দ্রসূর্য আছে, ততদিন এইভাবেই সমিতির নির্বাচন চলতে থাকবে।··· আমরা উত্তর-মেরুর সভা আমাদের গ্রামের মঙ্গলের জন্যে, অর্থাৎ দুষ্টলোকের শাস্তি ও অন্যান্যদের উন্নতির জন্যে এইসব কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আমি, কণ্ডাত্তিপোত্তন শিবাক্কুরি রাজমল্লমঙ্গল-প্রিয়ন পরিষদের কর্মসমিতির আদেশে এই বিবরণী লিপিবদ্ধ করলাম।"[১]

অন্যান্য লিপির মধ্যেও একই ধরনের বিবরণ পাওয়া গেছে। তবে, প্রার্থীর গুণাবলী ইত্যাদি বিষয়ে এবং খরচের বরাদ্দ মঞ্জুর করার নিয়মে পার্থক্য আছে। ঢোল বাজিয়ে অধিবেশন আহ্বান করা হতো মন্দির সংলগ্ন জমিতে। গ্রামসভাগুলির

মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিরল ছিল না।

সরকারি কর ইত্যাদি নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল গ্রাম-পরিষদের ওপর। তাছাড়া, কোনো বিশেষ কাজের জন্যে পরিষদ আলাদা খাজনা আদায় করতে পারত : যেমন, পুষ্করিণী খনন। রাজকোষে দেয় করের সঙ্গে এইরকম বিশেষ খাজনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। পরিষদের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল দান ও কর সংক্রান্ত নথিপত্র রাখা, ও চাষ ও জলসেচ সম্পর্কিত বিবাদের নিষ্পত্তি করা। বৃহৎ সভাগুলি কর্মচারী নিযুক্ত করত। তবে ছোট গ্রামে গ্রামবাসীরা বিনা বেতনেই সভার কাজ করে দিত।

সভাগুলি থাকা সত্ত্বেও রাজা ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে রাজ-কর্মচারী ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমেরও প্রয়োজন হতো। চোলরাজাদের অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন, যেমন পল্লবদের প্রধানরা এবং অন্যান্য ছোটখাটো শাসনকর্তারা। কিন্তু রাজা ও সামন্তরাজার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গ্রাম পরিষদ মাথা ঘামাতো না। গ্রামগুলির স্বাধীনতা এত বেশি ছিল যে, শাসনব্যবস্থা বা রাজনৈতিক পরিবর্তন গ্রামের প্রাত্যহিক জীবনে কোনো প্রভাব ফেলত না। গ্রামের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। সামন্তরাজারা কর আদায় করে রাজাকে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে দিত সভা পরিষদ। চোলরাজ্যেই এই প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র বা উত্তর-ভারতে সামন্তরাজাদের মর্যাদার উন্নতি হয়েছিল। তাঁরা কেবল রাজার কর আদায়ই করতেন না, রাজার সঙ্গে একটা চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কও থাকত যাতে সামন্তরাজাদের ক্ষমতাও নিতান্ত কম ছিল না। (এ বিষয়ে অন্য এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।)

প্রজাস্বত্ব ছিল প্রধানত দুই ধরনের। জমির সমবেত মালিকানার ব্যবস্থা ছিল। সেক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে গোটা গ্রামের হিসেবে কর দিত। অথবা, কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে খাজনা দিত। কৃষকরা রাজকর্মচারীদের কাছে বা মন্দিরে কর জমা দিত। খাজনার পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত থাকত। উদ্বৃত্ত অংশ কৃষক নিজে ভোগ করত। শ্রমের বিনিময়ে ঋণশোধের প্রথাও চালু ছিল। তবে এ প্রথার প্রচলন ছিল সীমিত— যেমন, করের পরিবর্তে মন্দিরে বিগ্রহ স্নানের জন্যে নিয়মিত জল এনে দেওয়া। পরে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পরিবর্তে কর মকুবের প্রথা শুরু হয়েছিল। যেখানে জমি দখলের অধিকারের প্রশ্ন উঠত, সেখানে 'ব্রহ্মদেয়' ও 'দেবদেয়' জমির ভূস্বামীকে সাধারণ ভূস্বামীর মতোই ধরা হতো ; তাদের অতিরিক্ত সুবিধে দেওয়া হতো না।

পল্লবযুগের সময় থেকে 'ব্রহ্মদেয়' দানের রীতি অপরিবর্তিত ছিল। যেমন, চোলদের সময়ে 'সুন্দর চোল' ব্রাহ্মণ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মাধিরাজকে কিছু জমি দান করতে গিয়ে 'অনাবিল দানপত্রে' লিখেছিলেন :

> ···আমরা জমির সীমানা নির্ধারণের জন্যে মাটি উঁচু করে রেখে তার ওপর নাগফণী গাছ লাগিয়েছিলাম। এই জমির অন্তর্গত ছিল ফলের গাছ, জল, বাগান, উঁচু গাছ, গভীর কুয়ো, খোলাজমি, বাছুর চরানোর জমি, উইটিবি, গাছের

চারিদিকের বেদী, খাল, নদী ও তার জমা পলি, পুকুর, শস্যভাণ্ডার, মাছের পুকুর, মৌচাক ; এবং অন্য সময় কিছু যার ওপর গিরগিটি এবং কচ্ছপ চলে ; বিচারালয় থেকে পাওয়া অর্থ, পানের ওপর ও তাঁতে বোনা কাপড়ের ওপর কর··· সমস্ত কিছু যা রাজা ইচ্ছে করলে ভোগ করতে পারতেন, তা এই ব্যক্তিকে দেওয়া হল। ইনি স্বেচ্ছায় পোড়া ইটের তৈরি বহুতল বাসগৃহ তৈরি করতে পারবেন। ছোট ও বড় কুয়ো খনন ও নাগফণী ইত্যাদি গাছ বপন করতে পারবেন। সেচের প্রয়োজনমতো খাল খনন করতে পারবেন, জল নষ্ট না করে বাঁধ তৈরি করবেন। এঁর জমি থেকে কেউ সেচের জল পাত্র করে নিয়ে যেতে পারবে না। এইভাবে পুরানো আদেশ পরিবর্তন করে পুরানো নাম ও কর অপসারণ করে করুণাকরমঙ্গলম নামে 'একভোগ ব্রহ্মদেয়' (একজন ব্রাহ্মণকে জমিদান) তৈরি করা হল।[২]

জমির স্বত্বাধিকারী ও করদাতাদের সঙ্গে সাধারণ চাষী যারা অর্থের বিনিময়ে জমিতে কাজ করত, তাদের প্রচুর পার্থক্য ছিল। সাধারণ চাষী গ্রামসভার সভ্য হতে পারত না এবং স্থানীয় শাসনেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদলাভ করতে পারত না। ভূমিহীন কৃষকের অবস্থা ছিল প্রায় কৃতদাসের মতো এবং তাদের জীবনেও উন্নতিরও কোনো আশা ছিল না। এদের মধ্যে অনেকে নিম্নবর্ণের ছিল। তারা মন্দিরের বাইরের নানাকাজে নিযুক্ত হতো, কিন্তু মন্দিরের ঢোকার অনুমতি ছিল না।

কৃষক শ্রমজীবীদের একটা প্রধান কাজ ছিল পতিতজমি পুনরুদ্ধার ও জঙ্গল পরিষ্কার করা। সরকারও এই কাজে উৎসাহ দিতেন, কারণ বেশি জমিতে চাষ হলে রাজকোষেও অর্থাগম বাড়বে। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য জায়গায় গোপালন তখন নিয়মিত পেশা হয়ে উঠেছিল। বছরে দুই বা তিনবার ধানের উৎপাদন স্বাভাবিক বলে গণ্য হতো। তবে উৎপাদন সব জমিতে একরকম ছিল না। জলসেচের ওপর জমির উৎপাদন ও মূল্য নির্ভর করত। চোলরাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর। কখনো টাকায় কখনো দ্রব্যে এই কর আদায় হতো। এছাড়া আরো কর বসানো হতো, খনি, জঙ্গল, নুন ও কারিগরি পেশার ওপর। বিচারের জরিমানা ও বাণিজ্যশুল্ক থেকেও অর্থাগম হতো। কখনো অর্থের পরিবর্তে কায়িকশ্রম ('ভেত্তি') দান করতে হতো। ভূমিকর ছিল খুব বেশি— উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ। বিশেষ কোনো পরিস্থিতি ঘটলে অবশ্য রাজা ভূমিকর মকুব করে দিতেন।

করের হিসেবের জন্যে জমির মূল্যায়ন ও সীমা নির্ধারণ হতো বটে, কিন্তু তা সর্বত্র ঘটত না। ভূমিকর ছাড়াও গ্রামসভা ও মন্দিরগুলি কর আরোপ করত। সমগ্র করভার কৃষকের কাছে রীতিমতো বোঝা হয়ে উঠত বলেই মনে হয়। কর না দিয়ে কোনো অব্যাহতি ছিল না। রাজার কাছে কর মকুবের আবেদন করা, অথবা ওই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া— এছাড়া কৃষকের পক্ষে তৃতীয় গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু স্থান ত্যাগ করা সহজ ছিল না। করের ব্যাপারে যদি সমগ্র গ্রামকেই একক ধরে দেওয়া হতো, উৎপন্ন শস্যের হিসেব থেকে করমুক্ত জমির

উৎপাদন বাদ দেওয়া হতো। করমুক্ত জমির মধ্যে ছিল— বাসগৃহ, মন্দির, পুকুর, খাল, কারিগর ও অস্পৃশ্যদের বাসস্থান ও শ্মশান।

এই যুগে টাকা ও সম্পত্তি জমিয়ে রাখার প্রবণতা ছিল না। কারণ, অধিকাংশ গ্রামবাসীর সঞ্চয়যোগ্য অর্থই ছিল না। জমির ফসলের আয়ে একটি পরিবারের সারা বছরের খাদ্য বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই প্রায় হতো না। খাদ্য ছিল সাধারণ। প্রধানত ভাত ও তরকারী। মাংস ছিল রীতিমতো দামী খাদ্য। গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুর জন্যে বাড়ি তৈরির জন্যেও খরচ বেশি হতো না। তবে ধনী চাষীরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করত। পতিতজমি উদ্ধার বা সেচের খাল কাটার জন্যে অর্থ বিনিয়োগ করলে পরে সুবিধে হতো। এছাড়া মন্দির নির্মাণ বা মঠের সাহায্যের জন্যে অর্থদান করে ধনীরা পুণ্যার্জন করত।

এই যুগের প্রথমদিকে গ্রামগুলি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ছিল। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদিত হতো। কারিগররা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করত। উৎপাদনে উদ্বৃত্ত কমই হতো বলে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দেয় নি। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর পর থেকে দ্রুত নগর গড়ে ওঠার পর এই অবস্থার পরিবর্তন হল। চোলযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হল। শহরের জন্যে বাড়তি খাদ্যোৎপাদন প্রয়োজন হল এবং এইভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটল। এই কারণেই এ অঞ্চলের প্রাক্তন রাজবংশগুলির তুলনায় চোলদের আমলে অনেক বেশি মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল।

চোল ব্যবসায়ীরা বহির্বাণিজ্যের ওপর বেশি জোর দিত। পূর্ব-উপকূলের মহাবলীপুরম, কাবেরীপত্তনম, শালিয়ুর এবং কোরকাই বন্দর ও মালাবার উপকূলের কুইলনে বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। পশ্চিমী বাণিজ্যের লক্ষ্য ছিল পারস্য ও আরবদেশ। পারস্য উপসাগরে সিরাফ ছিল আমদানি-রপ্তানির একটি কেন্দ্র। এই যুগে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য খুবই বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে বাণিজ্যে চীন-সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে, কারণ চীন-সরকার চাইত না যে বাণিজ্য থেকে কোনো আয় তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মনে হয়, ফরমোজা দ্বীপের উল্টোদিকে মূলচীন ভূখণ্ডে একটি ভারতীয় বসতি ছিল। মধ্য-এশিয়া তখন মঙ্গোলদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় দক্ষিণ চীন থেকে এশিয়া ও ইউরোপের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যদ্রব্য যেত সমুদ্রপথ ধরে। দক্ষিণ-ভারত থেকে বস্ত্র, ওষুধ, দামী পাথর, হাতির দাঁত, শিং, আবলুস কাঠ ও কর্পূর চীনে রপ্তানি হতো। একই ধরনের জিনিস পশ্চিমী জগতের রপ্তানি হতো।

ওইযুগের সমস্ত পরিব্রাজকের মতো মার্কো পোলোও ভারতে প্রচুর ঘোড়া আমদানির কথা লিখেছেন। ঘোড়া বিক্রি করে আরবরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। আরবদের কাছ থেকে ঘোড়া কিনে দক্ষিণ-ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও এদেশে ঘোড়া বিক্রি করে প্রচুর অর্থলাভ করত। ভারতে কখনোই ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়নি এবং অনেক দাম দিয়ে ঘোড়া আমদানি করা হতো। মার্কো পোলো লিখেছেন :

…এই দেশে ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা নেই। সেজন্যে এদেশের সারা

বছরের আদায় করা রাজস্বের প্রায় সবটাই, অথবা একটা বড় অংশ ঘোড়া কিনতে ব্যয় হয়ে যায়। ব্যাপারটা কি হয়, আমি খুলে বলছি। হরমুজ, কাইস, ধোফার, শির ও এডেন— যেখানে যুদ্ধের ঘোড়া ও অন্যান্য ঘোড়া বেশি পাওয়া যায়, সেখানকার ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে ভালো ঘোড়াগুলি কিনে নিয়ে জাহাজভর্তি করে এই রাজা ও তাঁর আরো চার ভাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। কয়েকটি ঘোড়ার দাম ওঠে ৫০০ সোনার 'সাগ্গি'— যার মূল্য হল ১০০ রৌপ্য 'মার্কে'রও বেশি। আমি জোর করে বলতে পারি, এই রাজা বছরে ২ হাজার বা আরো বেশি ঘোড়া কেনেন। তাঁর ভাইয়েরাও সমান সংখ্যক ঘোড়া কেনেন। কিন্তু বছরের শেষে একশোর বেশি ঘোড়া টিঁকে থাকে না। ঘোড়াগুলির ঠিকমতো যত্ন না করার ফলেই তারা মারা পড়ে। এখানে কোনো পশু চিকিৎসক নেই ও কেউ ঘোড়ার চিকিৎসাও জানে না। আমি নিশ্চিত জানি, যেসব ব্যবসায়ীরা ঘোড়া রপ্তানি করে তারা কোনো পশু চিকিৎসককে পাঠায়ও না, আসতেও দেয় না। রাজার ঘোড়া যত বেশি মারা পড়ে, ব্যবসায়ীরা ততই খুশি হয়।[৩]

মার্কো পোলোর অতিরঞ্জনের প্রতি ঝোঁক থাকলেও এই বিবরণীতে খানিকটা সত্য অবশ্যই আছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশের মধ্যে উৎপাদনে উৎসাহের সৃষ্টি হল। সাধারণত স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুসারেই দ্রব্য উৎপাদন হতো। বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রব্যসামগ্রীর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা হতো। হাতি, ঘোড়া, মশলা, গন্ধদ্রব্য, দামী পাথর, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে প্রচুর ব্যবসা চলত। ধাতু-নির্মিত পাত্র, গহনা, চীনামাটির পাত্র ও নুনের ব্যবসা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগুলি। তার মধ্যে 'মনিগ্রামম' ও 'বলনজিয়ার'—এগুলি সুপরিচিত নাম ছিল। ওই যুগের অর্থনৈতিক জীবনে সংঘগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সংঘ গঠন করত। এরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল। উপমহাদেশের যে-কোনো প্রান্তেই এদের অবাধগতি ছিল। রাজনৈতিক সীমানা এদের গতিবিধির পক্ষে বাধ হয় নি।

স্থানীয় অধিবাসীদের সমবায় সংঘগুলিকে 'নগরম' নামে অভিহিত করা হতো। অধিকাংশ শহরেই এগুলি দেখা যেত এবং বড় সংঘগুলির সঙ্গে এরা সভা হিসেবে যুক্ত ছিল। সংঘগুলি উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন দ্রব্য কিনতে ও নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে ব্যবসায়ীরা সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। তবে প্রয়োজন হলে রাজ্যগুলি ব্যবসায়ী স্বার্থরক্ষার সাহায্য করত। এর উদাহরণ হল— শ্রীবিজয়। কিন্তু রাজকীয় হস্তক্ষেপের পেছনে কাঁচামাল বা উৎপাদিত মালের বাজার দখল করে নেবার কোনো উদ্দেশ্য থাকত না। অন্যদেশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত দিলে রাজারা সক্রিয় হয়ে উঠতেন। মনে হয়, রাজা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করতেন। অথবা, সংঘগুলি প্রয়োজনমতো বিশেষ বিশেষ উপহার সামগ্রী এনে দিত।

ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগুলি এত ধনী ছিল যে, তারা একটি গোটা গ্রাম কিনে

নিয়ে কোনো মন্দিরকে দান করে দিতে পারত। 'নানা দেশী' সমবায় সংঘের বহুবিভক্ত কার্যধারার অন্তর্গত ছিল দক্ষিণ-ভারত ও সুমাত্রা উভয় স্থানেই বাণিজ্য। আশ্চর্যের কথা এই যে, এত আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও সংঘগুলি আরো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেনি। সম্ভবত, সংঘ ও রাজার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। অনেক সংঘই বিদেশে বাণিজ্য করত ও চোলরাজাদের নৌবাহিনীর পরাক্রমের ওপর তাদের নির্ভর করতেই হতো। সংঘগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম ছিল না। রাজার রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগ্রহ ব্রাহ্মণদের ছিল না। কারণ, রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন ও ব্রাহ্মণদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে ভূমিদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আগের যুগেও বর্ণাশ্রমের ফলে সংঘগুলি কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে পরিগণিত হয়নি। তাছাড়া, রাজার সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রায় সকলেই এযুগে স্বীকার করে নিয়েছিল, এবং এই বিশ্বাসের মূল দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। রাজার ক্ষমতাকে আইনের স্বীকৃতি দেবার দায়িত্ব ছিল মন্ত্রীমণ্ডলী ও পুরোহিতদের ওপর। তারাও নিশ্চয়ই সংঘগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করে রাখার চেষ্টা করত। তবে উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে বণিকদের সমবায় সংঘ আরো ক্ষমতাশালী ছিল, কারণ বাণিজ্যের সাফল্যের ওপরই এধরনের রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করত।

দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেনের বিশদ দলিল এখন আর পাওয়া যায় না। দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘের কেন্দ্র থাকার ফলে প্রমিসরি নোট প্রচলিত হয়েছিল নিয়মিতভাবেই। মুদ্রারও ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছিল। স্বর্ণমুদ্রার অবাধ প্রচলন ছিল। তবে একাদশ শতাব্দীর পর থেকে মুদ্রাগুলির মানের অবনতি ঘটে। তবে এও সত্য যে, মুদ্রার সোনার পরিমাণ দেশের সব জায়গায় এক ছিল না। ওজন ও মানের ব্যাপক পার্থক্যের জন্যে গ্রামে সোনা ও স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার বেড়ে গেল। চোলযুগের শেষদিকে স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তাম্রমুদ্রার ব্যবহার বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমেই দেওয়া-নেওয়া হতো। কিংবা, ধানের পরিমাণ হিসেব করে বিনিময় চলত। এইসব অঞ্চলে মুদ্রার ব্যবহার ছিল শুধু দূরদেশে বেচাকেনার জন্যে, অথবা মূল্যবান জিনিসের ক্ষেত্রে, যেখানে বিনিময়ের ব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক ছিল না।

এই যুগে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র ছিল মন্দির। কখনো রাজাই মন্দির নির্মাণ করে দিতেন। সেক্ষেত্রে মন্দিরগুলি সাধারণত রাজধানীতে অবস্থিত হতো ও রাজসভার সঙ্গে মন্দিরের নিয়মিত যোগাযোগ থাকত। যেমন, তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরম মন্দির, অথবা ব্যবসায়ী ও সমবায় সংঘের দানেও মন্দির নির্মিত হতো। সেক্ষেত্রে মন্দিরের সঙ্গে শহরের ক্ষমতাশালী নাগরিকদের নিকট সম্পর্ক থাকত। এছাড়া, গ্রামবাসীরা গ্রামে ছোট মন্দির তৈরি করে নিত। গ্রামে মন্দিরই ছিল নানাবিধ কার্যকলাপের কেন্দ্র। এখানেই গ্রামসভার অধিবেশন বসত, বা বিদ্যাভ্যাস চলত। উপরন্তু মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করত গ্রামবাসীরাই। বড় মন্দির নির্মাণের সময় দীর্ঘদিন ধরে কারিগররা কাজ পেত। যেসব জায়গা থেকে

নির্মাণের মাল-মশলা আসত, সেইসব অঞ্চলের সঙ্গে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো।

আধুনিক যুগে কোনো বড় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে ওই যুগের মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের তুলনা করা যায়। তাঞ্জোরের মন্দিরই ওইযুগের সবচেয়ে সম্পন্ন মন্দির ছিল। সেখানকার বাৎসরিক আয় ছিল— ৫০০ পাউণ্ড ট্রয় (মণিকারদের মাপ) সোনা, ২৫০ পাউণ্ড ট্রয় দামী পাথর, ৬০০ পাউণ্ড ট্রয় রুপো। কয়েকশো গ্রামের রাজস্ব ও ব্যক্তিগত দান থেকে এই বিপুল অর্থ আয় হতো। মন্দিরের কর্মচারী যারা থাকত যথেষ্ট আরামে, ছিল ৪০০ দেবদাসী, ২১২ জন ভৃত্য, ৫৭ জন সঙ্গীতজ্ঞ ও শাস্ত্র-পাঠক; এছাড়া কয়েকশো পুরোহিত মন্দিরের কাছাকাছি বাস করত। মন্দিরের পরিচালকরা এই অর্থ লগ্নী করত বিভিন্ন অর্থকরী ব্যবসায়ে। তাছাড়া, গ্রামসভা গুলিকে টাকা ধার দেওয়া, বা টাকা গচ্ছিত রাখার কাজও করত। তখনকার প্রচলিত সুদের হার, শতকরা ১২ টাকা হিসেবেই মন্দির থেকে টাকা ধার দেওয়া হতো। আগের যুগে অবস্থাপন্ন মঠগুলি যা করত, এই সময়ে মন্দিরগুলিও অর্থের ব্যাপারে তাই করত।

চোলযুগের অধিকাংশ মন্দিরে দেবদাসীদের দেখা যেত। এই প্রথার প্রথমদিকে দেবদাসীরা ছিল বিশেষ শ্রদ্ধেয়া পরিচারিকা। রোমের কুমারী কন্যাদের (Vestal Virgin) মতো এখানকার দেবদাসীদেরও খুব অল্পবয়সে মন্দিরের জন্যে উৎসর্গ করে দেওয়া হতো। তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজনকে ভরতনাট্যম নৃত্যের শিল্পী হবার জন্যে কঠিন সাধনা করতে হতো। (এমন কি বর্তমান যুগের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পীও দেবদাসীদের বংশধর।) কিন্তু দেবদাসী-প্রথার অপব্যবহার শুরু হল। শেষপর্যন্ত অনেক মন্দিরেই দেবদাসীরা বারবনিতায় রূপান্তরিত হল। আর্থিকভাবে অত্যাচারিত এই নারীদের অর্জিত অর্থ মন্দির-পরিচালকদের কাছে জমা পড়ত। অন্যদিকে নগরের নটীরা নানা গুণসম্পন্না নারী ছিল এবং তাদের দেবদাসীদের মতো অপব্যবহার করা হয় নি। এই বারাঙ্গনাদের ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর নারীদের চলাফেরার অনেক স্বাধীনতা ছিল, কেননা কেবল তাদের পক্ষেই সামাজিক নিয়মবিধি উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়েদের বাড়িতে বা ক্ষেতে কাজ করতে হতো।

সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্ণসচেতনতা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। সমাজে অন্য-দের চেয়ে ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল বেশি এবং ব্রাহ্মণরা সে সম্পর্কে সচেতনও ছিল। দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণরা একই সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। তারা প্রায়ই কর থেকে অব্যাহতি পেত; অনেকের জমি ছিল এবং সর্বো-পরি তাদের পেছনে ছিল রাজকীয় সমর্থন। আদিতে যা ছিল বিদেশী সংস্কৃতি ব্রাহ্মণরা ক্রমশ সেই সংস্কৃতিরই প্রতীক হয়ে উঠল। উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের তুলনায় দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ভূস্বামীরা ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করত না। তাদের উদ্বৃত্ত উপার্জন ব্যবসায়ে লগ্নী করত। কোনো কোনো জায়গায় ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়ীদের সম-গোত্রীয় হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ শাস্ত্রীয় নিষেধ অমান্য করে দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়াতেও চলে গিয়েছিল।

বর্ণবিন্যাসে প্রধান জোর দেওয়া হতো সমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রেণীবিভাগের ওপর। দক্ষিণ-ভারতীয় অব্রাহ্মণদের তালিকায় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের উল্লেখ কম। বেশি দেখা যায় শূদ্রদের। শূদ্রদের মধ্যেও দুইভাগ: যে শূদ্রদের স্পর্শ দূষণীয় নয়, আর যারা একেবারেই অস্পৃশ্য। তারা মন্দিরে ঢুকতে পারত না। মনে হয়, ব্রাহ্মণরাই ছিল সব ক্ষমতার অধিকারী এবং অব্রাহ্মণরা তাদের অধীনস্থ কর্মচারী ছিল। স্বভাবতই ব্রাহ্মণরা নিজস্ব বর্ণের প্রতি আনুগত্য ও বর্ণভিত্তিক সভার ওপর গুরুত্ব দিত। উদ্দেশ্য ছিল, অব্রাহ্মণরা যেন ঐক্যবদ্ধ না হয়ে ওঠে।

ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল। স্ত্রীপুরুষ নিজেরাও নিজেদের বিক্রি করত। অথবা, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তাদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করত। দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে মন্দিরের কাজেও নিজেদের বিক্রি করত। তবে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। গৃহস্থবাড়ি বা মন্দিরেই ক্রীতদাস দেখা যেত। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে ব্যাপকহারে ক্রীতদাস নিয়োগের কথা শোনা যায় নি।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্যান্য বর্ণগুলির মধ্যে পার্থক্য তেমন স্পষ্ট ছিল না। আর্থিক মর্যাদা অনুসারে বর্ণমর্যাদার পরিবর্তনও হতো। যারা রাজসভার কাজে নিযুক্ত থাকত, তাদের অনেক সময় বেশি সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হতো। রাজা রাজেন্দ্রের আদেশ সম্বলিত তাম্রপত্রের কারিগররা, কাঞ্চীপুরমের যেসব তাঁতীরা রাজ-পরিবারের জন্যে কাপড় বুনত বা রাজকীয় মন্দির বা রাজপ্রাসাদের প্রস্তর-শিল্পীরা কিছু কিছু করদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। তাছাড়া, এইসব তাঁতীরা অন্যান্য তাঁতীদের চেয়ে বেশি সম্মান পেত। এছাড়া মিশ্রবর্ণের কথাও নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। মনে হয়, ব্রাহ্মণরা বর্ণ সম্পর্কে যতই কঠোর নিয়মবিধির উপদেশ দিক-না কেন, বাস্তবে তার যথেষ্ট বিচ্যুতি ঘটত এবং সেগুলি ক্ষমাও করা হতো।

আগের যুগ থেকেই মন্দির ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। ছোট গ্রামের মন্দিরে শিক্ষকতার দায়িত্ব ছিল পুরোহিতদেরই। বড় গ্রামে মন্দিরের সঙ্গে পৃথক শিক্ষালয় থাকত। যেসব ব্রাহ্মণ এখানে শিক্ষালাভ করত, তারা মন্দিরের পুরোহিত বা স্থানীয় শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হতো। বৌদ্ধ ও জৈন মঠে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও তার সংখ্যা এত কম ছিল যে, সমাজে তার বিশেষ প্রভাব দেখা যেত না। শিক্ষাব্যবস্থা এমন ছিল যে, নিয়মিত উপস্থিতি ও কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজনীয় ছিল। বিখ্যাত শিক্ষালয়গুলি এন্নায়িরাম, ত্রিভুবনী, তিরুবাদুতুরাই ও তিরুবরিয়ুরে অবস্থিত ছিল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। মাতৃভাষা তামিলের ব্যবহার ছিল খুবই সামান্য, ফলে শিক্ষার্থীদের জীবন দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্যে মৌখিক শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা ছিল। তামিল সন্ন্যাসীরা শিব ও বিষ্ণুপুজার স্তবরচনা করে গিয়েছিলেন। অশিক্ষিত শ্রোতাদের কাছে স্তবগুলি গেয়ে শোনানো হতো।

সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা হতো নির্দিষ্ট ধাঁচে। গ্রন্থরচনার বিষয় ছিল ব্যাকরণ, অভিধান, অলংকার, প্রাচীন সাহিত্যের ওপর টিপ্পনী, গদ্য কাহিনী ও

কাব্য। কাব্য রচনার নিয়মকানুন ক্লাসিক্যাল যুগেই বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সাহিত্যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিরল ছিল। রচনা ক্রমশই কৃত্রিম হয়ে উঠতে লাগল। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে তামিল ভাষাতেও কিছু সাহিত্য রচনা হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব সত্ত্বেও এ যুগের তামিল সাহিত্যে যথেষ্ট সজীবতার স্পর্শ ছিল। উল্লেখযোগ্য তামিল সাহিত্যের মধ্যে কম্বনের রামায়ণ এবং কুট্টন, পুগানেন্ডি জয়ানগণ্ডুর ও কাল্লাদানার-এর রচনা। বিভিন্ন শিলালিপির মধ্যে দীর্ঘ রচনার মান দেখেও বোঝা যায়, তামিল সাহিত্য রীতিমতো অগ্রসর ছিল। সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করে। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে যদি তামিল ভাষাকে গ্রহণ করা হতো, তাহলে হয়তো সেযুগের শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার মান আরো উন্নত হতো।

উপদ্বীপের সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা থেকে আঞ্চলিক উপভাষার জন্ম হল। দাক্ষিণাত্যের এই নতুন ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না। যেমন, মারাঠী-ভাষা এসেছিল স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে। এছাড়া অন্য ভাষা, যেমন তামিল, তেলুগু ও কানাড়া ভাষা এসেছিল দ্রাবিড় মূল থেকে। কিন্তু এগুলির শব্দসম্পদে সংস্কৃত প্রভাব ছিল খুব বেশি। কিন্তু নতুন ভাষাগুলির যেমন বিবর্তন হচ্ছিল, মূল ভাষার প্রভাব ততই কমে আসছিল। নবম শতাব্দীতে অন্ধ্র অঞ্চলে তেলুগুভাষা গড়ে উঠল। সংস্কৃত সাহিত্যে কোনো কোনো রচনা তেলুগুতে অনুবাদ করা হল পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে। যেমন, রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের রচনা ; এগুলি লেখা হল মূলত সাধারণ মানুষের জন্যে। রাজকীয় সমর্থনের অভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেলুগুর ব্যবহারের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছিল।

মহীশূর অঞ্চলের ভাষা কানাড়ার এরকম কোনো অসুবিধে হয় নি। রাজ-পরিবারের সমর্থন ছাড়া ওই অঞ্চলের প্রভাবশালী জৈনরাও কানাড়া ভাষাকে সমর্থন করল। এই ভাষা ওই অঞ্চলের 'বীরশৈব' বা 'লিঙ্গায়ত' আন্দোলনের ভাষা হয়ে উঠল। (এই আন্দোলন পরবর্তীকালের এবং আজকের মহীশূরেও ধর্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তির সৃষ্টি করেছিল।) এইযুগের প্রথমদিকে কানাড়াভাষা তেলুগুভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু ক্রমশ তেলুগু অন্ধ্র অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে গেল। কানাড়া ভাষায়ও প্রথমদিকের রচনা ছিল মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ।

পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মারাঠীভাষার প্রথমদিকে ওই একই ব্যাপার দেখা গিয়েছিল। ওখানকার যাদব-বংশীয় রাজারা মারাঠীভাষার প্রচারে উৎসাহ দেন। তামিল অঞ্চল থেকে এখানেও 'ভক্তি-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ওই আন্দোলনেও মারাঠীভাষাকে গ্রহণ করা হল। ফলে মারাঠীভাষায় বহু জনপ্রিয় স্তব রচিত হল এবং 'গীতা' ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অনূদিত হল। এর সুফল হিসেবে মারাঠীভাষা শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়ে উঠল।

সংস্কৃতভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাগুলির যে পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টি হল, ধর্মের মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও হিন্দু দর্শনের ভাষা রইল সংস্কৃতে। আবার, বৌদ্ধ ও জৈনরাও সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করতে লাগল। এই দুই ধর্মাবলম্বীর

সংখ্যা তখন বেশ কমে গেছে। এই যুগের শেষে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুরই এক অবতার বলে গণ্য করা হল। কিন্তু জৈনধর্ম মহীশূরে অস্তিত্ব টি'কিয়ে রাখল। মনে হয়, ভক্তি মতবাদের প্রসারই এই দুই ধর্মের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। তামিল অঞ্চল থেকে ভক্তি-আন্দোলন অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। আরো ছিল, শিব ও বিষ্ণুর উপাসক সম্প্রদায়ের প্রসার। প্রাচীন স্তবগুলি এসময় একত্র করা হল। এই জনপ্রিয় স্তবগুলির ওপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক সাহিত্যে আরো নতুন রচনার সৃষ্টি হল। স্তবগুলির দার্শনিক চিন্তার সূত্র ছিল উপনিষদ। এগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ভক্তিবাদের বিতর্কের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় করতে পেরেছিল। আগেকার সন্ন্যাসীদের স্থান নিলেন বৈষ্ণব আচার্যরা, তাঁরা এই সমন্বয়ে আরো সাহায্য করেছিলেন। শৈবধর্ম দক্ষিণ-ভারতে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ওই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আগের যুগের সন্ন্যাসীদের উপদেশমতোই ওই যুগেও ধর্মাচরণ করছিল। তারাও নতুন সম্প্রদায়কে সমর্থন জানালো।

কিছু কিছু উগ্র সম্প্রদায়ের তুলনায় বলা যায় যে, ভক্তিবাদ প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে মানিয়ে চলত। উগ্র সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছিল, তান্ত্রিক ও শাক্ত, কাপালিক, কালামুখ ও পাশুপত সম্প্রদায়। এইসব ধর্মগুলির বেশ কিছু অনুরাগী ছড়িয়ে ছিল দেশের বিভিন্ন অংশে। এদের ধর্মাচরণের মধ্যে রক্তপাত ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা-সহ নানা অদ্ভুত ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ছিল। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচরণ করাই ছিল এসবের মূল উদ্দেশ্য। কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রীতিমতো সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতারও পরিচয় পাওয়া যেত। আবার একথা বলা হয়েছে যে, এই ধরনের সম্প্রদায়ের অনুরাগী অধিকাংশ মানুষই স্বাভাবিক জীবনযাপন করত। কেবল মাঝে মাঝে এইসব আচার-অনুষ্ঠানে তারা অংশ নিত। বলা যায়, এইসব অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারিদের মনের ওপর একটা বিশোধন ক্রিয়া ঘটাতো। এইসব সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সামাজিক প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে অসামাজিক কাজকর্ম করত, ফলে তাদের কাম্য খ্যাতি তারা এইভাবে পেত। এইসব কার্যকলাপকে তারা ধর্মাচরণের সঙ্গে সংযুক্ত করত এবং এর মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলে দাবি করত।

কালামুখ গোষ্ঠী মানুষের মাথার খুলির মধ্যে খাবার রেখে খেত। নিজেদের সারা শরীরে চিতার ভস্ম মাখত (এই ভস্ম কখনো কখনো তারা খেতও)। এরা প্রায়ই একপাত্র মদ ও লাঠি হাতে করে ঘুরে বেড়াতো। কোনো প্রমাণ না থাকলেও মনে হয় এরা নরবলিও দিত। এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের কোনো কোনোটি বহু প্রাচীন এবং এরা সেগুলি পুনঃপ্রচলন করে। তখনকার গোঁড়ামির আবহাওয়ায় নতুন চিন্তা বা জ্ঞানের ব্যাপারে বাধানিষেধ ছিল, অনেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই অন্যরকম জীবনযাপন করত। যাদুবিদ্যায় আগ্রহ কেবল চমক লাগানোর জন্যেই জন্মায় নি। বিভিন্ন বস্তু নিয়ে নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যে আগ্রহ, এটা তার একটা প্রমাণ।

তবে, সব প্রতিবাদের মধ্যেই যে প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করার ঝোঁক ছিল, এমন নয়। যেমন শৈব উপাসকদের মধ্যে এযুগে যেস নতুন সম্প্রদায়

জন্ম নিয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। এদের মধ্যে লিঙ্গায়ত বা বীর শৈব সম্প্রদায় দ্বাদশ শতাব্দীতে সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। তামিল ভক্তিবাদ, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন এবং ইসলামিক চিন্তার প্রভাব ছিল এই আন্দোলনের ওপর। এক ধর্মত্যাগী জৈন বাসবরাজ ছিলেন নতুন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর বক্তব্যকে আরো ক্ষুরধার করে তোলে। তিনি লিখেছেন :

> ···কসাইখানায় নিয়ে যাবার পথে মেষশাবক তার নিজের গলার পাতার মালা খেয়ে ফেলে···সাপের মুখে আটকে থাকা ব্যাঙ উড়ন্ত মাছি খেতে চায়। আমাদের জীবনও সেইরকম। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষ দুধ ও ঘি খায়। · পাথরের ওপর সাপের মূর্তি খোদাই করা থাকলে তার ওপর মানুষ দুধ ঢেলে দেয় ; আবার জীবন্ত সাপ দেখলে মানুষ বলে ওঠে মারো মারো। ঈশ্বরের সেবক খাবার চাইলে মানুষ বলে 'চলে যাও'। অথচ ভগবানের প্রাণহীন মূর্তি খেতে পারবে না জেনেও মূর্তির সামনে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়।[৪]

ভক্তিবাদের সঙ্গে লিঙ্গায়তদের পার্থক্য ছিল এই যে, তারা কেবল ঈশ্বরকে ভক্তি করাই উপদেশ দিত না। ধর্মীয় ভণ্ডামিরও বিরোধিতা করত। বেদ নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলল। জন্মান্তরবাদ নিয়েও কথা উঠল। শিবকে উপাসনা করা হতো লিঙ্গপ্রতীকের সাহায্যে। সামাজিক বিবেক জাগ্রত করা ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো কোনো সামাজিক রীতিনীতি প্রবর্তনের ব্যাপারে লিঙ্গায়তদের অবদান আছে। এর মধ্যে ছিল যৌবনারম্ভের পর মেয়েদের বিয়ে এবং বিধবা-বিবাহ। স্বভাবতই লিঙ্গায়তরা ব্রাহ্মণদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। আবার, উদার মনোভাবের জন্যে এরা নিম্নবর্ণের মানুষের সমর্থন পেয়েছিল।

যেসব মানুষের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তারা উপাসনার জন্যে নিজস্ব প্রতীক ও আচার-অনুষ্ঠান তৈরি করে নিয়েছিল। পরে ভক্তি-আন্দোলন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল। ফলে, অনেক সময় দেবতাকে নরমূর্তিধারী হিসেবে পুজো করা হতো। এরকম একটি সম্প্রদায় ছিল পশ্চিম-ভারতের পান্ধারপুরের পাণ্ডুরঙ্গ বা শ্রীবিট্টল সম্প্রদায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরা একটি মাতৃ-উপাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথমদিকেই পাণ্ডুরঙ্গকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছিল। ক্রমে এটি দাক্ষিণাত্যের ভক্তি-আন্দোলনের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠল। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন নামদেব, জনাবাই, সেনা ও নরহরি (পেশায় এঁরা ছিলেন যথাক্রমে দর্জি, পরিচারিকা, নাপিত ও স্বর্ণকার)। তাঁরা মারাঠীভাষায় স্তব রচনা করেন ও স্থানীয় অধিবাসীদের এই নতুন আন্দোলনে আকৃষ্ট করে তোলেন। ভক্তি-আন্দোলনের কেন্দ্রগুলি স্থানীয়-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

হিন্দুধর্মের দার্শনিক চিন্তা প্রায় কেবল ব্রাহ্মণদেরই অধিকারে পরিণত হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন মঠ ও শিল্পকেন্দ্রে ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কসভা বসত। তাদের পারস্পরিক চিন্তা বিনিময়ের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু তাদের চিন্তার প্রভাব ছিল সীমিত।

শঙ্করাচার্য্যের দর্শন নিয়ে বেশ চর্চা হতো। আবার তাঁর বিরোধী দার্শনিকদের নিয়েও আলোচনা চলত। বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ (তৎকালীন মত অনুযায়ী তাঁর সময় ১০১৭ থেকে ১১৩৭ খ্রীস্টাব্দ)। এই তামিল ব্রাহ্মণের জন্মস্থান ছিল তিরুপতি। শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ মন্দিরে শিক্ষাদান করে তাঁর জীবনের অনেক বছর কেটেছিল।

মুক্তির প্রধান উপায় হল জ্ঞান—শঙ্করের এই অভিমতকে রামানুজ মানেননি। রামানুজের মতে জ্ঞান হল মুক্তির নানা পথের একটিমাত্র পথ। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পথ হল গভীর ভক্তি— ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভক্তিমতবাদের মতোই রামানুজের মতবাদেও ঈশ্বরের প্রেম ক্ষমার আধার। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক এবং তার ভিত্তি প্রেম। হিন্দুদর্শন ও ভক্তিবাদের মধ্যে রামানুজ সেতুর ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং দুই পরস্পরবিরোধী দর্শনকে তিনি একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করেছিলেন।

উপমহাদেশের বিভিন্ন হিন্দু ধর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্রে রামানুজের মতবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ঈশ্বরের ক্ষমা— যার ওপর রামানুজ জোর দিয়েছিলেন, ক্রমশ তা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিল। উত্তরের দল বললো যে, এই ক্ষমা মানুষকে অর্জন করতে হবে। কিন্তু দক্ষিণের ভক্তরা বললো যে, ঈশ্বর নিজেই ক্ষমার পাত্র বেছে নেন। এই ধারণার সঙ্গে ক্যালভিনিস্টদের মতের আশ্চর্য মিল আছে।

ত্রয়োদশ শতকে কানাড়াভাষায় এক ধর্মপ্রচারক ছিলেন মাধব। তিনিও হিন্দু-দর্শন ও ভক্তিবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করছিলেন। মাধবও ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি যে বিষ্ণুকেই একমেবাদ্বিতীয়ম, প্রকৃত ঈশ্বর বলে মনে করতেন, এই ধারণা রামানুজের দক্ষিণ-ভারতীয় অনুগামীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মাধবও বললেন, ঈশ্বর কেবল পবিত্র আত্মাদেরই রক্ষা করেন। এর মধ্যে নিহিত আছে নির্বাচন, তবে দক্ষিণী সম্প্রদায় যেমন মনে করতেন— নির্বাচন সেরকম যথেচ্ছ নয়। মাধবর কিছু কিছু ভাবধারা থেকে মনে হয়, তিনি মালাবারের খ্রীস্টীয় চার্চের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ; সম্ভবত তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, বিষ্ণু তাঁর পুত্র বায়ুর মাধ্যমে তাঁর ক্ষমা দান করেন। এই ধারণা প্রাচীন হিন্দু ধর্মতত্ত্বে কোথাও নেই। কিন্তু এর সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের 'হোলি গোস্ট' ধারণার সাদৃশ্য আছে।

রামানুজ উচ্চবর্ণের জন্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সমর্থক হলেও শূদ্রদের মন্দিরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার বিরোধী ছিলেন। তিনি শূদ্রদের জন্যে মন্দিরের দরজা খুলে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আহ্বানে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি।—তবে, ভক্তি-আন্দোলনের সাফল্য ও ভক্তিবাদ প্রচারকদের সমন্বয়ের চেষ্টার ফলে প্রাচীনপন্থীরা কিছুটা আপস করতে বাধ্য হল। শূদ্ররা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি না পেলেও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের কিছু কিছু দেবতা ও পূজাপদ্ধতি মন্দিরে প্রবেশ করল। এ ছিল অনিবার্য। নইলে সমাজে, বিশেষ উচ্চবর্ণের সমাজে মন্দির আর সামাজিক ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারত না। এর ফলে মন্দিরের বহিরঙ্গও দেখা দিল। অন্যান্য দেবতাকে স্থান দেবার জন্যে মন্দিরের পাশে নতুন মন্দির তৈরি করা হল। আরো বেশি শ্রোতাকে শাস্ত্রপাঠ শোনার

সময় জায়গা দেবার জন্যে মন্দিরের পাশে আলাদা চত্বর তৈরি করতে হল। তাছাড়া, জনপ্রিয় ধর্ম-প্রচারকদের মূর্তি ও মন্দির স্থাপন করা হল। মন্দির সংলগ্ন জমি আরো বিস্তৃত করা হল। চোলযুগের সমৃদ্ধির সময় মন্দির নির্মাণে প্রচুর অলংকরণ করা হতো। দাক্ষিণাত্যে ক্ষুদ্রতর রাজবংশগুলিও, যেমন হোয়সল রাজবংশ, বিরাট মন্দির নির্মাণ করে প্রজাদের চমৎকৃত করতে চেষ্টা করত।

চোলযুগে পাহাড়কাটা মন্দিরের চেয়ে সমতল জমির ওপর খাড়া মন্দির নির্মাণের ঝোঁক বেশি দেখা দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই যুগের বাড়িঘর এখন আর টিঁকে নেই, তবে মন্দিরগুলি আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহ নির্মাণের ওপর চোলরা বেশি গুরুত্ব দিত। মন্দিরের আয়তন অনুযায়ী এক বা একাধিক হলঘরের মধ্য দিয়ে গর্ভগৃহে পৌছতে হতো। গর্ভগৃহের বাইরে ওপরের দিকে উঁচু পিরামিড আকৃতির শিখর নির্মাণ করা হতো। শিখরের উচ্চতা হল মন্দিরের আয়তনের অনুপাতে। মন্দিরের চারদিকে দেওয়াল বেষ্টিত প্রাঙ্গণ থাকত। এই দেওয়ালের ভেতরদিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সারি সারি থাম থাকত। উদাহরণ হল, তাঞ্জোরের মন্দির ও গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের মন্দির। প্রবেশদ্বারগুলির নির্মাণেও গর্ভগৃহের শিখর নির্মাণের ধাঁচ অনুকরণ করা হতো। প্রবেশদ্বারের 'শিখরের' উচ্চতা বাড়ানোর দিকে ক্রমশ ঝোঁক দেখা যায়। মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির ও ত্রিচিনাপল্লীর কাছে শ্রীরঙ্গমে প্রবেশদ্বার ও গর্ভগৃহের 'শিখরের' উচ্চতা প্রায় একই।

কিছু কিছু ভাস্কর্যের মধ্যেও স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূল মন্দিরের মতো ভাস্কর্যও বিরাট আকৃতি নিল। স্তম্ভের শীর্ষদেশ ও স্তম্ভের অলংকরণের জন্য ভাস্কর্যের ব্যবহার হতো। চোলযুগের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের কারিগররা বেশি উৎকর্ষ দেখিয়েছে। এখানকার মূর্তিগুলির সঙ্গে পৃথিবীর যেকোনো ভাস্কর্য তুলনীয়। দেবতা, দাতা ও সন্ন্যাসীদের মূর্তি ছিল এগুলি। ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি তৈরি হতো *cire perdu*, অর্থাৎ 'লুপ্ত মোম' পদ্ধতিতে। মূর্তিগুলি মন্দিরের ভিতরের অংশে রাখা থাকত। দক্ষিণ-ভারতীয় ভাস্করদের প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে এই মূর্তিগুলি স্মরণীয়।

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি আগেকার চালুক্য রীতিই অনুকরণ করেছিল। শুধু অলংকরণের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল। আগেকার দিনে ব্যবহৃত বালুপ্রস্তরের (sand stone) ব্যবহারের জায়গায় সোপ-স্টোনের (soap-stone) ব্যবহারের ফলে পাথরের চেয়েও সোপ-স্টোন ছিল অনেকে বেশি নরম। পরবর্তী চালুক্য ও হোয়সলদের আমলের মন্দিরের পরিকল্পনার মধ্যে নতুনত্ব ছিল। এর উদাহরণ হল, হালেবিড়, বেলুড় ও সোমনাথপুরের হোয়সল মন্দিরগুলি। এইসব মন্দিরের ভিত্তিভূমি আগেকার মতো আয়তক্ষেত্রাকার না হয়ে বহুভুজাকৃতি করা হয়েছিল। তার মধ্যেই গর্ভগৃহ, অন্যান্য কক্ষ, হলঘর ইত্যাদি থাকত। পুরো মন্দিরটি উঁচু জায়গার ওপর নির্মাণ করা হতো। বড় মন্দিরগুলিতে আর উঁচু স্তম্ভ ও শিখর থাকত না বলে মন্দিরগুলির উচ্চতা কম দেখাতো। বহির্ভাগের সাজসজ্জার অঙ্গ ছিল মন্দিরের গায়ে সমান্তরাল কয়েকটি অলংকরণ। পশু, ফুল, নর্তক, গায়ক

যুদ্ধের দৃশ্য ও ধর্মীয় সাহিত্যের দৃশ্যকে উপজীব্য করে অলংকরণ করা হতো। বহুভূজাকৃতির ফলে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল ছিল অনেক বেশি এবং অলংকরণের স্থানও বেশি ছিল। হোয়সল মন্দিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল চওড়া ও বেঁটে ধরনের স্তম্ভগুলি। এগুলি অত্যন্ত উন্নত নির্মাণ কৌশলের পরিচায়ক।

ধার্মিক তাৎপর্য ছাড়াও মন্দিরগুলি রাজকীয় প্রতিপত্তি ও মহিমার ধ্বজাস্বরূপ ছিল। বিশেষত চোল রাজবংশের মন্দির সম্পর্কে এই দাবি করা যায়। চোল রাজাদের উত্থান পশ্চিম ও উত্তর-দাক্ষিণাত্যের শক্তিদের পছন্দ না হলেও এর থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যে, উপমহাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র কখনো একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পাবে না। এই শতাব্দীগুলিতে উন্নতির পথপ্রদর্শক ছিল দক্ষিণ-ভারত। উত্তর-ভারত সন্ত্রস্ত ও রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল। যত নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যতো নতুন চিন্তাধারণা সবই এযুগে দক্ষিণ থেকে আরম্ভ হয়। স্বায়ত্তশাসনের বিবর্তন, শঙ্করাচার্য ও রামানুজের দর্শন, তামিল ও মহারাষ্ট্রীয় কারিগরদের সংগঠিত ভক্তিবাদ নামক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন, অথবা আরো প্রাথমিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আরব বণিকদের স্বাগত জানানো, অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গঠন—এইসব দিক দিয়েই দক্ষিণ-ভারত তখন উন্নত সভ্যতার দিকে অগ্রসর। উত্তর-ভারত যখন স্থাণুবৎ, দক্ষিণের জয়যাত্রা তখন ছিল অব্যাহত।

১০

উত্তর-ভারতের আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সূচনা

আনুমানিক ৭০০—১২০০খ্রি

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশে যে রাজ্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলিকে উপ-মহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে সেতু বলা যায়। এতে তাদের কোনো কোনো ব্যাপারে অসুবিধে হতো, কারণ অনেক সময় এই রাজ্যগুলিকে উত্তর ও দক্ষিণ, দুই অঞ্চলের রাজনীতিতেই জড়িয়ে পড়তে হতো। উত্তর ও দক্ষিণের সম্পর্ক যখন খুব সীমিত, তখন সাতবাহন রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং এই রাজ্যের মাধ্যমেই দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যাদি এবং চিন্তাধারার বিনিময় হতো। বাকাটকরা অবশ্য উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে উত্তরাঞ্চলই বেশি শক্তিশালী ছিল। চালুক্যরা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরা যদি নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখত তাহলে তারা দাক্ষিণাত্যে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যবর্তী অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুই অঞ্চলের ওপরই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। রাষ্ট্রকূটদের সময়ে দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রকূটরা দুই অঞ্চল থেকেই রাজনৈতিক প্রভাব অনুভব করতে লাগল। এই কারণেই তারা শেষপর্যন্ত বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারল না।

উপদ্বীপ অঞ্চলের রাজনীতিতে রাষ্ট্রকূটদের ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। উত্তর-ভারতের রাজারা তখন সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যে কনৌজ জয় করার স্বপ্ন দেখতেন। কেননা, হর্ষবর্ধন ও যশোবর্ধন কনৌজকে তাঁদের সাম্রাজ্যের প্রধান শহরে পরিণত করার পর কনৌজের আলাদা মর্যাদার সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমশ কনৌজ রাষ্ট্রকূট, প্রতীহার ও পালরাজাদের পারস্পরিক বিরোধের কেন্দ্র হয়ে উঠল। কনৌজ নিয়ে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেল। ফলে তিন রাজবংশই সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে উঠল এবং তিন রাজ্যের সামন্ত রাজারা সারা উত্তর-ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করল।

প্রতীহার বংশ সম্ভবত এসেছিল রাজস্থানের গুর্জর জাতির লোকের মধ্য থেকে। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূটদের মতে, প্রতীহাররা প্রকৃতপক্ষে ছিল দ্বাররক্ষক, অর্থাৎ নিম্নবর্ণ। হয়তো প্রতীহাররা মূলত রাজপ্রাসাদের কর্মচারী ছিল এবং ক্রমশ তারাই রাজা হয়ে উঠল। এই যুগের অনেক রাজবংশই এইভাবে ক্ষমতায় এসেছিল। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীহার রাজা ম্লেচ্ছদের ভীষণ শত্রু ছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু 'ম্লেচ্ছ' শব্দের তাৎপর্য পরিষ্কার নয়। সম্ভবত এক্ষেত্রে সিন্ধু অঞ্চলের আরবদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা ৭১২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু জয় করে নেয় এবং সিন্ধু ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার আরবদের আধিপত্য

বিস্তারের পূর্ব সীমান্ত। এ পর্যন্ত আরবদের বিশেষ কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি, কারণ অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল মরুভূমি। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটরা আরবদের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। কিন্তু আরবদের বাধা দেবার জন্যে কোনো সম্মিলিত যুদ্ধ-যাত্রার চেষ্টা হয়নি। তাছাড়া, আরবরা তখন তেমন কিছু শক্তিশালী না হওয়ায় আরবদের আগমনের তাৎপর্যও কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। আরবদের প্রতিহত করার পর প্রতীহার রাজারা পূর্বদিকে মনোনিবেশ করলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রতীহার বংশ কনৌজ, উজ্জয়িনী ও রাজস্থানের বিস্তৃত অঞ্চলে নিজেদের রাজ্য প্রসারিত করে ফেলেছিল।

কনৌজ জয়ের বাসনা ছিল আরো একটি রাজবংশের। তারা হল বাংলা ও বিহারের পাল রাজবংশ। এই অঞ্চল আর্থিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তাছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট অর্থাগম হতো। অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজা গোপালের রাজত্বের আগে পর্যন্ত পালদের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। গোপাল খ্যাতিলাভ করেছিলেন এই কারণে যে তাঁর রাজত্বলাভ উত্তরাধিকার সূত্রে হয়নি, হয়েছিল নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাঁর নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত খবর না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা গেছে যে, দেশের অরাজকতা দূর করার জন্যে গোপালকে রাজা নির্বাচন করা হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তারনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতে ইতিহাস রচনার সময় এই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর কথামতো, তখন বাংলাদেশে কোনো রাজা না থাকায় দুঃসহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। স্থানীয় নেতারা রাজা নির্বাচন করলেন। কিন্তু একের পর এক নির্বাচিত রাজা নির্বাচনের পরবর্তী রাতে এক অপদেবতার দ্বারা নিহত হচ্ছিলেন। গোপাল রাজা হবার পর দেবী চণ্ডী তাঁকে একটি বিশেষ দণ্ড উপহার দেন। ওই দণ্ডের সাহায্যে গোপাল অপদেবতাকে বধ করেন। এই কাহিনী থেকে মনে হয়, নেতা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে গোপাল কৃতিত্ব দেখানোর পরই রাজা নির্বাচিত হন এবং তিনি ছিলেন চণ্ডী উপাসক।

গোপাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর পুত্র ধর্মপালই উত্তর-ভারতীয় রাজ-নীতিতে পালরাজ্যকে মর্যাদার আসনে এনে দিলেন। ধর্মপাল রাজা হবার পরই রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরাস্ত হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে পূর্ব-ভারতে পালরাজ্য প্রধান শক্তি হয়ে উঠল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মপাল কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে প্রতীহার বংশের অনুগ্রহপুষ্ট এক রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর জায়গায় কনৌজের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধ উপস্থিত হল। কিন্তু ধর্মপাল তাতে দমেন নি। তিব্বতের সঙ্গে সুসম্পর্কের ফলে রাজ্যের উত্তর সীমান্ত নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পালদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জানা যায়, সুমাত্রার রাজা এক পালরাজার অনুমতি নিয়ে নালন্দার একটি মঠে কিছু দান করেছিলেন। পূর্ব-ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে এযুগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলেই পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আফগান ও তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বৌদ্ধরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পলায়ন করেন ও সেখানকার মঠে আশ্রয় পান।

ইতিমধ্যে প্রতীহাররা আবার শক্তি সঞ্চয় করেন। রাষ্ট্রকূটরা পালদের হাত থেকে কনৌজ কেড়ে নিয়েছিল এবং এবার প্রতীহাররা রাষ্ট্রকূটদের কাছ থেকে কনৌজ দখল করে নিল। পাল ও রাষ্ট্রকূটরা প্রতীহার রাজ্যের সীমানা থেকে বিতাড়িত হল। প্রতীহার রাজা ভোজরাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে আরব আক্রমণও প্রতিহত করলেন। কিন্তু পশ্চিমে আরব ও পূর্বে পালদের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাঁর দাক্ষিণাত্য আক্রমণের স্বপ্ন সফল হয়নি।

রাষ্ট্রকূটরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং ৯১৬ খ্রীস্টাব্দে তারা শেষবার কনৌজ আক্রমণ করল। এর ফলে উত্তর-ভারতের ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল। রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহাররা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদেরই শক্তিক্ষয় করছিল। আরব পরিব্রাজক মাসুদি দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে কনৌজে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, কনৌজের রাজা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাজার শত্রু। এজন্যে তিনি সবসময়েই সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতেন। কিছু কিছু ছোট রাজাও যুদ্ধযাত্রায় তাঁর সহযোগী ছিলেন। ১০০ বছর পরে উত্তর-ভারতে প্রতীহাররা আর উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো না। এরপর ১০১৮ সালে তুর্কী সেনাবাহিনী কনৌজ ধ্বংস করে দেয়। প্রতীহার রাজবংশের এখানেই প্রায় শেষ। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের জায়গায় এলো পরবর্তী চালুক্যরা।

দশম শতাব্দীতে প্রতীহারদের পতনের পর পালরাজারা উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে আরো বেশি করে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তুর্কী আক্রমণের ফলে ওই অঞ্চলের রাজারা তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে পালরাজারা বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। কিন্তু ওদিকে চোলরাজা রাজেন্দ্রের উত্তর-ভারত অভিযানের ফলে পালদের আক্রমণ বাধা পায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। পালরাজা মহীপাল পশ্চিমদিকের অভিযান বন্ধ রেখে চোল সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। মহীপালের মৃত্যুর পর পালরাজবংশের পতন শুরু হয় এবং সেন রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে।

লক্ষণীয় যে, তিন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ— প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট ও পালদের পতন ঘটল প্রায় একই সময়ে। এর কারণ আছে। তিনটি রাজ্যই প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এবং বিরাট সেনাবাহিনীর ওপর রাজারা নির্ভর করতেন। সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হতো। ফলও হল একই। কনৌজ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে সামন্তরাজারা স্বাধীন হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। সামন্তরাজাদের বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের ফলে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তারও অবসান হল।

তিনটি বড় রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। যেমন — নেপাল, কামরূপ, কাশ্মীর, উৎকল রাজ্য। এছাড়া পূর্ব উপকূল অঞ্চলে পূর্বদিকের চালুক্য ও গঙ্গ রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। পশ্চিম-ভারতের গুজরাতে চালুক্যরা (বা শোলাংকিরা) রাজ্য স্থাপন করল। এই যুগের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে স্থানীয় শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাজ্য স্থাপন করত। এই যুগের

সাংস্কৃতিক জীবনেও এই রীতির প্রভাব আছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো; স্থানীয় রাজবংশের ইতিহাস রচিত হতো এবং বিভিন্ন রাজ্য ওই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকদের নিজেদের রাজসভায় নিয়ে আসার চেষ্টা করত। স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের দিয়ে দর্শনীয় মন্দির নির্মাণও হতো।

হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। নবম শতাব্দীতে কয়েকটি পার্বত্য রাজ্যের উদ্ভব হয়। প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত এইরকম কয়েকটি রাজ্য স্বাধীনতা বজায় রাখতে না পারলেও নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই দীর্ঘ ইতিহাসে এদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও সমভূমি অঞ্চল থেকে আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। কয়েকটি রাজ্য যেমন— চম্পক (চম্বা), দুর্গর (জম্মু), ত্রিগর্ত (জলন্ধর), কুলুত (কুলু) কুমায়ুন ও গাড়োয়াল রাজ্য উত্তর-ভারতের সমভূমি অঞ্চলের সংঘর্ষ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়।

কাশ্মীর সপ্তম শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজ্য সম্প্রসারণ করে কাশ্মীর-রাজ্য উত্তর-পাঞ্জাবের ব্যাপক অঞ্চলে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিল। ইতিমধ্যে আরবরা সিন্ধু উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসছিল। অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের এক রাজা পাঞ্জাবে আরব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে চীনাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। রাজা ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে কাশ্মীরের সেনাবাহিনী গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত নেমে আসে এবং অন্যদিকে পাঞ্জাবে আরবদের পেছনে হঠিয়ে দেয়। পরবর্তী শতাব্দী-গুলিতে কাশ্মীরের রাজারা পার্বত্য অঞ্চল ও ঝিলম উপত্যকার ওপরের অঞ্চলের নিজেদের অধিকার সুদৃঢ় করেন। পাঞ্জাব নিয়ে তখন আর তাঁরা চিন্তা করেননি। এখানকার সেচব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রধান নদীগুলির ওপর বাঁধ দেওয়া হলো। কাশ্মীরের খরস্রোতা, অশান্ত নদীগুলির ওপর বাঁধ দেওয়া উল্লেখযোগ্য কারিগরি-বিদ্যার পরিচায়ক। সেচের উন্নতির ফলে ব্যাপক অঞ্চলে চাষ শুরু হয়ে গেল। এর ফলে কাশ্মীরের রাজনীতিতে স্থিতি এলো, কেননা এরপর আর সমতলের উর্বর জমি দখলের জন্যে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন রইল না।

দশম শতাব্দীতে দুই বিখ্যাত রানী রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন। নানা বিরোধি-তাকে উপেক্ষা করে রানীরা রাজ্যশাসন চালিয়ে যান। কাশ্মীরের রাজনীতিতে এই সময়ে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়— এবং প্রায় ১০০ বছর ধরে এদের আধিপত্য চলতে থাকে। এই শক্তি হল বিশেষ রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পন্ন দুই প্রতিযোগী সৈন্যগোষ্ঠী— তন্ত্রিন ও একাঙ্গ, যারা নিজেদের শক্তিবলে রাজাদের সিংহাসনে বসাতে ও সিংহাসনচ্যুত করতে পারত। রানী সুগন্ধা একাঙ্গদের তন্ত্রিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তন্ত্রিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি বলে তাদের হাতেই তার সিংহাসনচ্যুতি ঘটে। তাঁর পরাজয়ে তন্ত্রিনরা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং পরবর্তীকালে কোনো রাজাই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত 'ডামর' বা সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সাহায্যে তন্ত্রিনদের ক্ষমতা খর্ব করতে হয়। কিন্তু এরপর কাশ্মীরের রাজাদের সমস্যা হল এই ভূস্বামীদের

আয়ত্তে আনা। রানী দিদ্দার রাজত্বকালের ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্যার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক কলহণ কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কলহনই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট বিবরণ হল বইখানির বৈশিষ্ট্য।

এইযুগে আর একটি পার্বত্যরাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে— নেপাল। তিব্বতের শাসনকে অস্বীকার করে ৮৭৮ সালে নেপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তখন নেপালের নতুন যুগের সূচনা হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর নেপালে অর্থনৈতিক উন্নতি হল। ভারত ও তিব্বতের যোগসূত্র হিসেবে নেপালের মধ্য দিয়েই ভারতের সঙ্গে চীন ও তিব্বতের বাণিজ্য চলত। একাদশ শতাব্দীতে রাজা গুণকামদেবের রাজত্বকালে কাঠমাণ্ডু, পাটান, শঙ্কু প্রভৃতি নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহর নির্মাণের ব্যয়নির্বাহ হয়েছিল প্রধানত বাণিজ্যের আয় থেকেই। কিন্তু শক্তিশালী ভূস্বামী গোষ্ঠী রাণাদের নিয়ে নেপালের রাজাদের সবসময়ই বিব্রত থাকতে হয়েছিল। কাশ্মীরে তুর্কীদের আক্রমণের পর শক্তিশালী ভূস্বামীরা ধ্বংস হয়ে যায় ও পরে নতুন রাজ-বংশের সূচনা হয়। কিন্তু নেপালে কোনো বিদেশী আক্রমণ ঘটেনি— যা হলে হয়তো রাণাদের ক্ষমতা খর্ব হতে পারতো। নেপালের রাজনীতিতে রাজা ও রাণাদের ক্ষমতার ভারসাম্য সবসময়ই ছিল অনিশ্চিত।

কামরূপ বা আসাম ছিল এরকম আরেকটি পার্বত্য রাজ্য। পূর্ব-ভারতের সঙ্গে পূর্ব-তিব্বত ও চীনের বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে কামরূপ ক্রমশ স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিন্তু ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে আহোমরা কামরূপের অনেকটাই জয় করে নেয়। আহোমরা আসামের দক্ষিণ-পূর্ব পর্বতমালার শান উপজাতির লোক। পরে তাদের নামানুসারেই কামরূপের নাম হয়েছিল আসাম।

নবম শতাব্দীতে শাহিয় নামক এক তুর্কী পরিবার কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার অঞ্চল শাসন করত। রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিজেই সিংহাসন দখল করে নেন। নতুন রাজবংশকে বলা হয় হিন্দু শাহিয় রাজবংশ। অন্যান্য আফগান শাসকদের চাপে তাঁকে পূর্বদিকে সরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত আটক অঞ্চলে তাঁর রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আটক ছিল উত্তর-ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রথম রাজার বংশধর জয়পাল রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ করে সমগ্র পাঞ্জাব সমভূমির শাসক হয়ে উঠল। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর রাজার ভারত আক্রমণের সময় জয়-পালই প্রথম গজনীর সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল।

এইযুগেই রাজপুতরা ভারতের ইতিহাসে প্রথম আবির্ভূত হয়। এরা যে কোথা থেকে এসেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্ভবত এরা বিদেশী। এরকম ধারণার কারণ হল, ব্রাহ্মণরা বিশেষ প্রচেষ্টা করে এদের রাজবংশ সম্ভূত বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের ক্ষত্রিয় বর্ণভূক্ত করেছে। আবার, রাজপুতরাও এই আখ্যার ওপর কিছুটা অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। ব্রাহ্মণরা রাজপুতদের আদি পূর্ব-পুরুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের একেবারে সূর্যবংশ বা চন্দ্রবংশ সম্ভূত বলে বর্ণনা

করেছে। অর্থাৎ পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে কোনো রাজবংশকে যতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা যায়, রাজপুতদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা সেই চেষ্টাই করেছে। নবম ও দশম শতাব্দীতে রাজপুত্রদের রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রথম লক্ষিত হয়। এখনো তারা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং তার মধ্যে চারটি গোষ্ঠী বিশেষ সম্মান দাবি করত। তারা হল, প্রতীহার বা পরিহার (মূল প্রতীহারদের সাথে এদের সম্পর্ক থাকলেও এরা পৃথক), চাহমান বা চৌহান, চৌলুক্য (দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের সঙ্গে সম্পর্কহীন) বা সোলাংকি এবং পরমার বা পাওয়ার। রাজস্থানের আবু পাহাড়ের এক বিরাট যজ্ঞের আগুন থেকে এক পৌরাণিক মানবের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই চারটি গোষ্ঠীর দাবি ছিল যে তারা ওই পৌরাণিক মানুষেরই বংশধর। এই কারণে এই চার বংশকে বলা হতো 'অগ্নিকুল'। এই প্রথম শাসকরা তাদের ক্ষত্রিয় মর্যাদার কথা নিয়ে এত বেশি গর্ব করেছেন। আগেকার রাজবংশরা জাতি-কুলবর্ণ নির্বিশেষে রাজত্ব করেছে এবং শাসকের মর্যাদায় আসার পর তারা স্বভাবতই উচ্চবর্ণে স্বীকৃত হয়েছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতরা হুণদের বংশধর। অথবা, হুণদের আক্রমণের সময় আরো যেসব বিভিন্ন উপজাতির লোক ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল এবং পরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্হাপন করেছিল, রাজপুতরা তাদেরই বংশধর। গুপ্তদের শিলালিপি অনুসারে হুণদের আগমণ পর্যন্ত রাজস্হানে ছোট ছোট গণরাজ্যের অবস্হান ছিল। এই গণরাজ্যগুলি ঐতিহ্য নিয়ে তত মাথা ঘামাতো না বলে হুণ আক্রমণকারীরা হয়তো সহজেই এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যেতে পেরেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের তখনকার অশান্ত পরিস্হিতিতে এই মিশে যাওয়া আরো সহজ হয়েছিল।

প্রথমদিকে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল অগ্নিকুলভুক্ত চারটি রাজপুত গোষ্ঠী। প্রাক্তন প্রতীহার রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই রাজপুত গোষ্ঠীগুলি তাদের নতুন রাজ্য গড়ে তুললো। রাজপুত প্রতীহাররা রইল দক্ষিণ-রাজস্হানে, আর চৌহানরা দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পূর্ব-রাজস্হানে রাজত্ব করত। প্রথমদিকে এরা মূল প্রতীহার রাজ্যের সামন্তরাজা ছিল এবং আরবদের আক্রমণ রোধ করতে প্রতীহারদের সাহায্য করেছিল। তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাজারা 'মহারাজাধিরাজ' জাতীয় উপাধি গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাজপুতগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে, মূল পরিবারের আত্মীয় পরিবারগুলি নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি শাসন করে। এই পরিবারগুলি প্রতীহারীদের সামন্তরাজা হিসেবেই রয়ে গেল।

সোলাংকিদের প্রধান রাজপরিবার রইল কাথিওয়াড়ে, আর আত্মীয়স্বজনরা মালোয়া, চেদি, পাটন ও ব্রোচ অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে গেল। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে সোলাংকিদের সঙ্গে প্রায় সমস্ত প্রতিবেশিদেরই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাওয়াররা মালোয়া দখল করে নিল। তাদের রাজধানী ছিল ইন্দোরের কাছে ধার। পাওয়াররা প্রথমে ছিল রাষ্ট্রকূটদের সামন্তরাজা। পরে দশম শতাব্দীর শেষ দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়ে যায়। তবে এছাড়াও আর একটি কাহিনী

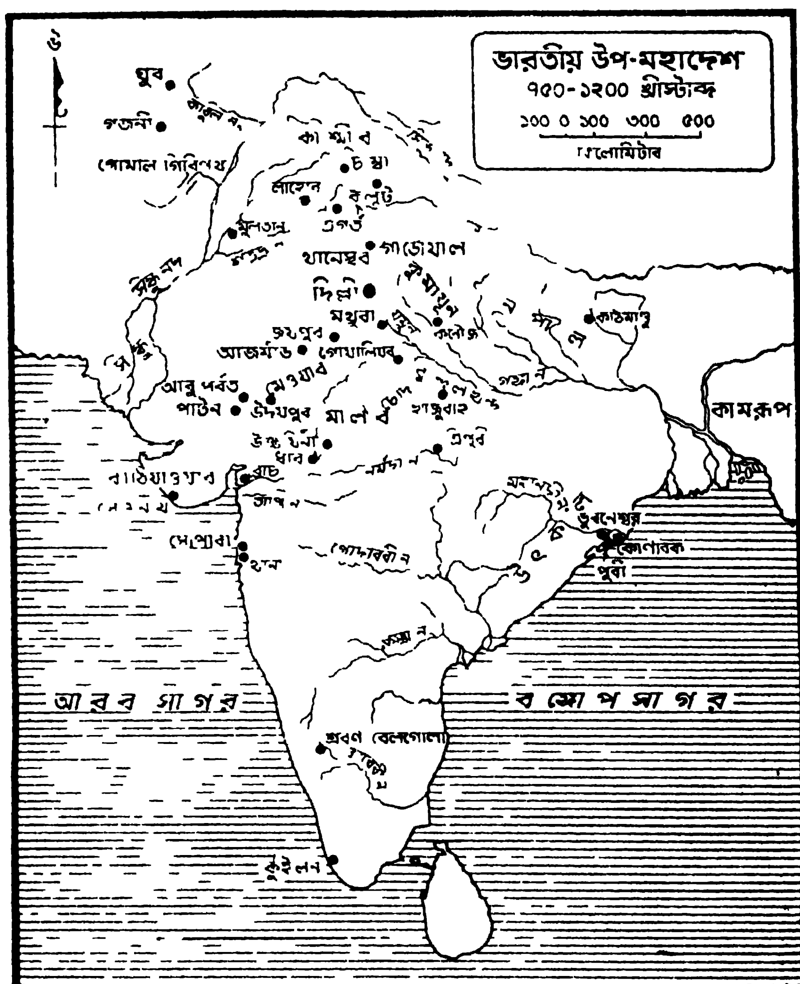
শোনা যায়। বশিষ্ঠ মুনির একটি কামধেনু ছিল। বিশ্বামিত্র মুনি কামধেনুটি চুরি করে নিয়ে যান। তারপর আবু পাহাড়ে বশিষ্ঠমুনি যজ্ঞ শুরু করেন। যজ্ঞের আগুন থেকে এক বীরপুরুষের আবির্ভাব হল। তিনি কামধেনুটি উদ্ধার করে এনে বশিষ্ঠকে দিয়ে দেন। এরপর বশিষ্ঠ ওই বীরপুরুষের নামকরণ করলেন 'পরমার' বা শত্রু-হত্যাকারী। তার থেকেই বর্তমান পরমার বা পাওয়ার বংশের উদ্ভব। বোঝাই যায় 'অগ্নিকুল' কাহিনীর সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই এই কাহিনীর জন্ম। যজ্ঞের আগুনের সঙ্গে বিশুদ্ধীকরণের একটা ব্যাপার জড়িত আছে। এ কারণেও মনে হয়, রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

অন্যান্য রাজপুতগোষ্ঠী, যারা নিজেদের সূর্য্য বা চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে দাবি করত, তারা পশ্চিমে ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য স্থাপন করল। এদের মধ্যে খাজুরাহো অঞ্চলের চন্দেল্লরা দশম শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেওয়ারের গুহিল গোষ্ঠীরা রাজ্যস্থাপন করেছিল চৌহানদের রাজ্যের দক্ষিণদিকে। এরাও আরব-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আরব আক্রমণের ফলে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে ও পশ্চিম-ভারতে তাদের সামন্ত রাজ্যগুলি একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করে। চৌহান রাজ্যের উত্তর-পূর্বদিকে ছিল তোমররা। এরাও প্রতীহারীদের সামন্তরাজা ছিল। এরা দিল্লীর কাছে হরিয়ানা অঞ্চলে রাজত্ব করত—হর্ষের দেশ থানেশ্বরাও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরাই ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ধিল্লিক বা দিল্লী শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা তোমর রাজ্য অধিকার করে নেয়। প্রতীহারদের আরেকটি সামন্তরাজ্যও স্বাধীনতা ঘোষণা করে-ছিল। তারা হল ত্রিপুরীর (জব্বলপুরের কাছে) কলচুরিরা।

উত্তর-ভারতকে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি। হুণদের আক্রমণের কথা তখন সবাই ভুলে গেছে এবং আরব আক্রমণের মোকাবিলা করাও কঠিন হয়নি। ৪০০ বছর ধরে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধবিগ্রহে রত ছিল। সামান্য অজুহাত থেকে যুদ্ধ বেধে যেত এবং অকারণে রাজ্যগুলি অর্থ ও শক্তিক্ষয় করত। সামন্ত রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর চতুর্দিকে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হতো। স্থানীয় ব্যাপার নিয়েই রাজ্যগুলি এত ব্যস্ত হয়ে পড়ত যে, বাইরের দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তারা ভাববার অবসরই পেত না এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ কমে গেল। পশ্চিমী জগতের সঙ্গে ব্যবসা হ্রাস পেল এবং পশ্চিমের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। উপমহাদেশে একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব দেখা দিল। রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে। এরপর একাদশ শতাব্দীতে তাদের আত্মমগ্নতায় প্রথম আঘাত এলো। রাজেন্দ্র চোল পূর্ব উপকূল ও উড়িষ্যা অঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা করে বেশ সাফল্যলাভ করলেন। তাঁর সেনাদল গঙ্গানদীর উত্তরতীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গজনীর শাসক মামুদের আক্রমণ শুরু হল।

গজনী ছিল আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি ছোট্ট রাজ্য। এক তুর্কী ওমরাহ

৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার সংলগ্ন কিছু অংশ ও শাহির রাজ্যের সিন্ধুর পরপারবর্তী সংলগ্ন অঞ্চলগুলি অধিকার করে নেন। তার ২১ বছর পরে তাঁর পুত্র মামুদ গজনীকে মধ্য-এশিয়ার এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করার পরিকল্পনা করেন।



মামুদের ভারত আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এদেশের অঢেল ঐশ্বর্য ও উর্বরা পাঞ্জাব সমভূমি অঞ্চল। তাদের নিজেদের অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলের তুলনায় পাঞ্জাবের সমভূমি আরো লোভনীয় ও শস্যশামল মনে হতো। এইযুগে আফগানিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে ভারতের চেয়ে মধ্য-এশিয়ারই বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং মামুদ ভারত আক্রমণ নিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করেন নি। এছাড়া, চীন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলির লাভজনক বাণিজ্য থেকেও মামুদের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি

ঘটত। সেজন্যে ভারতেরাজত্ব করার চেয়ে মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করাই মামুদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর রাজকোষ পূরণের জন্যেই মামুদ ভারত আক্রমণ শুরু করলেন। ভারত আক্রমণ শেষ করে মামুদ অদ্ভুত দ্রুতগতিতে মধ্য-এশিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।

এরপর ভারত আক্রমণ প্রায় বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হলো। প্রথমে ১০০০ খ্রীস্টাব্দে শাহির রাজা জয়পালকে মামুদ পরাস্ত করলেন। পরের বছর মামুদ সিস্তান আক্রমণ করেন। ১০০৪ থেকে ১০০৬ খ্রীস্টাব্দে মুলতানের ওপর বারংবার আক্রমণ চালালেন। সিন্ধুনদীর নিম্নভাগের নিয়ন্ত্রণের জন্যে মুলতান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাঞ্জাবে দ্বিতীয়বার আক্রমণ হলো ১০০৮ খ্রীস্টাব্দে। মামুদ প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে গজনীতে ফিরে গেলেন। কয়েক বছর ঘুর অঞ্চলের (আফগানিস্তানের হীরাট ও গজনীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) শাসকের সঙ্গে মামুদের সংঘর্ষ বেধে যায়। মামুদের সেনা-বাহিনী ছিল দ্রুতগতি ও রণনিপুণ। নইলে প্রতিবছর বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালানো সম্ভব হতো না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ফসল কাটার পরই আফগান সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হতো।

ভারতবর্ষের মন্দিরগুলিতে প্রচুর ধনসম্পদ গচ্ছিত থাকত। টাকা, সোনা, মূর্তি ও গয়না ইত্যাদি যেকোনো আক্রমণকারীরই লোভের বস্তু ছিল। মামুদ সোনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেজন্যে ১০১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মামুদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মথুরা, থানেশ্বর, কনৌজ এবং সোমনাথের মন্দিরগুলি। সোমনাথের মন্দিরের ধনসম্পদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। স্বভাবতই এই মন্দির মামুদের আক্রমণের বিশেষলক্ষ্য ছিল। এছাড়াও ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে দেবমূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হতো। সোমনাথ মন্দিরের উন্মত্ত ধ্বংসকাণ্ডের কথা হিন্দুরা বহু শতাব্দী ধরে ভুলতে পারেনি। মামুদের চরিত্রের মূল্যায়ণ করবার সময় বারবার এই মন্দির বিনষ্ট করার কথা এসে পড়ে। এমনকি মুসলমান রাজাদের সম্পর্কে সাধারণভাবে হিন্দুদের যা ধারণা তাও কখনো কখনো সোমনাথের স্মৃতি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক আরব বিবরণ পাওয়া যায়।

··সোমনাথ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ও ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত শহর। এই শহরের সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হলো সোমনাথ নামক দেবতার মন্দির। মন্দিরের একেবারে মধ্যস্থলে মূর্তিটি রাখা ছিল। হিন্দুরা এই দেবতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। দেবমূর্তিটি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ছিল। মুসলমান বা বিধর্মী, সকলের কাছেই এটি পরম বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় হিন্দুরা মন্দিরে তীর্থ করতে আসত। তখন ১ লক্ষ হিন্দুর সমাবেশ হতো। হিন্দুদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার সঙ্গে দেবতার সাক্ষাৎ হতো। দেবতা পুনর্জন্মের নিয়মানুসারে আত্মাগুলি নতুন দেহের মধ্যে পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবেই আত্মার দেহান্তর ঘটত। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, সমুদ্র এইভাবে দেবতার পুজো করছে। পুজার উপাচার হিসেবে মানুষ মূল্যবান সামগ্রী মন্দিরে নিয়ে আসত। ১০

হাজারেরও বেশি গ্রাম মন্দিরকে দান হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। গঙ্গা নামে একটি নদী আছে, নদীটিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। নদীটি ও সোমনাথের মধ্যে— দূরত্ব হল ২০০ 'পরাসাঙ্‌'। প্রতিদিন তারা এই নদীর জল নিয়ে আসত সোমনাথে, তা দিয়ে মন্দিরটি ধৌত করত। দেবতার পুজো ও তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনার জন্যে ১ হাজার ব্রাহ্মণ পুজারী ছিল। ৫০০ তরুণী প্রবেশদ্বারের কাছে নৃত্যগীত করত। এদের সকলের ব্যয়নির্বাহ হতো দানের অর্থ থেকে। এই বিরাট মন্দির ৫৬টি 'টিক' কাঠের স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভগুলি সীসা দিয়ে মোড়া ছিল। দেবতার কক্ষটি ছিল অন্ধকার। সেটি আলোকিত হতো রত্নখচিত বহুমূল্য ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর দ্বারা। কক্ষের মধ্যে একটি সোনার শিকল ছিল। তার ওজন ছিল ২০০ মণ। রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে পুজারী ব্রাহ্মণদের ঘুম থেকে জাগানোর জন্যে শিকলটি ঘণ্টার মতো বাজানো হতো। একেক প্রহরে একেক দল পুজারী পুজো করত। সুলতান যখন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন, তিনি সোমনাথ দখল ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। আশা ছিল, এভাবেই হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাবে। সুলতান···১০২৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এখানে আসেন। ভারতীয়রা মন্দির রক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করেছিল। রোরুদ্যমান যোদ্ধারা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করত এবং তারপরই বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে করতেই মারা যেত। অন্তত ৫০ হাজার লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সুলতান মূর্তিটি দেখে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার হিসেব তৈরি করতে আদেশ দিলেন। মন্দিরে সোনা ও রূপোর তৈরি অনেকগুলি মূর্তি ও প্রচুর রত্নখচিত পাত্র ছিল। ভারতের বিখ্যাত লোকেরা এগুলি মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। মন্দিরের নানা দ্রব্য ও মূর্তিগুলির মূল্য হবে ২০ হাজার দীনারেরও বেশি। সুলতান এরপর তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, মূর্তিটি কি কৌশলে শূন্যে ভেসে আছে? কেউ কেউ বলল যে, নিশ্চয়ই কোনো গোপন উপায়ে মূর্তিটিকে তুলে ধরা হয়েছে। তখন সুলতান একজনকে আদেশ দিলেন, বর্শা দিয়ে মূর্তিটির ওপর ও নিচেকার অংশ বিদ্ধ করে গোপন কৌশলটি উদ্‌ঘাটন করতে হবে। বর্শা কোনো কিছুতেই বিদ্ধ হলো না। একজন বললো, চন্দ্রাতপটির মধ্যে চুম্বক আছে এবং মূর্তিটি লোহার তৈরি। কারিগর এমন একটা কৌশল করেছে যার ফলে চুম্বকটির আকর্ষণে মূর্তিটি একেবারে ওপরে উঠে না এসে শূন্যে অবস্থান করবে। কেউ কেউ এই অভিমত মেনে নিল, কেউ কেউ মানল না। এরপর এই অভিমত যাচাই করার জন্যে সুলতান চন্দ্রাতপ থেকে কয়েকটি পাথর সরিয়ে দিতে বললেন। দুটি পাথর সরানোর পরই মূর্তিটি এক-পাশে হেলে গেল। আরো কয়েকটি সরানোর পর মূর্তিটি আরো ঝুঁকে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত এটি মাটির ওপর কাত হয়ে পড়ল।[১]

১০৩০ সালে মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে উত্তর-ভারতের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ভারতবর্ষে মামুদ লুণ্ঠনকারী ও মূর্তিভঙ্গকারী হিসেবে পরিচিত হলেও লুণ্ঠিত অর্থসম্পদ তিনি সৎকাজে ব্যয় করেছিলেন। এই অর্থব্যয়ে তার চরিত্রের আরেকটি দিক প্রকাশ পায়—সংস্কৃতিবান অভিজাত মামুদ গজনীতে গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম

ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মামুদ খারাজামের অভিযান থেকে আলবেরুণী নামে এক পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। ইনি ছিলেন মধ্য-এশিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। আলবেরুণী ১০ বছর মামুদের আদেশ অনুসারে ভারতবর্ষে কাটিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও'র বইয়ের নাম 'তাহাকিক-ঈ-হিন্দ'। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর কিছু তীক্ষ্ণ ও গভীর মন্তব্য পাওয়া যায় এই বইখানিতে।

মামুদের আক্রমণ সত্বেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারের জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ভারত সচেতন হয়নি। বিভিন্ন রাজ্য পারস্পরিক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু জাতীয় ভিত্তিতে দেশের নানা অঞ্চল থেকে সামরিক সাহায্য সংগ্রহ করে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো চেষ্টা হয়নি। সমগ্র দেশ তো দূরের কথা, শুধু উত্তর-ভারতকে রক্ষা করার জন্যেও কোনো সমবেত চেষ্টা দেখা যায়নি। প্রতিরক্ষা বলতে বোঝাতো কেবল তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার চেষ্টা। মামুদের আক্রমণের পরেও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে যে ভবিষ্যতে আবার আক্রমণ আসতে পারে, সেকথা কেউ উপলব্ধি করেনি। আগেকার শক ও হুনদের মতো মামুদকে কেবল আরেকজন ম্লেচ্ছ হিসেবে সবাই দেখেছিল। আগেকার আক্রমণকারীদের মতো মামুদ ও তাঁর সেনাবাহিনীও ভারতীয় জনসমাজে মিশে যাবেন, এই ছিল বিশ্বাস। উপরন্তু মামুদের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজনও লোপ পেল, বিশেষত যখন মামুদের পরবর্তী শাসকরাও উত্তর-ভারতীয় সমভূমি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। অতএব, ভারতীয় রাজারা আগের মতো পারস্পরিক বিবাদে মনোনিবেশ করলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যখন দ্বিতীয়বারের আক্রমণ এলো, উত্তর-ভারত তখন আগের বারের মতোই যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

মামুদ কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হলেও গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাংশে পাঞ্জাবের মতো বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটেনি। কনৌজ অল্পকালের মধ্যেই হৃতগৌরব ফিরে পেল এবং আগের মতোই বিভিন্ন রাজ্য কনৌজ দখল করার জন্যে প্রতিযোগিতায় মাতল। এদের মধ্যে ছিল চালুক্য এবং গাহড়বালরা, যারা পরে রাজপুত বলে নিজেদের দাবি করেছিল। বিহার শাসন করত এক কর্ণাটক রাজবংশ। নাম দেখে মনে হয় যে এরা দক্ষিণ-ভারতীয়। এই যুগের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজকর্মচারী পূর্ব-ভারতে নানা কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ রাজ্যস্থাপনও করেছিল। জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরী অঞ্চলে কাকচুরি বংশ শাসন করছিল। সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশে সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তুর্কী সেনাপতি মহম্মদ খলজীর আক্রমণে সেনবংশের পতন হয়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ধরে রাজপুত গোষ্ঠীগুলি আগের মতোই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রইল। রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখা সব রাজার পক্ষেই

কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সবরাজ্যই সবসময় নিজের সীমানা বাড়াতে ব্যস্ত ছিল। যুদ্ধ বীরত্ব প্রদর্শনের অঙ্গ হয়ে উঠল। পরমার বংশ মালোয়া অঞ্চলে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করল। সোলাংকিরা ছিল গুজরাটের কাছে কাথিওয়াড়ে, আবার চন্দেল্ল গোষ্ঠী পরমার ও কলচুরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত রইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা চন্দেলদের আক্রমণ করল। গুহিলরা মেবার অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী ছিল। কচ্ছপঘাত গোষ্ঠী গোয়ালিয়র ও নিকটবর্তী জেলাগুলি শাসন করত। দিল্লীর কাছে তোমরদের রাজ্য অধিকার করেছিল চৌহানরা। তারা নানা বাধাবিপত্তি সত্বেও দীর্ঘদিন রাজত্ব বজায় রেখেছিল। সর্বশেষ চৌহান রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রোমাণ্টিক নায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন কনৌজের রাজকন্যাকে বিয়ে করার ঘটনাটির পর। চারণকবি চাঁদ বরদাই তাঁর দীর্ঘকাব্য 'পৃথ্বীরাজরসো'তে এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কনৌজের রাজকন্যার জন্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছিল। কনৌজ রাজদরবারে আহুত স্বয়ংবর সভায় সম্মিলিত হয়েছিল নানা যোগ্য প্রার্থী ঃ তাঁদের মধ্য থেকেই রাজকন্যার স্বামী নির্বাচন করবার কথা। রাজকন্যা মনে মনেই পৃথ্বীরাজকেই ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কনৌজের রাজার শত্রু। পৃথ্বীরাজকে স্বয়ংবর সভার কোনো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। উপরন্তু তাঁকে অপমান করার জন্যে পৃথ্বীরাজের একটি মূর্তি তৈরি করে রাজসভার দ্বাররক্ষীর জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজকন্যা উপস্থিত রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করে সোজা দ্বাররক্ষীর মূর্তির গলায় হাতের মালা পরিয়ে দিলেন। কেউ ভালো করে কিছু বোঝার আগেই পৃথ্বীরাজ তাঁর গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেলেন। নিজের রাজ্যে ফিরে এসে দুজনের বিয়ে হলো। কিন্তু তাঁদের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন।

ঘোরীবংশের রাজা মহম্মদ ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করে গোমাল গিরিপথ দিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেন। আগেকার আক্রমণকারীরা আরো উত্তর-দিকের খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। সিন্ধু প্রদেশের রাজা ১১৮২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদের প্রভুত্ব মেনে নেন। মহম্মদ কেবল লুট করার জন্যেই আক্রমণ করেন নি, রাজ্যস্থাপন করাই তাঁর মনোবাসনা ছিল। সিন্ধু উপত্যকার উপরের অঞ্চল ও পাঞ্জাবের উর্বর ভূখণ্ড দখল করাই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল।

আক্রমণ শুরু হবার পর ১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ লাহোর দখল করে নেন। এরপর তিনি আরো অঞ্চল দখল করার পরিকল্পনা করেন। এর পরের আক্রমণের সম্মুখীন হল গাঙ্গেয় সমভূমির রাজপুত রাজ্যগুলি। রাজপুতরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলেও পুরনো ঝগড়া ও ঈর্ষা তখনো কেউ ভুলতে পারল না। মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে ১১৯১ সালে তরাই-এর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে রাজপুতরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু কয়েকমাস পরেই ১১৯২ সালে একই জায়গায় দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হলেন। দিল্লী ও আজমীর রাজ্য মহম্মদ ঘোরীর দখলে

চলে এল। কিন্তু ১২০৬ সালে মহম্মদ ঘোরী ঘাতকের হাতে নিহত হলেন কিন্তু সেজন্যে তুর্ক-আফগানরা ভারত ছেড়ে চলে যায়নি। তাঁর উত্তরাধিকারীরা মহম্মদের লক্ষ্য সফল করার জন্যে ভারতে থেকে গেল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আফগান* সেনাবাহিনী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই সাফল্য কিভাবে অর্জন করল! আফগানরা এর আগে সীমান্ত অঞ্চলে বারবার আক্রমণ করলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব যে কি হতে পারে, তা কেউ অনুমান করতে পারেনি। সুদূর উত্তরে আফগানরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করছিল। সে কারণেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারেনি। আফগানরা সীমান্তের ওপার থেকে ক্রমাগত ঘোড়া ও সেনাদল এনে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু ভারতীয়দের সামরিক শক্তির কোনো পরিবর্তন হয়নি। লুণ্ঠনের লোভে আফগান সৈনিকরা যুদ্ধে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। কিন্তু পারস্পরিক যুদ্ধে ক্লান্ত ভারতীয় সৈনিকরা নতুন যুদ্ধে আর তেমন করে লড়তে পারেনি।

মধ্য-এশিয়া থেকে আমদানি করা ঘোড়াগুলি থাকায় সম্মুখযুদ্ধে আফগানদের খুবই সুবিধে হয়েছিল। ভারতীয়দের ঘোড়াগুলি সেরকম ভালো ছিল না বলে অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধে তেমন কাজে লাগানো হতো না। ভারতীয় সেনানায়করা রণহস্তীগুলির ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে এরা এঁটে উঠতে পারেনি। আফগানরা মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল। তার মূল কথা ছিল দ্রুতগতি ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র।

ভারতীয়রা ভেবেছিল ঘনবিন্যস্ত ব্যূহরচনা করে তারা এগিয়ে যাবে। কিন্তু আফগানদের আকস্মিক আক্রমণের কৌশল ভারতীয়দের বিপদে ফেলে দিল। আফগানরা এরপর দুর্গগুলি অধিকার করার দিকে মন দিল। এর ফলে ভারতীয়রা পার্বত্য অঞ্চলে চলে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিল। কিন্তু তাতে সুবিধে হয়নি। আফগান সেনাবাহিনীর যাতায়াতের সময় তাদের ওপর গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালালে হয়তো সুফল পাওয়া যেত, কিন্তু তেমন চেষ্টা বিশেষ দেখা যায়নি।

এছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে দুপক্ষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য ছিল। আফগানরা যুদ্ধকে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার মনে করত। কিন্তু ভারতীয় রাজাদের কাছে যুদ্ধ ছিল একধরনের খেলা এবং তার কিছু কিছু নিয়মও তারা মেনে চলত। ছোটখাট যুদ্ধে সেরকম নিয়ম মেনে বীরধর্ম প্রদর্শন করা সম্ভব হলেও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এসবের অবকাশ ছিল না। প্রথমদিকে ভারতীয় রাজারা হয়তো এই পার্থক্যটাই অনুধাবন করতে পারেন নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠনের মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। সেনাবাহিনীর-কেবল একটা অংশই রাজার প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যান্য সৈনিকরা আসত সামন্তরাজাদের কাছ থেকে। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে তেমন ঐক্য ছিল না।

* দিল্লী সুলতানীর প্রথমদিকের শাসকরা প্রধানত মধ্য এশিয়ার তুর্কীজাতিভুক্ত ছিলেন। এঁদের অনেকে আফগানিস্তানে বসবাস শুরু করেন। ভারত আক্রমণকারী সেনাদলে তুর্কী, পারস্যদেশীয় ও আফগান সৈনিক ছিল। সুবিধের জন্যে এদের সকলকেই আফগান সেনাবাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধরা হয়েছে, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল আফগান।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, ভারতীয় রাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা কেন করেন নি। বারংবার উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে বিদেশীরা ভারতে আসা সত্ত্বেও সেখানকার প্রতিরক্ষার ভার ছিল স্থানীয় শাসন-কর্তাদের ওপরই। কোনো বড় প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব না হলেও দুর্গ নির্মাণ করে গিরিপথ-গুলিকে সুরক্ষিত করা যেতে পারত। সম্ভবত প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতারই অভাব ছিল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের ঘোরী রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু ভারতে মহম্মদ যে রাজ্য স্থাপন করে যান সেটি ক্রমশ দিল্লীর সুলতানীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো। ভারতের রাজনীতিতে তুর্কী ও আফগান সুলতানদের অবির্ভাব হল। মহম্মদের মৃত্যুর পর ভারতীয় অঞ্চলগুলির শাসনের দায়িত্ব ছিল তাঁর এক সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক-এর ওপর। এরপর ইনিই এখানকার সুলতান হয়ে এসে দাস-রাজবংশের সূচনা করলেন। কুতুবুদ্দীন প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। কুতুবুদ্দীন চৌহান রাজ্যের অংশগুলি অধিকার করে গোয়ালিয়র ও উত্তর-দোয়াব (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী উর্বরা অঞ্চল) অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। রাজস্থান অধিকার করার জন্যেও তিনি কয়েকবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজপুত গোষ্ঠীগুলি তাঁর সে চেষ্টা সফল হতে দেয়নি।

১১৯৩ থেকে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে যখন মহম্মদ এবং কুতুবুদ্দীন দুজনেই কিছুটা দুর্বল অবস্থায় ছিলেন, সমবেত চেষ্টায় তাঁদের পরাজিত করে উত্তর-ভারত থেকে বিদায় করে দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এ সুযোগের কেউ সদ্ব্যবহার করেন নি। আফগানিস্তান থেকে বহিঃশত্রুর আগমণের ফলে বিদেশী ও স্বদেশী রাজনীতিতে কি ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে, তা বুঝতে পারলে হয়তো প্রতিরক্ষার একটা সমবেত চেষ্টা হতো। এর কারণও আছে। তার আগের কয়েকশো বছর ধরে শতদ্রু নদীর উত্তরে পাঞ্জাবের যে অঞ্চল, তা সব সময়ই মধ্য-এশিয়া ও আফগানি-স্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ত। এই নৈকট্যের ফলে মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে পাঞ্জাব অঞ্চলের রাজ্যগুলির যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। তাদের ধারণা ছিল মধ্য-এশিয়ার শক, কুষাণ ও হূণদের মতো তুর্কীরাও পাঞ্জাবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। তুর্কীরা যে ভারতবর্ষের গভীরে এসে পড়বে, শতদ্রু নদীর দক্ষিণতীরের রাজ্যগুলিও তা অনুমান করতে পারেনি।

এছাড়া, পাঞ্জাব ব্যতীত উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই এমন কিছু ছিল যার জন্যে নতুন পরিস্থিতি অনুধাবন করার মনোবৃত্তিই তৈরি হতে পারেনি।

আলবেরুণীর বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই এই মনোভাব সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে।

"…ভারতীয়রা মনে করত যে তাদের মতো আর কোনো দেশ হয় না, কোনো জাতি হয় না, কোনো ধর্ম হয় না, কোনো বিজ্ঞানও হয় না।…ভারতীয়রা নিজেদের জ্ঞান অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চাইত না। এক বর্ণের লোক অন্য

বর্ণের মানুষের কাছে এবং বিদেশীদের কাছে নিজেদের জ্ঞান গোপন রাখার চেষ্টা করত।"[২]

"...ভারতীয়রা সবসময়ই বিশৃংখলার মধ্যে বাস করে। তাদের কাছে যুক্তির কোনো মূল্য নেই। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে জনতার খেয়ালে আচরণ করাই এদের বৈশিষ্ট্য। আমি কেবল ভারতীয়দের অঙ্ক ও নক্ষত্রবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানেরই তুলনা করতে পারি। কিন্তু তাদের কাছে মুক্তাও যা পশুর বিষ্ঠাও তাই। নুড়ি-পাথরের যা মূল্য, দামী স্ফটিকেরও তাই। তাদের কাছে সবই সমান। কেননা এরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না ...।"

দুর্ভাগ্য যে আলবেরুণী যখন ভারতে এলেন, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সবচেয়ে খারাপ সময় চলছিল। তিনি ৪০০ বছর আগে ভারত-ভ্রমণে এলে তাঁর সজীব মন সেযুগের পূর্ণোদ্যম জ্ঞানচর্চায় অংশ নিতে পারত। একাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতে সংকীর্ণচিত্ততাই ছিল স্বাভাবিক। এর পরিণাম হয়েছিল তুর্কী ও আফগানদের ভারত অধিকার। সৌভাগ্যের কথা এই, আক্রমণ সত্ত্বেও জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি। বরং জীবনযাত্রার মধ্যে এক নতুন সঞ্জীবনী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটল।

১১

আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে সামন্ততন্ত্র

আনুমানিক ৮০০ — ১২০০ খ্রীস্টাব্দ

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত এই যুগে ছোট ছোট রাজ্যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবার পিছনে নানা কারণ আছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের আলাদা একটা আঞ্চলিক আনুগত্য গড়ে উঠছিল। আগের যুগের বৃহৎ ও কেন্দ্রভিত্তিক রাজ্যগুলির পতনের পর নগরের প্রতি অর্থ-নৈতিক নির্ভরতা বা কেন্দ্রের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্যের কোনো প্রয়োজন রইল না। বরং সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল। সারা দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সকলে আঞ্চলিক সমস্যার দিকেই নজর দিল।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির একটা ফল হল ঐতিহাসিক রচনার সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতি। কাশ্মীরের মতো ছোট অঞ্চলের এবং ছোট ছোট রাজবংশেরও পারিবারিক ইতিহাস রচিত হল। সমুদ্রগুপ্তের মতো সম্রাট না হওয়া সত্ত্বেও ছোট রাজাদের নিয়ে প্রশস্তিকাব্য রচিত হতে লাগল। ছোট রাজাদের উল্লেখযোগ্য বংশ পরিচয় তৈরি করার আগ্রহে প্রাচীন বড় রাজাদের সঙ্গে ছোট রাজাদের বংশের একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নেওয়া হতে লাগল। কাব্যগাথা ও মহাকাব্য ধরনের রচনা স্থানীয় গৌরবের প্রকাশ মাধ্যম হল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'পৃথ্বীরাজরাসো' (যদিও বর্তমানে প্রচলিত রচনাটি মূল রচনা নয়)।

কেন্দ্রীয় শাসনের পরিবর্তে এই যে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠল, তাকে ব্যাপক অর্থে বলা যায়- সামন্ততন্ত্র। প্রথমে উত্তর-ভারতে ও পরে দাক্ষিণাত্যে এই নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। তবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য ছিল বলে এই আখ্যা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। তাই, অনেক ঐতিহাসিক এই কাঠামোকে 'প্রাস সামন্ততান্ত্রিক' বা 'সামন্ততন্ত্র ধাঁচের' বলে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এত সতর্কতার প্রয়োজন হয় না, যদি আগেই বলে দেওয়া হয় যে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র প্রধানত এক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সামন্ততন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। যেমন, কয়েক ধরনের ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মতো ভারতের অর্থনৈতিক চুক্তির ওপর তেমন জোর দেওয়া হতো না। তবে এই পার্থক্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয় যে, এই যুগের ভারতীয় পরিস্থিতিকে সামন্ততন্ত্র আখ্যা দিলে কিছু ভুল হবে।

সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তগুলি ভারতবর্ষে ছিল। রাজা তাঁর কর্মচারী বা অনুগ্রহভাজনদের জমির খাজনা ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সপ্তম

শতাব্দীর পর থেকে বেতনের পরিবর্তে জমি দেওয়ার প্রথা শুরু হওয়ায় সামন্ত-তন্ত্রের পথ সুগম হয়ে ওঠে। শূদ্র চাষীরা মাঠে কাজ করত। উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ চাষীরা জমির মালিককে দিয়ে দিত। মালিকরা তাদের জমি চাষীদের দিয়েও দিতে পারত এবং পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের অংশ পেত। শস্যের একটা অংশ পাঠাতে হতো রাজাকে। জমির মালিককে রাজার প্রতি তার আনুগত্য স্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক করও দিতে হতো। এই চুক্তি ভঙ্গ করা গুরুতর অপরাধ ছিল। সামন্ত প্রভুদের, আদিষ্ট হলে, রাজার সঙ্গে নিজেদের মেয়েদের বিয়েও দিতে হতো। তাঁরা প্রভুর মুদ্রা ব্যবহার করতেন। কোনো সৌধ, শিলালিপি ইত্যাদি করতে হলে তার মধ্যে প্রভু রাজার নাম উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

রাজার সঙ্গে সামন্তদের সম্পর্ক ছিল নিকট, কিন্তু সামন্তরা ছিলেন রাজার অধীন। সম্পর্কের খুঁটিনাটি নির্ভর করত, কিভাবে এই সম্পর্ক শুরু হয় তার ওপর। যুদ্ধে পরাজিত সামন্তদের নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল সামান্যই। আবার, ক্ষমতাশীল সামন্তরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ভূমিদান করতে পারত। এধরনের সামন্তদের অধীনে কিছু উপ-সামন্ত থাকত। এইভাবে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হতো। গুপ্তযুগের শেষদিকের একটি শিলালিপিতে এই ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে এটি হলো অন্যতম প্রাচীন সাক্ষ্য। বলা হয়েছে— গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন সুরশ্মিচন্দ্র এবং তাঁর অধীনে উপসামন্ত ছিলেন মাতৃবিষ্ণু। পরবর্তী চালুক্যদের শিলালিপিতে এ ধরনের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অনেক উল্লেখ আছে। নিয়মিত খাজনা দেওয়া ও রাজার প্রয়োজনের জন্যে কিছু সংখ্যক সৈনিকের ভরণপোষণ করা ছাড়াও সামন্তদের আরো কিছু দায়িত্ব ছিল। রাজার জন্মদিন এবং আরো কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে রাজসভায় হাজির থাকা সামন্তদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। ছোট সামন্তরা তাদের সম্পত্তির পরিচালনার ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে রাজার অনুমতি প্রয়োজন হতো। এর পরিবর্তে সামন্তরা নিজেদের পদমর্যাদা অনুসারে নানারকম উপাধি গ্রহণ করতে পারতেন ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারতেন। যেমন, হাতির পিঠে চড়ে শোভাযাত্রা, বিশেষ ধরনের পালকী বা পাঁচ রকমের বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে আগমনবার্তা ঘোষণা ইত্যাদি। পদমর্যাদা অনুসারে উপাধিও নানারকম হতো। ক্ষমতাশালী সামন্তরা 'মহাসামন্ত' 'মহামণ্ডলেশ্বর' ইত্যাদি উপাধি নিতেন, আর ছোট সামন্তদের উপাধি ছিল 'রাজা', 'সামন্ত', 'রাণক', 'ঠাকুর', 'ভোক্তা' ইত্যাদি। এইসব উপাধির কোনো কোনোটি এসেছিল গুপ্তযুগের সময় থেকে। তবে, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেই এগুলির অনুমোদন আরো যথাযথ হয়ে ওঠে।

যুদ্ধের সময় সামন্তরা রাজাকে সৈন্যসরবরাহ করতে বাধ্য ছিলেন। সামন্তপ্রথার এই সামরিক দিকটা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বেড়ে যাবার ফলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৈন্য সরবরাহের পরিবর্তে রাজাকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদানের ব্যবস্থা থাকলেও এটি কোনো সুপ্রচলিত রীতি ছিল না। রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করার পর সামন্তরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে

সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ করবেন, এই ছিল রীতি। শান্তির সময়ে রাজা কিছুদিন অন্তর সামন্ততান্ত্রিক করের পরিমাণ নিজে পর্যালোচনা করতেন ও এইভাবে নিজের প্রভুত্ব সম্পর্কে সামন্তদের সচেতন করে দিতেন। দুর্গ ইত্যাদি সবসময় যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সৈন্য সজ্জিত করে রাখা হতো, যাতে যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষায় অসুবিধে না হয়। এইসব কারণে সামরিক দিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় রাজপুত গোষ্ঠীগুলির উত্থান হল। মোটামুটি ১০০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে সামরিক প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল। আগের যুগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক রাজ-কর্মচারীদের ভূমিদান করা শুরু হল। আগের যুগের সামন্তরা প্রধানত ছিল মূলত ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। জমির রাজস্ব ও সামরিক দায়িত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হতো।

পুঁথিগতভাবে ভূমিদান বলতে কেবল ভূমির রাজস্বটুকুই দান করা বোঝাতো, ভূমি নয়। রাজাকে রাজস্বের অংশ দিতে অক্ষম হলে ওই জমি রাজা বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারতেন। গ্রহীতাদের জীবনকালের জন্যেই ভূমিদান করা হতো এবং তার মৃত্যুর পর রাজা ইচ্ছে করলে ওই জমি অন্য কাউকে আবার দান করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে সামন্তরা পুরুষানুক্রমেই জমি ভোগ করতেন। দুর্বল রাজাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা আরো বেশি ঘটত। এরকম ঘটনার কথাও জানা গেছে যেখানে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরিবার পাঁচ পুরুষ ধরে দান করা জমি ভোগ করে গেছে এবং পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচ পুরুষ ধরেই রাজার মন্ত্রীর পদলাভ করেছে। পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করলে শুধু জমির খাজনা নয়, জমির ওপরেও অধিকার দাবি করা অসম্ভব ছিল না। তবে একাজ ছিল বেআইনী।

কোনো অঞ্চলের রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করার জন্যে দাক্ষিণাত্যে দশটি করে গ্রাম একসঙ্গে একক ধরা হতো এবং উত্তরাঞ্চলে, বিশেষত রাজপুত রাজ্য-গুলিতে ১২ বা ১৬ গ্রামের একক ধরার প্রথা ছিল। পাল রাজাদের ভূমিরাজস্ব দান করার সময়ে একসঙ্গে ১০টি গ্রাম দেবার উল্লেখ পাওয়া গেছে (দশগ্রামিকা)। প্রতীহারদের রাজত্বকালে একসঙ্গে ৮৪টি করে গ্রাম গণনা হতো। পরে এই ৮৪টি গ্রামের সমষ্টিকে একজন গোষ্ঠীপতির ভূমির সাধারণ পরিমাণ ধরে নেওয়া হয়। এই দশম শতাব্দীর শাসনব্যবস্থার থেকে কখনো কখনো পরবর্তীযুগের রাজপুত-কুলের রাজ্যের সূচনা হয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলে ১২টি গ্রাম নিয়েই একেকটি অঞ্চল গঠিত হতো এবং সেগুলিকে একত্র করে ৮৪টি গ্রামের এলাকা গঠন করতে কোনো অসুবিধে ছিল না।

গ্রামগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে মোটামুটি স্বনির্ভর ছিল। বাড়তি উৎপাদন করে ব্যবসা শুরু করার বিশেষ চেষ্টা দেখা যেত না। অতিরিক্ত উৎপাদন করে চাষীর বিশেষ লাভ ছিল না, কেননা বাড়তি ফসল দেখে জমির মালিক বেশি অংশ দাবি করবে। বেশি উৎপাদনের কোনো উৎসাহ না থাকায় নিম্নতম উৎপাদনকেই সবাই স্বাভাবিক মান বলে ধরে নিয়েছিল। চাষীদের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। কিন্তু সে কারণেও নিম্নতম প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদনই চাষীদের পক্ষে ভালো ছিল।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ভারতীয় কৃষকের অদৃষ্টবাদিতার মূলে আছে উৎপাদনে উৎসাহের অভাব। বরং ওইযুগের বাস্তব অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই এই মনোভাব দেখা দিয়েছিল। সীমিত উৎপাদনের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য কমে গেল ও মুদ্রার ব্যবহারও কমে এলো। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ওজন ও মাপ প্রচলিত থাকায় দূরে গিয়ে ব্যবসা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সামন্ত বা রাজার বাড়তি সম্পদ কোনো ব্যবসা বা শিল্পে নিয়োজিত হয়নি। এই অর্থব্যয় হতো প্রাসাদ বা বিশাল মন্দির নির্মাণের জন্যে। মন্দিরের জন্যে নানা লোক প্রচুর অর্থ দান করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মন্দিরগুলির বিপুল ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী আক্রমণকারীদের আগমন ঘটল। মূর্তি ধ্বংসের চেয়ে লুণ্ঠনই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে উপ-সামন্তদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় জমির ফসলের ভাগীদারের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। এর ফলে বেশি ক্ষতি হল কৃষক ও রাজার। মধ্যস্বত্বভোগীরাই উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ ভাগ নিয়ে নিতে লাগল। খাজনা কমে যাওয়ায় রাজা তাঁর সামন্তদের ওপরই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। এসবের ফলে কৃষকদের ওপর খাজনা আদায়ের জন্যে অত্যাচার বেড়ে গেল। মূল খাজনার ওপর নানা খাজনা চাপিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের চাহিদা মেটানো হতে লাগল। এর আগের শতাব্দীগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার খাজনার একাংশ ব্যয় করত রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির জন্যে। কিন্তু সামন্ততন্ত্রে ভূমির খাজনা ছাড়াও অন্য কর বসিয়ে অন্যান্য খরচ মেটানো হতো।

মন্দির কর্তৃপক্ষও আলাদা কর বসাতো। কারিগরদের উৎপাদিত দ্রব্যগুলির ওপরও নানারকম কর দিতে হতো। চৌহান ইতিহাস সম্পর্কিত শিলালিপিতে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নানা ধরনের করের বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক রাজত্বেও ব্যবস্থা ছিল একই রকম। ভূমির রাজস্ব ছিল খুব বেশি— কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশও খাজনা হিসেবে দিতে বাধ্য হতো। তবে খাজনার সাধারণ হিসেব ছিল, ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ। খাজনা ছাড়াও কৃষককে বিনামূল্যে শ্রমদান করতে হতো। উপ-সামন্তদের প্রতিপত্তি ক্রমশই বাড়ছিল এবং তারা গ্রামের গোচারণ ভূমিও দখল করে নিতে শুরু করল। সাধারণ কৃষকের জীবনে কোনো আশার আলো ছিল না।

শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোনো আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। সামন্তরা কর আদায় করত, তা ছাড়া বিচারের দায়িত্বও নিতে পারত। কারণ, বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার মতো তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। সুতরাং সামন্তদের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বভার ছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের নতুন নতুন বসতি এলাকায় ভূমিদান করা হতো এবং তারা সংস্কৃতাশ্রয়ী সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিত।

রাজ্যের সমগ্র অঞ্চলই যে সামন্তদের দখলে থাকত, তা নয়। রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে একটি বিরাট এলাকা থাকত। শাসনকাজের সুবিধের জন্যে রাজ্যকে কয়েকটি

প্রদেশে ভাগ করা হতো। প্রদেশগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম নিয়ে কয়েকটি এলাকা থাকত। একেকটি প্রদেশের মধ্যে রাজার নিজস্ব জমি ও সামন্তদের জমি—দুই-ই থাকত। রাজকর্মচারী এবং সামন্তদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের নির্দিষ্ট ভাগ ছিল। শাসনকাজে গ্রামের স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই খর্ব হতো ভূস্বামীদের সুযোগ সুবিধার ফলে। ভূস্বামী ও গ্রামের শাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের সম্পর্ক সর্বত্র একই রকম ছিল না। একটি চৌহান গ্রামের কথা জানা যায়, যেখানে গ্রামের মন্দিরের জন্যে নতুন করধার্যের জন্যে গ্রাম-পরিষদের অনুমতি নিতে হয়েছিল। সবরকম করধার্যের সময়ই যে এরকম অনুমতি নেওয়া হতো, তা নয়।

কোনো কোনো অঞ্চলে গ্রামপরিষদ বজায় ছিল বটে, কিন্তু তাদের আগেকার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আর ছিল না। সামন্তদের অধীনস্থ গ্রামগুলিতে গ্রামপরিষদগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। একটি গ্রামের কথা জানা যায়, যেখানে গ্রামের প্রতিটি পাড়া থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গ্রামপরিষদ গঠিত হতো। কিন্তু গ্রামপরিষদের নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের নাম সম্পর্কে গ্রামশাসকের মতামত দেবার অধিকার ছিল। এইভাবে গ্রামপরিষদ শাসনব্যবস্থার অনুগত যন্ত্রে পরিণত হল। গ্রামপরিষদ থেকে অল্প কয়েকজনের একটি দলকে নিয়ে গঠিত হতো 'পঞ্চকুল' সমিতি। এই সমিতিই রাজস্ব আদায়, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিদানের বিবরণ, ব্যবসাবাণিজ্য এবং বিরোধে মধ্যস্থতার দায়িত্ব নিত। এই সমিতিগুলিকে পরবর্তী শতাব্দীগুলির পঞ্চায়েতের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

অভিজাত সম্প্রদায় ছিল সামন্তপ্রভু ও ব্রাহ্মণদের নিয়েই। ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উদ্দেশ্য ছিল পুণ্য অর্জন ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ। ব্রাহ্মণরাই রাজাদের জন্যে ধর্মীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত। রাজারা বিশ্বাস করতেন যে, এইসব যজ্ঞের অর্জিত পুণ্যের এক-ষষ্ঠাংশ তাঁদের ওপর বর্তাবে। একদিকে রাজা ব্রাহ্মণকে খাতির করে চলতেন ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজাদের গৌরববৃদ্ধির জন্যে মিথ্যা বংশপরিচয় রচনা করে দিতেন।

যে সমস্ত পরিবার সামরিক ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, সামন্তরা আসত সেরকম পরিবার থেকেই। রাজপুতরা যে তাদের 'ক্ষত্রিয়' মর্যাদার ওপর এত জোর দিত, তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের যোদ্ধা পরিবারের সন্তান বলে প্রচার করা। এই ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে তারা প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো। যুদ্ধের কারণ হিসেবে, লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যের কথাও বলা হতো। এইসব যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে নানারকম নিয়ম চালু করল। নিয়ম অনুযায়ী কোনো যোদ্ধা সম্পর্কে অন্য কেউ সামান্যতম অশ্রদ্ধাজনক মন্তব্য করলেও সেটা যুদ্ধযাত্রার কারণ হতে পারত। রাজনীতিতে নতুন কিছু ধারণা জন্ম নিল। বলা হল, আন্তরাজ্য রাজনীতি 'মণ্ডল' অনুসারে চলবে, অর্থাৎ প্রতিবেশি রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তত একটি রাজাকে শত্রুজ্ঞান করতে হবে। ক্রমশ যুদ্ধবিগ্রহ একটি সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পরিণত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর চেয়ে সম্মানের ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। সকলেই যেন যুদ্ধযাত্রার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। চন্দেল্ল রাজ্যে মৃত সৈনিকদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে

গ্রামদান করা হতো। এইভাবে নতুন নতুন সৈনিক সংগ্রহও সহজ হয়ে উঠল। ছোটবেলা থেকে বীরত্বের ধারণা মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। কেউ যুদ্ধ করতে ভয় পেলে তাকে বিদ্রূপ করা হতো। মেয়েদেরও শেখানো হলো, যোদ্ধাপুরুষকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা উচিত। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হতো। কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা বলপ্রয়োগে হলেও সতীদাহপ্রথা প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো।

আভিজাত্যের প্রধান শর্ত ছিল ভূমির মালিকানা। ভূমি ও বর্ণই অভিজাত সম্প্রদায়কে সমাজের অন্যান্য অংশের চেয়ে পৃথক করে রেখেছিল এবং নেতৃত্ব অর্জনে সাহায্য করেছিল। জমি নিয়ে বিবাদ কখনো কখনো কয়েক পুরুষ ধরে চলত এবং দুই পরিবারের বহু সদস্য নিহত হতো। রাজপুতদের মধ্যে গোষ্ঠী মনোভাব ছিল খুব প্রবল। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় রাজপুতরা এ ব্যাপারে বেশি সচেতন ছিল। রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তার ওপর রাজপুতরা বেশি জোর দিত।

অভিজাতরা বড় বড় উপাধি ব্যবহার করতে ভালোবাসত। আগের যুগের সম্রাটের উপাধি ছিল 'মহারাজাধিরাজ', কিন্তু এযুগের ক্ষুদ্রতম রাজাও এই একই খেতাব গ্রহণ করতেন। খেতাবের সঙ্গে ছিল প্রশস্তিসূচক বড় বড় বাক্যরাজি। বড় রাজারা আবার এসবে সন্তুষ্ট না হয়ে নতুন নতুন উপাধি আবিষ্কার করেছিলেন। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বাসনা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারতের অধীশ্বর হওয়া। তিনি উপাধি নিলেন 'ভারতেশ্বর'। দ্বাদশ শতাব্দীতে কনৌজের এক রাজার খেতাব ছিল— "পরম মহিমান্বিত, রাজার রাজা, সার্বভৌম শাসক, অশ্ব, হস্তী ও মানবজাতির রাজা এবং ত্রিভুবনের অধীশ্বর ...।" রাজাদের বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষমতা বিচার করলে এ ধরনের খেতাব নিতান্তই বেমানান। রাজারা নিজেদের কল্পনার জগতে বাস করতেন। সামান্য কাজকে বিরাট কীর্তি বলে বর্ণনা করা হতো। রাজসভায় তোষামোদ করাই স্বাভাবিক রীতি হয়ে উঠল। তবে বুদ্ধিমান নৃপতিরা আরো সূক্ষ্ম উপায়ে নিজেদের মহিমা প্রচার করতেন।

অভিজাতরা নিজেরা শস্য উৎপাদনের কাজে হাত লাগাতো না, জমির খাজনাই ভোগ করত শুধু। ব্রাহ্মণদের পক্ষে চাষের কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল বলে তারাও অন্য চাষী নিয়োগ করত। বৌদ্ধ মঠগুলিরও জমি চাষ করত ভাগচাষীরা। চাষের কাজের দায়িত্ব ছিল প্রধানত শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীদের ওপর। এইভাবে কৃষকশ্রেণী সামন্ত প্রভুদের অধীন হয়ে রইল এবং সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে এলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। এযুগের এটিই ছিল বৈশিষ্ট্য। এর আগে ক্ষমতা উপভোগ করত বিভিন্ন ধরনের মানুষ— রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সমবায় সংঘ। গ্রামগুলির স্বনির্ভরতার জন্যে অন্য গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ অপ্রয়োজনীয় ছিল। এর ফলেই ক্ষমতা চলে গেল অল্প কয়েকজনের হাতে। ফলে বিশেষীকরণ শুরু হয়ে গেল। কৃষকরা অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার কথাও আর ভাবতে পারত না। এইসব কারণে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ আরো কড়া হয়ে উঠল।

রাজার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনুসারে তাঁর সঙ্গে সামন্তদের সম্পর্কের ভারসাম্য নির্ভর

করত। তবে খাজনা ও সৈন্য সরবরাহের জন্যে সামন্তদের ওপর নির্ভরশীল হলেও রাজারাই সাধারণত সামন্তদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজার সৌভাগ্যক্রমে সাধারণত তাঁর দিকটাই হতো প্রবল, কারণ রাজার পেছনে ছিল রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, সাধারণত ব্রাহ্মণদের কূট পরামর্শ। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল নিজেদের মঙ্গলের জন্যে অধিষ্ঠিত শক্তিকে বজায় রাখতে সাহায্য করা। রাজার অধিকতর সৌভাগ্য, প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে ব্যাপক অর্থে ধরলে তাঁর অধিকারের সমর্থন পাওয়া যেত। যেমন, শাস্ত্রে খুবই জোর দেওয়া হয়েছে এই রীতির ওপর যে রাজা রাজ্যলাভ করবেন উত্তরাধিকার সূত্রে। রাজা বংশপরম্পরায় স্বতঃসিদ্ধভাবে রাজ্যলাভ করলে তাতে সামন্তদের হস্তক্ষেপ ভালোভাবে প্রতিরোধ করা যেত ; এ ব্যবস্থা না থাকলে এক রাজার মৃত্যুর পর পরবর্তী রাজার নির্বাচনের সময় সামন্তেরা হস্তক্ষেপ করতে পারত, তাতে তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সুযোগ হতো। এই কারণেই পালবংশের রাজা গোপাল যখন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সিংহাসন ল্যাভ করলেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। রাজাকে দেব-বংশোদ্ভূত বলেই ধরে নেওয়া হতো। রাজারও কর্তব্য ছিল ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করা। এই নিয়মানুসারেই সামন্তদের রাজার অধীনস্থ বলে ধরা যায়। রাজার সঙ্গে প্রজাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং সামন্তপ্রভুর কাছেই তাদের সমস্ত আনুগত্য ছিল। একারণেও সামন্তদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। এই নতুন প্রবণতাকে বাধা দেবার জন্যে প্রজার প্রতি রাজার দায়িত্বের কথা বারবার প্রচার করা হতো।

প্রাচীন শাস্ত্র থেকে যুগোপযোগী অংশ চিহ্নিত করে নিয়ে তার যে ভাষ্য রচিত হতো, তার মধ্যেই এযুগের রাজনৈতিক তত্ত্ব রূপ পেয়েছিল। এর একটি উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিম-ভারতের এক জৈন ধর্মাবলম্বী রচয়িতা হেমচন্দ্রের (১০৮৯—১১৭৩ খ্রীস্টাব্দ) রচনা। জৈনধর্মের বিশুদ্ধিকামিতার প্রভাব হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় দেখা যায়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার যে সাধারণ প্রবণতা ছিল, তার সঙ্গে হেমচন্দ্রের চিন্তার কোনো মিল ছিল না। হেমচন্দ্রের একটি বক্তব্য প্রচলিত ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী। তিনি বললেন, উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব। একথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রচলিত ব্যবস্থার কোনো কিছুই অলংঘনীয় নয়।

এযুগের ধর্মশাস্ত্রীয় রচনাতেও দেখা যায় যে, প্রাচীন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচলিত রীতিকে সমর্থন করার চেষ্টা চলছে। এর ফলে প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল। এরমধ্যে ছিল মনুরচিত 'ধর্মশাস্ত্র'। দশম শতাব্দীতে মেধাতিথি রচিত ব্যাখ্যা ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুল্লুক রচিত ব্যাখ্যা এযুগে বেশি জনপ্রিয় ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রের সমর্থন আদায় করতে গিয়ে ওইযুগের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপর বেশি জোর দিয়ে মূলশাস্ত্রও পুনর্লিখিত হল। এইযুগের নানা রচনার মধ্যে আইন সম্পর্কিত রচনাগুলি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

উত্তরাধিকারের সমস্যা ও জমির বিভাজনের নানা সমস্যা (যেহেতু এইযুগে জমিই

ছিল ধনী পরিবারগুলির প্রধান সম্পত্তি) সমাধানের নানা চেষ্টা হয়েছিল। পারিবারিক আইনের দুটি শাখা—'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা'* দেওয়ানী আইনের মূলভিত্তি ছিল। এমন কি, এই আইন বর্তমানকালেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত চালু ছিল। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে এই আইনগুলি রচিত। ভূস্বামী পরিবারদের অধিকাংশগুলিতেই একান্নবর্তী প্রথা প্রচলিত ছিল।

জমির মালিকানা সত্ত্বেও অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মও বাদ যেত না। তবে, জমির আয় বেশি নিয়মিত ও নিশ্চিত ছিল বলে এটিকেই বেশি সম্মানজনক মনে করা হতো। অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যে গ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য কমে গেল এবং ফলে শহরগুলির উন্নতিও ব্যাহত হল। পুরণো শহরগুলি টিঁকে রইল, কিন্তু নতুন শহর পত্তন বিরল হয়ে পড়ল। এইযুগ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আরব ভূগোল-বিদরা চীনের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে এখানকার শহরের সংখ্যাল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলেও বাণিজ্যের অসুবিধে হয়েছিল। উপকূল অঞ্চলে অবশ্য নৌবাণিজ্য ভালোভাবেই চলছিল— যেমন, গুজরাটে ও মালাবারে। এছাড়া, তামিল উপকূলের বন্দরগুলি থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যও চলত

উপকূল শহরগুলির সমৃদ্ধির একটি কারণ ছিল বিদেশী ব্যবসায়ীদের বসতি-স্থাপন। তারাই ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত এবং পূর্ব-দিকের বাণিজ্যেও তারা ধীরে ধীরে অংশ নিচ্ছিল। ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতীয় দালালদের হটিয়ে দেবার জন্যে আরব ব্যবসায়ীরা নিজেরাই চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আরব ভূগোলের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, দেবল (সিন্ধু উপত্যকায়), কাম্বে, থানা, সোপারা ও কাউলম (কুইলন)। সবগুলি বন্দরেই আরব জাহাজগুলি এসে থামত। বন্দর থেকে ভারতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী, কিংবা আরো পূর্বদিকের অঞ্চল থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যেসব সামগ্রী নিয়ে আসত, সেগুলি জাহাজে তুলে পশ্চিমী জগতে পাড়ি দিত আরবদের জাহাজগুলি। চীনের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া মারফত উত্তর-ভারতীয় বাণিজ্য কমে এসেছিল, কারণ পারস্যদেশীয় ও আরব ব্যবসায়ীরা তখন নিজেরাই মধ্য-এশিয়ায় যেতে পারত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল আক্রমণের পর ভারত ও মধ্য-এশিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এই বাণিজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দেশের মধ্যে ব্যবসা খুব কমে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি, যেটুকু নাহলে চলে না সেটুকু ছিল। কারিগররা শহরে ও গ্রামে কাজ করত। তবে শহরেই কারিগর-দের সংঘগুলি বেশি স্বীকৃতি পেত বলে গ্রামের চেয়ে শহরেই বেশি কারিগরের বাস ছিল। কিন্তু সমবায় সংঘগুলি শহরে আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রকৃত

* দুটি শাখাতেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের যৌথ সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'দায়ভাগ' মতে, কেবল পিতার মৃত্যুর পরই পুত্ররা পিতার সম্পত্তিতে অধিকার দাবি করতে পারে। আর 'মিতাক্ষরা' মতে, পিতার জীবনকালের মধ্যেই পুত্ররা সম্পত্তির অধিকার দাবি করতে পারে। দুই মতানুযায়ীই সম্পত্তিতে পিতার অধিকার অবাধ নয়।

ক্ষমতা ক্রমশ জমির মালিকদের হাতে চলে আসছিল। এরা শহরের কারিগরদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখত, কেননা সংঘগুলির রীতিমতো নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল। ওই যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সমবায় সংঘগুলি দেখা গেছে দক্ষিণ-ভারতে।

পূর্ব-ভারতে শহরের সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল দুটি কারণে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে শহরে যথেষ্ট কর্মব্যস্ততা চলত। এছাড়া, নিয়মিত ব্যবসার ফলে টাকা-পয়সার লেনদেনও ভালোই চলত। সেন রাজাদের আমলে জমির নগদ খাজনা আদায়ের রীতি প্রচলিত হয়। মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির পুনঃপ্রবর্তনের ফলে এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা উন্নততর হওয়ায় (যদিও উদ্বৃত্তের পরিমাণ সীমিতই ছিল) নগরগুলি আরো একবার ব্যবসা ও বণ্টনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছিল। তবে, যথার্থ বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে যে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, এই অর্থনীতিতে তা ছিল না। কারণ প্রায়শই দেখা যায় যে, গুপ্তযুগের তুলনায় এযুগের মুদ্রাগুলি নিকৃষ্ট ধাতুদ্বারা নির্মিত হয়েছিল। স্বর্ণমুদ্রাগুলি গুপ্তযুগের মুদ্রার তুলনায় অনেক সময় অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ খাদমেশানো ছিল।

ব্যবসায় বৃত্তির মধ্যে একমাত্র মহাজনী কারবার এযুগে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সাধারণত শতকরা ১৫ হারে সুদ নেওয়া হলেও চৌহানদের সময়ে ৩০ ও রাষ্ট্রকূটদের সময়ে ২৫ হারেও সুদ প্রচলিত ছিল। মনে হয়, ব্যবসার অবনতি ও অর্থের অভাবের দরুণ সুদের হার চড়া হয়েছিল। সুদের হারের ব্যাপারে বর্ণসচেতনতা এযুগে স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণরা যেখানে শতকরা ২ হারে সুদ দিত, শূদ্রদের দিতে হতো ৫ বা আরো বেশি। সুদের চড়া হারের জন্য কৃষকরা কিছুতেই ঋণমুক্ত হতে পারত না। সেজন্যে স্থান পরিবর্তনও তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মের বিশেষীকরণ শুরু হওয়ায় নতুন নতুন উপবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হল। এর ফলে সম্পূর্ণভাবে গ্রামের উন্নতি না হযে বর্ণ ও উপবর্ণরা প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিজেদের গোষ্ঠীর নিজস্ব সংগঠনে আবদ্ধ রইল। বর্ণভিত্তিক সংগঠনগুলির অস্তিত্বের ফলে রাজনৈতিক আনুগত্য আরো কমে আসছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে বর্ণবিভাগ আরো কঠোর হয়ে ওঠে এবং প্রতি বর্ণের জন্যে পৃথক পঞ্চায়েত এবং বিচারসভা গড়ে উঠে।

ব্রাহ্মণ-লিখিত আকরগ্রন্থগুলিতে 'জাতি' কাঠামোয় পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা এইযুগে বর্ণবিভেদের সমর্থনে প্রাচীন শাস্ত্রের নানা উদ্ধৃতির সাহায্য নিত। তত্ত্বগতভাবেও বর্ণভেদ আরো কঠোর হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণরা সমাজের বাকি অংশ থেকে আরো দূরে সরে আসে। ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্রাহ্মণরা জমির মালিক হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি খর্ব করে দেয়। ব্যবসায়ীদের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও দুর্বল হয়ে পড়ল। বৌদ্ধরা ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। একমাত্র পূর্ব-ভারতেই রাজকীয় সমর্থনের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম পুরণো প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এইভাবে ব্রাহ্মণদের প্রধান ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দুর্বল হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণরা নিজেদের

উচ্চবর্ণের অহংকারে নিম্নবর্ণের মানুষের সংস্পর্শ পরিহার করে চলত। এমনকি কোনো চণ্ডালের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। এইভাবে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের মর্যাদাও কমে গেল। এমনকি, কোনো উচ্চতর বর্ণও যদি ব্রাহ্মণবিরোধী হতো, তাদেরও ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য করে রাখত।

ব্রাহ্মণরা নিয়মবিধি বেঁধে দিলেও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বর্ণের লোকেরা বর্ণপ্রথা এত কঠিনভাবে মেনে চলত না। বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণেও কিছু কিছু উপবর্ণ গড়ে উঠেছিল। এরমধ্যে কায়স্থরা শাসনব্যবস্থায় করণিকের কাজ করত। দলিলপত্র লেখা ও নানা বিষয়ের বিবরণ লেখার দায়িত্ব এদের ওপর ছিল। একাদশ শতাব্দীতে এদের একটি উপবর্ণ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং এদের আদিবর্ণ নিয়ে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকের মতে এরা আগে ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত ছিল। আবার অনেকের মতে, এরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত। মনে হয়, মিশ্র বর্ণের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল অন্য কারণে,—বর্ণবিভেদের হিসেবে কায়স্থদের স্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই এইকথা বলা হয়েছিল। যাই হোক, রাজসভার সঙ্গে নিকট সম্পর্কের ফলে কায়স্থরাও ভূমিদানের সুবিধে পায় ও জমির মালিকও হয়ে ওঠে।

অস্ত্রোপচার, চিকিৎসা বা অঙ্কশাস্ত্রের যারা চর্চা করত, তাদের নিয়ে পৃথক পৃথক উপবর্ণ গড়ে উঠল। ব্রাহ্মণদের রচনায় কিন্তু এই ধরণের কাজকর্মকে আক্রমণ করে লেখা হয়েছে। হাতের কাজকে ব্রাহ্মণরা সম্মান দিত না। মেধাতিথি হাতের কাজকে নিচু পেশা বলে ধরেছেন। মনুর রচনায় বলা হয়েছে, যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম লঘু ধরনের পাপ: এই ধরণের কাজকর্মের মধ্যে ছিল সেতুনির্মাণ ও নদীর বাঁধ নির্মাণ। বোধহয় ব্রাহ্মণরা বুঝেছিল, যান্ত্রিক বিদ্যায় পারদর্শিতা একটা গুরুত্বপূর্ণ নৈপুণ্য।

কয়েকটি উপবর্ণ দাবি করে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্ণ জাত, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তাদের পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। উত্তর-ভারতের ক্ষত্রী উপবর্ণভুক্ত লোকরা এখনো দাবি করে যে, তারা ক্ষত্রিয় বর্ণজাত। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করায় বর্ণের অন্যান্য লোকরা আপত্তি তোলে ও তারা ক্রমশ বৈশ্যবর্ণভুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও গুর্জর জাঠ ও আহীর গোষ্ঠীর লোকও নিজেদের প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে: বর্ণপ্রথার গোড়া থেকেই উপবর্ণ সৃষ্টি শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজে উপবর্ণ গড়ে উঠতে দেরি হতো। পরের যুগে বাণিজ্যের অগ্রগতি ও জনগণের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের প্রবণতার ফলে উপবর্ণ সৃষ্টি হতে দেরি হতো না। চারটি প্রধান বর্ণ ঠিকই বজায় ছিল এবং তাদের অধীনেই বিভিন্ন উপবর্ণের উদ্ভব হচ্ছিল। চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন 'জাতি'র পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হতো। তবে, এই তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থানীয় পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতো।*

সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্ণ-সংগঠনের নিকট সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা-

* আশ্চর্যের বিষয়, বিদেশীদের রচনার মধ্যে চারটির পরিবর্তে সাতটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। চারটি প্রধান বর্ণ ও তিনটি উপবর্ণ যোগ করে সাতটি বর্ণের হিসেব দেওয়া হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব লেখক আল-ইদ্রিসি সাতটি বর্ণের তালিকা দিয়েছেন—অভিজাত, ব্রাহ্মণ, সৈনিক, কৃষক, কারিগর, সংগীতশিল্পী ও প্রমোদশিল্পী। মেগাস্থেনিসের বিবরণের চেয়েও এই বিবরণ বেশি বিভ্রান্তিকর।

কেন্দ্রের সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রধানত ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছিল। রাজকীয় সমর্থন ও সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনগুলি তাত্ত্বিকভাবে উপযুক্ত ছিল তিন উচ্চবর্ণের কাছে। কিন্তু কার্যত ক্রমশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণের ছাত্রই শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রবেশাধিকার পাচ্ছিল না।

অধিকাংশ বড় গ্রামেই শিক্ষায়তনগুলি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি দানের অর্থ থেকে সাহায্য পেত। এ ছাড়া, উত্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানে শৈব বা বৈষ্ণবদের যে সব শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, সেগুলিতেও নানা মানুষ দান করত। পুরনো শাস্ত্রের ওপর বেশি গুরুত্বদান ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের ফলে শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন মতামতেরই পুনরাবৃত্তি হয়ে উঠল। প্রচলিত মতকে প্রশ্ন করে বা আলোচনার সাহায্যে আরো জ্ঞানচর্চার কোনো পরিবেশ ছিল না। যেটুকু ভিন্নমতের চর্চা ছিল তার প্রভাব এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যার দ্বারা সম্পূর্ণ চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটানো চলে। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি অবহেলাও এই মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল।

অব্রাহ্মণরা আগের মতোই সমবায় সংঘে বা কারিগরদের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করতে পারত। বৌদ্ধ মঠগুলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন অন্য ধরনের শিক্ষারও কিছুটা সুযোগ ছিল এবং কয়েকজন অভারতীয় পণ্ডিতের উপস্থিতির ফলে খানিকটা উদার আবহাওয়া বিরাজ করত। তবে, ক্রমশ বৌদ্ধ মঠগুলি কেবল বৌদ্ধ-শাস্ত্র চর্চারই কেন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছিল। পূর্ব-ভারতে এরকম কয়েকটি মঠ ছিল এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে নালন্দা। তুর্কীরা নালন্দা ধ্বংস করে দেবার পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার পরিসমাপ্তি হল। জৈন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অনেকটা বৌদ্ধ ধরনেরই ছিল। পশ্চিম-ভারতের সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও মহীশূরের শ্রবণ-বেলগোলায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল এবং জৈন শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিও এইসব অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ধর্মতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। এতে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য তাতে সীমিত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত এবং সাধারণ কথোপকথনে সংস্কৃত ভাষার কোনো ব্যবহার ছিল না। এর ফলে বুদ্ধিবৃত্তি একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। নতুন চিন্তাবিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদ ক্রমশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। নতুন আঞ্চলিক ভাষাগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ছিল এবং সাধারণ মানুষের ভাবের আদান-প্রদান এতেই হতো। কারিগরি শিক্ষাকে হেয় করে দেওয়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা দ্বিধাবিভক্ত হয়— যাতে শাস্ত্রীয় শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়. এই যুগের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকৃতপক্ষে আগের যুগের রচনারই বিস্তারিত আলো-চনামাত্র, যেমন— চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুস্তক। অথবা পুঁথিগত জ্ঞানের বিশ্লেষণ হতো, যাতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কোনো স্থান ছিল না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেখানে হয়েছে, সেখানে ফলও পাওয়া গেছে। যেমন, চিকিৎসায় লোহা ও পারদের ব্যবহার। জ্যোতির্বিদ্যাকে তখন জ্যোতিষ বিদ্যারই শাখা হিসেবে গণ্য

করা হতো। এই যুগের অঙ্কশাস্ত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল বীজগণিত।

সংস্কৃত ভাষায় যেসব সাহিত্যচর্চা হচ্ছিল, তাও প্রধানত প্রাচীন রচনাগুলিরই অনুকরণ। কাব্য বা রোমান্টিক গদ্যরচনার মূল উপাদান ছিল পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির নানা কাহিনী। এর ফলে বর্ণনার চেয়ে ভাষার অলংকরণের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। ছন্দশাস্ত্র ও কাব্যরচনার নানান খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা চলত। রাজসভায় সংস্কৃত লেখক ও কবিদের সমাদর ছিল। মনে করা হতো, এই-ভাবেই রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি হবে।

গদ্য কাহিনীগুলি তুলনায় কম কৃত্রিম ছিল। প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক ভঙ্গিতে এগুলি রচিত হতো। এর একটি ব্যতিক্রম ছিল সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'। এটি একাদশ শতাব্দীতে পদ্যরচনার ভঙ্গিতেই লিখিত হয়েছিল এবং এখনো এটি সমান জনপ্রিয়।

গদ্য রোমান্স রচনা রীতির বিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক আনুগত্যের মিলিত ফল হল ঐতিহাসিক বিবরণ এবং এগুলি ওইযুগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। গদ্য বা পদ্য দুই ভঙ্গিতেই বিবরণ রচিত হতো যদিও গদ্যরচনাই ছিল বেশি। এগুলির মধ্যে পদ্মগুপ্ত রচিত মালোয়ার রাজার জীবনকাহিনী বা বিলহনের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনী 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, আঞ্চলিক বিবরণ সংবলিত রচনা ছিল কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'। তাছাড়া, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের উল্লেখ করে অন্য ধরনের রচনার মধ্যে হেমচন্দ্র রচিত 'পরিশিষ্ট পর্বণ'-এর নাম করা যায়।

রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও নাটকের মধ্যে আগেকার যুগের নাটকের কিছু কিছু গুণ অবশিষ্ট ছিল। বিশাখদত্ত মৌর্যযুগের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক লিখেছিলেন। এরপর ভবভূতি রচিত নাটকগুলিতে কোমলতা ও প্রচ্ছন্ন নাটকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীযুগের নাট্যকার—মুরারি, হস্তিমল্ল, রাজশেখর ও ক্ষেমেশ্বর রচিত নাটকগুলি মঞ্চে অভিনয়ের চেয়ে পাঠ করার জন্যেই অধিক উপযোগী।

লিরিক বা গীতিধর্মী কবিতা এযুগে অনেক লেখা হয়েছিল। পূর্বোক্ত রচনাগুলির চেয়ে এই কবিতা অনেক ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ সুরে লেখা। এযুগের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল শৃঙ্গার রসাত্মক কবিতা, যার উদাহরণ পাওয়া যায় ভর্তৃহরির এক স্তবকের রচনাগুলিতে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলা ভক্তি-আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শৃঙ্গার রসাত্মক কবিতা বোধ হয় প্রধানত এইভাবে ধর্মের অজুহাতে লেখা শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের স্বচ্ছন্দ আবেগময় অবিস্মরণীয় বর্ণনা আছে। গীতগোবিন্দের লিরিক ভাষার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়জ লাস্য আছে, তা পরবর্তীযুগের সাহিত্যে বিরল। অন্যেরা, যেমন গোবর্ধন বা কচি বিলহন (চৌরপঞ্চাশিকা) কবিতায় সোজাসুজি আদিরসের অবতারণা করেছেন—কোনো ধর্মীয় প্রতীকের দোহাই না দিয়ে।

শৃঙ্গাররস ও দেহতত্ত্বকে উপজীব্য করে কাব্য ছাড়া ভাস্কর্যও রচিত হল।

তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতেও এই একই প্রবণতা দেখা গেল। এইযুগের ভারতে নৈতিক অবনতি সম্পর্কে নানাকথা নানাজনে বলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয়ও কিছু কম পাওয়া যায়নি। উদাহরণ হল—গীতগোবিন্দ বা খাজুরাহের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য। বলা হয়, যেকোনো সংস্কৃতির অবক্ষয়ের লক্ষণ হল নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। সংস্কৃতি বিবর্তনের অন্যান্য যুগেও এই ধরনের আগ্রহের নিদর্শন আছে, যদিও তার প্রকাশের ভঙ্গি সবসময় এক নয়।

অবাধ উচ্ছলতার যুগ ছিল সেটা। বৌদ্ধধর্মের কঠোর নীতিবাদে সুখ ও পাপ-বোধকে সম্পর্কিত বলে ধরা হতো। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে, শিল্পেও ভাস্কর্যে নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক সোজাসুজি বর্ণিত হতে শুরু করল। সামন্তপ্রথায় পুরুষের শৌর্যবীর্যকে প্রাধান্য দেবার পর থেকে নারী-পুরুষের মেলামেশা কমে গিয়ে সমাজের উচ্চস্তরে এক ধরনের পর্দাপ্রথা প্রচলন হয়েছিল। এর পরোক্ষ ফল হল স্ত্রীপুরুষের সামান্যতম সম্পর্ক নিয়ে রোমাণ্টিকতার আতিশয্য। অনুরূপ পরিস্থিতি অন্যান্য সভ্যতাতেও দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাসনা ও কামনাকে অন্যভাবে রূপান্তরিত করা হতো। ভারতবর্ষে তার অবাধ প্রকাশের স্বাধীনতা দেখা যায়। হয়তো অস্বাভাবিক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এটাই ছিল একটা উপায়। অনেকে ভারতীয় সংস্কৃতির যৌন প্রতীকগুলিকে আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই-যুগের কবিতা ও শিল্পের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সংস্কৃতভাষার নানা অসুবিধে সত্ত্বেও এই ভাষাতেই রাজসভায় সাহিত্য রচিত হচ্ছিল। উত্তর-ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলি তখনো যথেষ্ঠ উন্নত হয়ে ওঠেনি। পালিভাষাতে কেবল কিছু বৌদ্ধধর্মীয় বিবরণ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ, আইনবিষয়ক রচনা পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও নতুন ভাষাগুলির মধ্যে পড়ে প্রাকৃত ভাষারও উন্নতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জৈনদের ধর্মীয়ভাষা আগে ছিল প্রাকৃত। কিন্তু তারাও এবার সংস্কৃতভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতি হয়ে উঠল। প্রাকৃতভাষায় সংস্কৃত আলংকারিক ভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতভাষার প্রাচীন পরম্পরায় শেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যরচনা হল—কনৌজের রাজা যশোবর্মনের জীবনী অবলম্বনে বাকপতি রচিত 'গৌড়বধ'।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে প্রাকৃতভাষার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ ও তারপর স্থানীয় ভাষার ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল। অপভ্রংশ ছিল প্রাকৃতের বিকৃত সংস্করণ। সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে যেসব মানুষ হূণ আক্রমণের পর মধ্য ও পশ্চিম-ভারতীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তারাই অপভ্রংশ ভাষার জন্মদাতা। জৈনদের ব্যবহৃত প্রাকৃতভাষার ওপর অপভ্রংশের বেশ প্রভাব পড়েছিল এবং এখানে প্রাচীন থেকে নতুন ভাষার রূপান্তর বেশ বোঝা যায়, বিশেষত জৈন মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটীতে।

মহারাষ্ট্রের ভক্তি-আন্দোলনের মাধ্যমে মারাঠীভাষার উন্নতি হয়, কারণ সাধুসন্তদের

ব্যবহৃত ভাষা ছিল এটাই। আধুনিক সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে গুজরাটী ভাষায় প্রচলন ছিল। জৈন সাধুরা এই ভাষাকে উৎসাহ দেন। তাছাড়া, রামলীলা নৃত্যের সঙ্গে যে কাব্য রচিত হয়েছিল তাও ছিল গুজরাটী ভাষাতেই। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং বিহারের আঞ্চলিক ভাষাগুলি (ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগধী) মগধ অঞ্চলে কথিত প্রাকৃতভাষা থেকেই এসেছে। নতুন ভাষাগুলির উন্নতির ব্যাপারে নতুন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির দান আছে। কারণ, এরা সাধারণ লোকের ভাষার মাধ্যমেই ধর্মপ্রচার করতে চেষ্টা করছিল।

আঞ্চলিক রীতি ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল নানারূপে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এইযুগের মন্দিরগুলিতে ক্লাসিক্যাল শৈলীর স্থানে নতুন রীতির প্রকাশ দেখা যায়। উত্তর-ভারতের তিনটি অঞ্চলে এযুগের বৃহৎ মন্দিরগুলি এখনো দেখা যায়ঃ পশ্চিম-ভারতের রাজস্থান ও গুজরাটে, মধ্য-ভারতের বুন্দেলখণ্ডে এবং পূর্ব-ভারতের উড়িষ্যায়। সব মন্দিরগুলির মূল স্থাপত্যে উত্তর-ভারতের 'নাগর' রীতির ছাপ আছে। কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ও কম নেই। এই 'নাগর' রীতির মন্দির ছিল বর্গাকৃতি। কিন্তু বর্গের চারটি বাহুর মধ্যভাগ থেকে কিছু অংশ বেরিয়ে থাকায় সমগ্র মন্দিরটি ক্রুশের আকৃতি পেত। কেন্দ্রীয় শিখরটি হতো সুউচ্চ, দুদিক থেকে ঈষৎ বেঁকে ওপরে উঠে যেত।

পশ্চিম-ভারতের মন্দিরশৈলীর উদাহরণ দেখা যায় শ্বেতপাথরে নির্মিত আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরগুলিতে। মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্যের প্রাচুর্য থাকলেও ভাস্কর্য এখানে স্থাপত্যের অধীন।

বুন্দেলখন্দ অঞ্চলের মন্দিরের নমুনা হল খাজুরাহের মন্দিরগুলি। এগুলিতেও প্রচুর ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে। মন্দিরগুলি আকার, আয়তন ও গঠনরীতির সমন্বয়ে বিশিষ্ট শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। খাজুরাহের (কোনারকের মতোই) দেহপ্রেমের ভাস্কর্য দেখে অনেকেই এই মন্দিরগুলিকে অশ্লীল শিল্প প্রদর্শনী আখ্যা দিয়েছেন। মন্দির যাঁরা দেখতে যান, তাঁদেরও নরনারীর মিথুনমূর্তি দেখতে এত আগ্রহ থাকে যে মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অন্য সৌন্দর্য অনেক সময় দর্শকদের কাছে অবহেলিত রয়ে যায়। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারকের মন্দিরগুলি আরো বিশালকায়। এগুলির উচ্চতাও অনেক বেশি এবং ক্রমোন্নতির বক্ররেখাগুলি আরো স্পষ্ট ও সুন্দর।

দ্রাবিড় মন্দিরগুলির তুলনায় উত্তর-ভারতের মন্দিরগুলির চারপাশের জমির পরিমাণ ছিল কম। দাক্ষিণাত্যের মতো উত্তর-ভারতে মন্দির সমাজজীবনের কেন্দ্র ছিল না। খাজুরাহের মতো মন্দিরগুলি ব্যবহার করত কেবল উচ্চবর্ণের মানুষরা। জনপ্রিয় দেবমূর্তির পুজো কিন্তু মূল মন্দিরে হতো না। মন্দিরের সংলগ্ন অঞ্চলে কখনো কখনো এইসব মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হতো। এইযুগের পর উত্তর-ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের বিবর্তন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কারণ পরবর্তী মন্দিরগুলি পুরনো ধাঁচেই তৈরি করা হয়েছে।

পূর্ব-ভারতে পাথর ও ধাতু, উভয়ের মাধ্যমেই এক বিশিষ্ট ভাস্কর্যরীতির জন্ম

হয়েছিল। কালো বা গাঢ় ধূসর রঙের পাথর পালিশ করলে ধাতুর মতোই চকচক করত। নালন্দার বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণের সময়ই এই পদ্ধতির সূচনা হয় এবং পালযুগে হিন্দু মূর্তিনির্মাণেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। চারুকলার ক্ষেত্রে ভারতের দান প্রধানত ভাস্কর্যে। এযুগের চিত্রকলার যেটুকু নিদর্শন এখন পাওয়া যায়, ভাস্কর্যের তুলনায় তার মান অনেক নিচু। পরবর্তী শতাব্দীতেও ভাস্কর্যের স্বাধীন ক্রমবিকাশ ঘটলে ভাস্কর্য তার নিজের বিবর্তনের রীতি অব্যাহত রাখতে পারত। কিন্তু স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবেই ভাস্কর্যের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকায় এর সৌন্দর্য পরবর্তী-যুগের মন্দিরের মতোই ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ল।

উত্তর-ভারতের উচ্চবর্ণভুক্ত মানুষ জনপ্রিয় দেবতাদের ধর্মের মধ্যে স্থান দিতে অনিচ্ছুক ছিল। সমাজের উচ্চস্তরবাসীদের ধর্ম এবং সাধারণ মানুষের ধর্মের মধ্যে প্রভেদ এযুগে আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধর্ম থেকে সাধারণ মানুষের দেব-দেবীকে একেবারে বাদ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের 'মার্জিত' রূপগুলি প্রচলিত রইল। বৈষ্ণব ও শৈব, উভয় সম্প্রদায়কেই বোঝাতে 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার শুরু হল আরব ও তুর্কীদের আগমনের পর। এরা প্রাথমিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত অধিবাসীকেই হিন্দু বলত।* তাদের নিজেদের, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মানুগামীদের অ-ঐসলামিকদের থেকে পৃথক করে বোঝাবার জন্যেও তারা 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করত। এই আখ্যাটি থেকে গেল এবং এখন উপমহাদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্ম বোঝাতেই 'হিন্দু' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। আরব বা তুর্কীরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের যে সবসময় এক করেই দেখত এমন নয়, কিন্তু পার্থক্য তেমন স্পষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের দুই প্রধান শাখা,— বৈষ্ণব ও শৈবদের সম্পর্কেই 'হিন্দু' আখ্যাটি প্রচলিত হয়ে গেল।

এইযুগের শেষদিকে উত্তর-ভারতে দুটি ধর্মগোষ্ঠীই প্রধান হয়ে ওঠে। জৈনধর্ম পশ্চিম-ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বর্তমান ভারতে ও পশ্চিমাঞ্চলেই বেশি জৈন-ধর্মাবলম্বী দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম আগেই পূর্ব-ভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং এখন ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্ম বিষ্ণুর অন্যতম অবতার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব হিন্দু এই ব্যাখ্যাকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। অ-বৌদ্ধদের বুদ্ধপুজো বড়জোর একটা সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টামাত্র ছিল। এইযুগের সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় সামরিক শক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বৌদ্ধ-জৈনধর্মের অহিংসার নীতি আকর্ষণীয় মনে হয়নি। হিন্দু দেবতাদের মধ্যে শিব ও বিষ্ণুর দুই অবতার কৃষ্ণ ও রাম কেউই অহিংসা প্রচার করেননি। তবে, ভক্তি-আন্দোলনের নেতারা হিংসার বিরোধী ছিলেন।

এযুগে হিন্দুধর্মে যেসব পরিবর্তন হয়েছিল, তার মূলে ছিল প্রাচীন বিশ্বাস ও নতুন ব্যক্তিগত ঈশ্বরপুজোর ধারণার দ্বন্দ্ব। মূর্তিপুজো ক্রমশ বেড়ে গেল এবং নতুন নতুন দেবদেবীর জন্যে নতুন মন্দির গড়ে উঠল। বিষ্ণু ও তাঁর নানা অবতাররা বেশি

* আরবরা উপমহাদেশের নাম দিয়েছিল 'আল হিন্দ'। শব্দটি এসেছিল গ্রীক শব্দ 'ইনডাস' ও পারসশব্দ 'সিন্ধু' থেকে।

জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচারলাভ করল। অবতারদের নানা কাহিনী এভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।

অবতারদের মধ্যে কৃষ্ণই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর আগে কৃষ্ণ একজন বীর যোদ্ধা ও ভগবদগীতার দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এবার গোষ্ঠের রাখাল কৃষ্ণের প্রণয়লীলার কথাই বেশি জনপ্রিয় হল। কৃষ্ণকে তামিল দেবতা ময়োনএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে— উভয়ের নামের অর্থই কালো। বংশীবাদক দেবতা গোপিনী-দের সাহচর্যে সময় অতিবাহিত করতেন। উত্তর-ভারতেও এই কাহিনীর মতোই মথুরার গোপালক কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে জড়িত। মনে হয়, উপদ্বীপ অঞ্চলের এক মেষপালক গোষ্ঠীর দেবতা ছিলেন ময়োন। এই গোষ্ঠী উত্তর দিকে এসে মধ্য ও পশ্চিম-ভারতে বসবাস শুরু করে। কৃষ্ণলীলার এই নতুন কাহিনী মথুরা থেকে সারা উত্তর-ভারতেই ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয় গোপিনী রাধাকে পুজো করত উর্বরাশক্তির প্রতীক হিসেবে। এরপর এর একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হল যে, কৃষ্ণের জন্যে রাধার প্রেম হল পরমাত্মার জন্যে মানবাত্মার আকুতি।

দাক্ষিণাত্য থেকে দার্শনিক বিতর্ক উত্তর-ভারতে চলে এসেছিল, যদিও এখনো দাক্ষিণাত্যের নানা অঞ্চলে এই বিতর্ক ছিল সবচেয়ে জীবন্ত। ষড়দর্শনের বিভিন্ন অঙ্গের পুরনো বিতর্ক এযুগেও চলেছিল। তবে, বিতর্কের মধ্যেও ঈশ্বরবাদের প্রবণতা বাড়ছিল। গোড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের বিভিন্ন শাখাগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা শুরু করে দিল। এর উদাহরণ পাওয়া যাবে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নএর রচনায়। ছয়টি দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন প্রাধান্যলাভ করছিল। অনেক বিতর্কের কেন্দ্র ছিল বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মমতের পার্থক্য। শঙ্করাচার্য ও রামানুজের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এই বিতর্ক চলত।

দক্ষিণ-ভারত থেকে ভক্তি-আন্দোলন ক্রমশ উত্তর-ভারতে এলো। কোনো কোনো জায়গায় আগেকার প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী গোষ্ঠীগুলি নতুন ভক্তি মতবাদকেই গ্রহণ করে নিল। বলা বাহুল্য, ভক্তিবাদ এইসব গোষ্ঠীগুলির মতবাদের প্রতি সহানু-ভূতি সম্পন্ন ছিল। বৈষ্ণব ও শৈব— এই দুই গোষ্ঠীরই সমর্থন পেয়ে ভক্তিবাদ কেবল যে এই দুটির মধ্যেই সেতু বন্ধনের কাজ করল তাই নয়, হিন্দুধর্মের অন্যান্য গোষ্ঠীর বিভেদও কমাতে সাহায্য করল। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিবাদ ছিল কারিগরি পেশা-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির প্রতিবাদের মাধ্যম। জনপ্রিয় ধর্মগোষ্ঠীগুলি অনেক সময় চমকপ্রদভাবে তাদের প্রতিবাদ জানাতো। যেমন, কালামুখ ও কাপালিক। তবে, তাদের কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান ছিল সমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য গোষ্ঠীদের আদিম আচারের পুনরাবৃত্তি মাত্র। এরা কোনোদিন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে আসেনি, সেজন্যে প্রতিবাদের প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর ছিল।

ধর্মীয় আচারের এত রকম বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সমন্বয় ও আপোস করে তবেই ব্রাহ্মণ্যবাদ নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই সমন্বয় অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে করা হয় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভবিষ্যতের জন্যে এই আপোসী মনোভাব খুব প্রয়োজনীয় ছিল। কোনো ছোট গোষ্ঠীর ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান যদি খুব

জনপ্রিয় হয়ে পড়ত, ব্রাহ্মণরা ক্রমশ তাকে প্রাচীন পরম্পরাগত ধর্মব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে তাকে মর্যাদা প্রদান করত। সমস্যার সৃষ্টি হতো শুধু তখনই, যখন এই নতুন আন্দোলনকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপন্থী মনে হতো।

শৈবদের মধ্যে নানারকম ভাগ ছিল। শঙ্করাচার্যের উপদেশমতো সরল পদ্ধতিতে উপাসনা থেকে তান্ত্রিক পদ্ধতি পর্যন্ত সবরকম পন্থাই অনুসরণ করা হতো। তান্ত্রিক পদ্ধতিই সবচেয়ে অদ্ভুত ধরনের ছিল এবং বৌদ্ধ ও শৈব পুজো-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে তন্ত্রবাদের জন্ম হলেও তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হতে শুরু করে অষ্টম শতাব্দী থেকে। উত্তর-পূর্ব ভারতে এর প্রভাব ছিল বেশি। তিব্বতের সঙ্গে তান্ত্রিকদের যোগাযোগ ছিল এবং কিছু কিছু আচার এসেছিল তিব্বতীয়দের পুজো-পদ্ধতি থেকেই। দাবি করা হতো, তন্ত্রবাদ বৈদিক মতবাদের সরল সংস্করণ। সকল বর্ণ এবং নারীরাও তন্ত্রবাদের চর্চা করতে পারত। তান্ত্রিক পুজো-পদ্ধতির অঙ্গ ছিল— উপাসনা, রহস্যময় মন্ত্র, যাদুকরী চিহ্ন এবং কোনো বিশেষ দেবতার পুজো। মাতৃমূর্তিকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো, কেননা মাতৃগর্ভেই জীবনের শুরু। এই উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে শাক্ত শক্তি-উপাসনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই মতানুসারে নারীর সৃষ্টি ক্ষমতাকে "শক্তি" অভিহিত করা হতো এবং বলা হতো যে, এই শক্তিই সর্ব কর্মের মূল।*

তন্ত্রবাদের অনুগামী হতে গেলে গুরুর প্রয়োজন হতো প্রথমেই। তান্ত্রিক পুজো-পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে পঞ্চ-ম-কারের প্রয়োজন হতো। এই পঞ্চ-ম-কার হল— মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা (শস্য) ও মৈথুন। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভক্তরা যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছত, তখন সমস্ত মানুষ ও সমস্ত বস্তু সমপর্যায়ভুক্ত। এই ধরনের প্রক্রিয়ার জন্যে গোপন আচার-অনুষ্ঠান প্রয়োজন হতো। অভিযোগ উঠেছে যে, তন্ত্রবাদে নৈতিক চরিত্র কলুষিত হতো। অভিযোগ যাই হোক না কেন, তন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছিল গোঁড়া হিন্দু পুজো-পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে। তাই, তন্ত্রবাদে অন্য ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, শক্তিপুজোর ব্যবস্থা রেখে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। আবার, তন্ত্রবাদে যাদুবিদ্যার প্রতি আগ্রহ থেকে নানা ধাতু ও রাসায়নিক বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরু হয় এবং তার ফলে কিছু কিছু আবিষ্কারও হয়েছিল। তান্ত্রিকরা মনে করে, কোনো কোনো বিশেষ রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে পারদ মিশিয়ে খেলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার জন্যে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল, তন্ত্রবাদ তা নিয়েও চর্চা করে— এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ওপর তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব পড়েছিল। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে যেসব যাদুকরী মন্ত্র ছিল, তারমধ্যে একটি জনপ্রিয় তিব্বতী মন্ত্র হল— ওম্ মণিপদ্মে হুম্। অর্থাৎ, দেখ মণি পদ্মের মধ্যে রয়েছে। ঐশ্বরিক মৈথুনের

* শক্তি এবং মাতৃদেবতার ওপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া থেকে মনে হয়, আর্য পূর্ববর্তী সংস্কৃতির মধ্যেই তন্ত্রবাদের বীজ লুকিয়েছিল। আরো উল্লেখযোগ্য যে, তন্ত্রবাদ শুরু হয়েছিল যেসব জায়গায়, সেগুলি ছিল প্রধানত অনার্য অঞ্চল।

প্রতীক হিসেবেই এই মন্ত্রটি ব্যবহার হয়েছে।

ছোট ছোট উপাসনা পদ্ধতি ধর্ম গোষ্ঠীগুলিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা সবসময়ই অস্বীকার করেছে, এমন নয়। কতকগুলিকে সহ্য করে যাওয়া হতো। আবার কতকগুলিকে উৎসাহও দেওয়া হতো। কারণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যেই পুরোহিতরা জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মতাত্ত্বিকদের তুলনায় স্থানীয় পুরোহিতরা এইসব ছোট ছোট ধর্ম গোষ্ঠীগুলির প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। পশ্চিম-ভারতের পারসীদের প্রভাবে এইযুগে জরথুস্ত্র মতবাদের সূর্য-উপাসনাও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমশ প্রচলিত দেবতাদেরও জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল এবং নতুন দেবতাদেরও উপাসনা শুরু হল। গ্রামাঞ্চলে গণেশ বা গণপতি দেবতার যে পুজো হতো, তাও জনপ্রিয়তা লাভ করল। মনে হয়, গোড়ায় গণেশকে পশুর মূর্তিতেই পুজো করা হতো। পরে ব্রাহ্মণরা তাকে শিব ও পার্বতীর সন্তান বলে বর্ণনা করে নতুন মর্যাদা দিল। এছাড়া উর্বরতার উপাসনার সঙ্গে যুক্ত মাতৃদেবতার পুজোও চলছিল অপ্রতিহত ভাবে।

কর্ণাটকে লিঙ্গায়তদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে জৈনধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ল। পশ্চিম-ভারতের জৈনরা প্রধানত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। জৈনরা ছোট হলেও সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠী ছিল। এদের পক্ষে কৃষিকাজ নিষিদ্ধ ছিল। তাই, ব্যবসায়ের লাভের টাকা আবার নতুন ব্যবসাতেই খাটাতো। এছাড়া, জৈনরা গুজরাতের রাজার সমর্থন পেয়েছিল। সোমনাথের মন্দির ধ্বংসের ২০০ বছর পর, ১২৩০ খ্রীস্টাব্দে আবু পাহাড়ে জৈনরা এক বিরাট মন্দির তৈরি করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ধর্ম হিসেবে জৈনধর্ম অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং এটিকে প্রায় হিন্দুধর্মেরই ছোট একটি সম্প্রদায় হিসেবে মনে করা হতে লাগল। ওদিকে বৌদ্ধধর্মের এটুকু প্রভাবও অবশিষ্ট রইল না। এর জনপ্রিয়তা কমছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যাদুকরী বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুটা বিভ্রান্তিকর ঘটনা। ফলে, বৌদ্ধধর্মের সমস্ত নীতিশিক্ষার বদলে কিছু আচার-অনুষ্ঠানই প্রধান হয়ে উঠল। পূর্ব-ভারতে পালরাজা এবং উড়িষ্যা, কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখল। তবে, রাজাদের সমর্থন ছাড়া সাধারণ মানুষও কিছুটা সমর্থন করেছিল। নাহলে বৌদ্ধধর্ম একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু এরপর আঘাত এলো ইসলামের কাছ থেকে। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম— দুটিই ছিল ধর্ম হিসেবে সংগঠিত; দুটি ধর্মই ধর্মান্তর গ্রহণের সাহায্যে নিজেদের ধর্মের সমর্থক বৃদ্ধি করত। এই নিয়ে দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। বৌদ্ধ মঠগুলির ওপর আক্রমণের ফলে বৌদ্ধরা পূর্ব-ভারত ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পালিয়ে গেল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চল-গুলিতেই বেশি লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে উত্তর-ভারতে ভক্তি আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং বৌদ্ধদের শূন্যস্থান পূরণে কিছুটা সাহায্য করল। এর কারণ হল, পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির কাছে এই আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছিল।

এরপর আরব, তুর্কী ও আফগানদের আগমনের পর ভারতে এক নতুন ধর্মের

উদয় হল— ইসলাম। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ছাড়াও ইসলামের প্রাথমিক প্রভাব এসেছিল পারস্য থেকে আগত মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদীদের মাধ্যমে। এদের বলা হতো 'সুফী'। এরা সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। এখান থেকে এদের শিক্ষার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশে। প্রথমদিকে সুফীরা পারস্যের দার্শনিক চিন্তাই প্রচার করছিল। তারপর ইসলামী ও ভারতীয় চিন্তার সমন্বয়ে নতুন দার্শনিক চিন্তার জন্ম হল। ঈশ্বরের সাধনায় সুফীরা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকরা এদের পছন্দ করত না। এদের মতে সুফীদর্শন ছিল অতিরিক্ত উদারনৈতিক। কিন্তু ভারতবর্ষে সুফী মতবাদ লোকপ্রিয় হয়। বিশেষত, যারা অতীন্দ্রিয়বাদ ও তপশ্চর্যায় আগ্রহী ছিল, তারা সুফী মতবাদে আকৃষ্ট হল। এর অব্যবহিত পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সুফীরা ভক্তিবাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টিকে অনেক সময় 'অন্ধকারাচ্ছন্ন 'যুগ' আখ্যা দেওয়া হয়। এই সময় ক্লাসিক্যাল হিন্দু সংস্কৃতির পতন ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগে বিদেশী শক্তির হাতে উপমহাদেশের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই সময় অন্ধকার যুগ নয়। বরং এই সময় ছিল গড়ে ওঠার যুগ। এ সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। আধুনিক ভারতের নানা প্রতিষ্ঠান এই যুগেই স্থায়ীরূপ নিতে শুরু করেছিল।

ব্যাপক অর্থে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো হিসেবে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত বজায় ছিল এবং সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনে সামন্ততন্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে। এইযুগে যেসব উপবর্ণের সূচনা হয়েছিল, তারা ক্রমশ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আঞ্চলিক ভাষাগুলি থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জন্ম। বর্তমানে ভারতের গ্রামাঞ্চলে (যেখানে অধিকাংশ ভারতীয়ের বাস) প্রচলিত মূলধর্ম ছাড়াও যেসব বিভিন্ন ধর্মীয় পুজা-পদ্ধতি দেখা যায়,— এগুলিও জন্ম নিয়েছিল ওই যুগেই। তাছাড়া, এই যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যে ওই সময়ের সম্পূর্ণতর একটি চিত্র গড়ে তোলা সম্ভব।

১২

আঞ্চলিক রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস

আনুমানিক ১২০০ খ্রীস্টাব্দ—১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ

গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর সফল আক্রমণের পর এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিত্রে এক নতুন উপাদানের আবির্ভাব ঘটল। কারণ, তুর্কী ও আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার এই হল সূচনা। ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, একথা বুঝলেও স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এই নবাগত শক্তি সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখা যায়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবার হস্তান্তরিত হবে, এই সম্ভাবনা অনেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর এই আগন্তুকরা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে, একথা প্রথমে কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

তুর্কী ও আফগানরা প্রথমে দিল্লীর নিকটস্থ অঞ্চলে নিজেদের রাজ্যবিস্তার করল। দিল্লীর একটা সামরিক গুরুত্ব ছিল, কেননা দিল্লী থেকেই গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের নানা অঞ্চলে সহজে যাওয়া যেত। তুর্কীদের বাধা দিয়েছিল যে চৌহানরা, তাদের প্রতিরোধও এসেছিল দিল্লী অঞ্চল থেকেই। ফলে তুর্কীরা দিল্লীকেই প্রতিরোধের কেন্দ্র বলে মনে করত। এছাড়া, আফগানিস্তান থেকে দিল্লীতে সহজেই চলে আসা যেত। দিল্লীর সিংহাসনে তুর্কী রাজাদের রাজত্বকালকে দিল্লীর সুলতানী আমল বলা হয়। সাধারণত ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সমস্ত ইতিহাসকেই সুলতানী আমলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐতিহাসিক যুগ বিভাগের জন্যে এরকম নামকরণ সুবিধাজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে সুলতানী আমল বলতে সারা উত্তর ভারতে কোনো ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য বোঝায় না। বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে অবশ্য সুলতানেরাই ছিলেন প্রধান।

দিল্লী ছাড়াও তুর্কী-আফগান শাসনের প্রভাব পড়েছিল গুজরাট, মালোয়া, জৌনপুর, বাংলাদেশ ও উত্তর-দাক্ষিণাত্যে। এইসব অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ইসলামী সংস্কৃতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। দিল্লীর দরবার প্রথমে ভারতীয় জীবনধারা থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করা হতো এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পদেও মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ার আগন্তুক ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করা হতো। এদের মধ্যে ছিল ভাগ্যান্বেষী মঙ্গোল, আফগান, তুর্কী, পারসী, আরব এবং আবিসিনীয়রা। এরা শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতে অনেক সময় সিংহাসনও দখল করে নিয়েছে, কখনো বা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে গেছে। তবে, এই যুগের শেষভাগে দিল্লীর সুলতানী শ্রেয়তই

প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

গোড়ারদিকে সুলতানরা অবশ্যই সারা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন। নিয়তই যুদ্ধাভিযান সংগঠিত হতো, নানাদিকে সেনাবাহিনী পাঠানো হতো রাজ্য জয়ের জন্যে। দাক্ষিণাত্যে সুলতানদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যকে বশে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে সুলতানদের সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। সুলতানরা দাক্ষিণাত্য জয়ের আশা ত্যাগ করার পরই আঞ্চলিক রাজ্যগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করার সুযোগ পেল। কিন্তু সারা ভারত জয়ের স্বপ্ন দিল্লীর শাসকদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং সুলতানী শাসনের পর মোঘল শাসনকালে এই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল।

উপমহাদেশে নানা রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে সুলতানেরাই ছিলেন প্রধান শক্তি। তাঁরা আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই দমন করার চেষ্টা করতেন। দিল্লীর দরবারে বহু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও লেখকের সমাবেশ হয়েছিল। এর ফলে ওই যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যের অভাব হয় না। সুলতানী আমলের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিছক আরব ও পারস্যের অনুকরণ ছিল না। ভারতের স্থানীয় পরিস্থিতি ও বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী তার পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছিল। সুলতানী যুগের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল আঞ্চলিক তুর্কী ও আফগান রাজ্যগুলিরই অনুরূপ।

রাজদরবারের ঐতিহাসিক ও কবিদের রচিত বিবরণ থেকে সুলতানদের ইতিহাস জানা গেলেও সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এঁরা কিছুই লিখে যাননি। অনেক লেখকই সুলতানদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন বলে তাঁদের বিবরণকে নিরপেক্ষ বলা চলে না। তাঁরা ইসলামী জগতের লেখকদের আদর্শ মনে করতেন। তাঁরা ধর্মের তুলনায় ইতিহাসকে কম গুরুত্ব দিলেও সকলে কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাকে আল্লার ইচ্ছা বলে বর্ণনা করেন নি। ঐতিহাসিক বরনির লেখা পড়ে মনে হয়, এই ধরনের বর্ণনা সেযুগে বিরল ছিল না। বরনি অবশ্য এমন যুগে লিখেছিলেন যখন মনে করা হতো কয়েকজন সুলতানের উদ্ভট কাজকর্মের ফলে ঈশ্বর সুলতান শাসিত রাজ্যকে ত্যাগ করে গেছেন। তবে অন্যান্যরা যেমন, আমীর খসরু, ইসামী ও আফিফ সুলতানী সম্পর্কে এত কঠোর মতামত দেননি।

সৌভাগ্যক্রমে এইসব ঐতিহাসিকদের রচনা ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও এই যুগ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা গেছে। সুলতানীর পরবর্তী যুগের লেখকদের লেখাতেও সুলতানীর উল্লেখ আছে। যেমন, ফিরিস্তা ও বদৌনীর রচনা এবং সুফীসাহিত্য। এছাড়া, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণেও নিরপেক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উত্তর-আফ্রিকার আরব পর্যটক ইবন বতুতা। ইনি ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। কিছুদিনের জন্যে এখানে সুলতানের অধীনে বিচারকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর চীন ভ্রমণ করে ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকায় ফিরে আসেন। তারপর নাইজার নদীর উৎস

অনুসন্ধানের জন্যে টিমবাকটু অঞ্চল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর এইসব ভ্রমণের অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর বর্ণনা রীতিমতো রোমহর্ষক। ব্যক্তিগত জীবনে এবং কার্যক্ষেত্রে তিনি দুঃসাহসী ছিলেন, ফলে জাহাজডুবি, ডাকাতের আক্রমণ, প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি, উচ্চপদ, অসংখ্য স্ত্রী এবং নানা অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন পূর্ণ।

যেসব দেশের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বা যেসব দেশ কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল, আরব ভূগোলবিদ ও ব্যবসায়ীরা সেগুলি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ভারতবর্ষ। পরে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় পর্যটক যেমন, মার্কোপোলো ও অ্যাথানাসিয়াস নিকিতিন ভারতবর্ষে এসেছিলেন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং সোনার লোভে। কিন্তু তাঁরা প্রধানত দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতেই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। উত্তর-ভারত সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কিছু লিখে যাননি। এরকম একজন পর্যটক ছিলেন সমরকন্দ রাজ্যের আবদুর রাজ্জাক। ইনি এসেছিলেন বাহমনী রাজ্যে।

১২০৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক ঘোষণা করলেন যে, ঘোরীর অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে তিনিই সুলতান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানের রাজত্ব আর আফগান রাজ্যের প্রদেশমাত্র রইল না, স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল। কিন্তু ভারতবর্ষের তুর্কীরা ভয় পাচ্ছিল যে, রাজপুতেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের আক্রমণ করতে পারে। আশ্চর্য লাগে, রাজপুতেরা কখনোই কিন্তু তা করেনি। গজনীর শাসক পাঞ্জাব জয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কুতুবুদ্দীন এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে দিল্লী থেকে লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। লাহোর দিল্লীর তুলনায় আফগানিস্তানের অনেক কাছে। কিন্তু দিল্লীর তুর্কী ওমরাহরা কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ইলতুতমিসকে সুলতান নির্বাচন করে আবার দিল্লীতেই রাজধানী সরিয়ে আনলেন।

ইলতুতমিস বুঝেছিলেন যে, তুর্কী রাজ্যটি নিরাপদ করতে হলে সুলতানীকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তুর্কী ওমরাহদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে দেওয়া চলবে না। ১২২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুলতানীর উত্তরসীমা নিয়ে গেলেন সিন্ধুনদীর তীরে এবং ওমরাহদের বসে আনলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুতেরা তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং রণথাম্ভোরের বিখ্যাত দুর্গটি তুর্কীদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করল। ইলতুতমিস রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। রাজপুত ও তুর্কীদের মধ্যে বহু অসমাপ্ত যুদ্ধের মধ্যে এটি ছিল প্রথম।

সুলতানীর উত্তরসীমান্ত গজনীর শাসকদের কাছ থেকে নিরাপদ হলেও মঙ্গোল আক্রমণের ভয় ছিল সব সময়েই। তারা ওইসময়ে মধ্য-এশিয়ার আদি বাসভূমি ছেড়ে অনেক এগিয়ে এসেছিল। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বারবার আক্রমণ করে, মঙ্গোলরা পশ্চিম-পাঞ্জাব অধিকার করে ফেললো। কিন্তু ইলতুতমিসের সামর্থ্য ছিল না যে এদের বাধা দেন। তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কী ওমরাহদের মধ্যে নানা ষড়যন্ত্র

শুরু হয়ে গেল। ইলতুতমিসের কন্যা রাজিয়া সিংহাসনে বসার সময় কিছুদিন এই রাজনৈতিক অস্থিরতা শান্ত হয়েছিল। ওই সময়কার এক ঐতিহাসিক সিরাজ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"সুলতানা রাজিয়া মহান রানী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী, ন্যায়বিচার পরায়ণা ও দয়ালু ছিলেন এবং রাজ্যের নানা উন্নতিসাধন করেছিলেন। প্রজাদের ওপর তাঁর দরদ ছিল। সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবারও যোগ্যতা ছিল। রাজার যা গুণ থাকা উচিত, রাজিয়ার সবই ছিল। কিন্তু তিনি নারী ছিলেন বলে পুরুষের বিচারে তাঁর কোনো গুণই মূল্য পেল না।"[১]

রাজিয়া যে. একজন নারী এবং তিনি যে রাজ্য নিজেই চালাবার ক্ষমতা রাখতেন, এই ব্যাপারটাতেই সকলের আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত রাজিয়াকে হত্যা করা হয়। এরপর আবার 'আমীর ওমরাহরা পারস্পরিক ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে সুলতানীর এক মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটালেন।

সুলতানী রাজত্বকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে ওই সময়ে প্রয়োজন ছিল একজন কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুলতানের। সীমান্ত অঞ্চলের ওমরাহরা স্বাধীন হয়ে যাবার সুযোগ খুঁজছিল। রাজপুত গোষ্ঠীগুলি ততদিন গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করে সুলতানী সেনাদলকে রীতিমতো বিব্রত করে তুলেছিল। এইসব কারণে প্রচুর অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করে রাজ্যের নানা অঞ্চলে সেনাবাহিনী পাঠাতে হতো। মঙ্গোলরা ১২৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঞ্জাব অধিকার করে থাকায় সুলতানদের পক্ষে আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো না। এই পরিস্থিতির মধ্যে বলবন এসে দিল্লী সুলতানীকে শক্তিশালী করে তুললেন। বিদ্রোহীদের তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়ে দমন করলেন এবং যেসব অঞ্চলে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে এমন সব সৈনিকদের বসতি করালেন যারা চাষবাসেরও কাজ করত। এরা গুপ্তচরের কাজও করত এবং স্থানীয় শাসকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারত। শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিয়ম শৃংখলা আনা হল। রাজনৈতিক ব্যাপারে তুর্কীদের প্রাধান্য দেওয়া হতো। ভারতীয় মুসলিমদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হতো না। তুর্কীদের এই প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুর্কী সুলতানকে নিরাপদ করা।

বলবন কোনো রাজবংশ প্রতিষ্ঠা না করলেও সুলতানী টিঁকে গেল। ১২৯০ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীদেরই আরেকটি গোষ্ঠী খলজীরা ক্ষমতায় এলো। খলজীরা প্রকৃতপক্ষে আফগান বংশোদ্ভূত হওয়ায় অসন্তুষ্ট আফগান ওমরাহদের আনুগত্য পেতে অসুবিধে হয়নি। আফগানরা মনে করত, আগেকার সুলতানরা তাদের অবহেলা করেছেন। খলজীরা ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চপদ দিয়ে বলবনের নীতির পরিবর্তন করেছিল। খলজী রাজবংশকেও রাজপুত ও মঙ্গোলদের নিয়ে নানভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বলবন সুলতানীর ভিত্তি শক্তভাবেই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, খলজীরা নিজেদের ক্ষমতা বর্ধিত করে তাকে আগে সুদৃঢ় করে তুললেন।

বৃদ্ধ খলজী সুলতানের এক উচ্চাকাংক্ষী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন আলাউদ্দীন। তিনি পূর্ব-ভারত ও দাক্ষিণাত্যে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেবগিরি আক্রমণ করলেন। সেখানে তখন যাদব বংশীয় রাজাদের শাসন ছিল। যাদবরাজা আত্মসমর্পণ করে সন্ধির সর্ত হিসেবে আলাউদ্দীনকে প্রচুর সোনা দিতে সম্মত হলেন। আলাউদ্দীন রাজধানীতে ফিরে এসে বৃদ্ধ সুলতানকে হত্যার ব্যবস্থা করলেন এবং তারপর নিজেই সুলতান হয়ে বসলেন। ওমরাহদের বশ করলেন দেবগিরি থেকে আনা সোনার সাহায্যে। সুলতানীর সবচেয়ে গৌরবের দিন ছিল আলাউদ্দীনের শাসনকাল। রাজ্যের সীমানা এবং সুলতানের ক্ষমতাবৃদ্ধি দুই-দিকেই আলাউদ্দীন আর সকলের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি যে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে বিরল ছিল।

বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে ইলতুতমিস সম্মানবস্ত্র পেয়েছিলেন। খলিফার সঙ্গে দিল্লীর সুলতানীর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এ সম্মান পুরোপুরি তাৎপর্য-হীন নয়। খলিফাই ছিলেন ইসলামী জগতের প্রধান এবং পুঁথিগতভাবে সমস্ত মুসলিম রাজাই তাঁর অধীন। তাই দিল্লীর সুলতান বাস্তবে কারো আজ্ঞাবহ না হলেও অন্য রাজাদের মতো পুঁথিগতভাবে খলিফার প্রতিনিধি ছিলেন। বাস্তবে সুলতান ছিলেন সার্বভৌম, বিচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তবে, ইসলামের পবিত্র আইন শরিয়তের বিধান তাঁকেও মানতে হতো। অবশ্য শরিয়তী আইন রচিত হয়েছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্নদেশে। তাই, ভারতবর্ষের স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের সম্মতি নিয়ে আইনের সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে বাধা এসেছিল ওমরাহ ও অধীনস্থদের কাছ থেকে।

সুলতানীর মূল রাজস্ব আদায় হতো জমির খাজনা থেকে। তাই সুলতানী প্রতিষ্ঠার পর ভূমিরাজস্বের ব্যাপারটাতে পুনর্বিচারের প্রশ্ন দেখা দিল। আগের যুগের তুলনায় সুলতানী আমলের ভূমিব্যবস্থায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। তবু প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ইসলামী চিন্তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল।

শরিয়তী আইনে শাসক চারটি সূত্রে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী: ভূমিরাজস্ব, অ-মুসলমানদের ওপর কর, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অধিকৃত ধনসম্পদের এক-পঞ্চ-মাংশ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে মুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে কর। সুলতানী আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু এই পরিমাণ বৃদ্ধি করে কখনো কখনো অর্ধেক শস্যও রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। রাজকোষের সবচেয়ে আর্থিক আয় ভূমিরাজস্ব থেকেই হতো।

অ-মুসলমানদের ওপর ধার্য করের নাম ছিল জিজিয়া। এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। সুলতানের মর্জির ওপর নির্ভর করত। তবে, বিভিন্ন ধরনের লোককে এই কর থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হতো এবং এই কর আদায়ের পরিমাণ মোট রাজস্বের সামান্য আংশই ছিল। অনেক সময় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে আইনসংগত-

ভাবে এই কর ধার্য করা হতো,— অ-মুসলমানদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে জিজিয়া কর দেবার প্রয়োজন হতো না। সেইজন্যে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বেশি লোক ধর্মান্তরিত হলে রাজকোষই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই কারণে সুলতানরা ব্যাপক হারে ধর্মান্তরীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয় না।— সাধারণত শহরের পেশাদার ও কারিগর শ্রেণীভুক্ত মানুষের ওপর জিজিয়া কর বসানো হতো। এই পরিমাণ ভূমিরাজস্ব গ্রামাঞ্চল থেকে আদায় করতে হলে কৃষকদের ওপর অনেক বেশি চাপ পড়ত।

মুসলমানদের ওপর যে বিশেষ করের ব্যবস্থা ছিল, তাও সুলতানদের খেয়ালের ওপরই নির্ভর করত। যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্পদের ব্যাপারে সুলতান অনেক সময় পাঁচ-ভাগের চারভাগই নিজের জন্যে রেখে দিতেন। এ ছাড়াও রাজস্ব আদায় হতো বৈদে-শিক বাণিজ্যের ওপর শুল্ক ও আমদানি করা জিনিসের ওপর কর থেকে। এই করের হার ছিল দ্রব্যমূল্যের শতকবা আড়াই ভাগ থেকে শতকরা দশভাগ।

সুলতানীরাজ্য অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হতো 'মুক্তি'। প্রদেশশাসন ও কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় ছিল শাসনকর্তার দায়িত্ব। তবে, সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকর্তাদের বদলিও করা হতো। রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ তিনি বেতন হিসেবে পেতেন। বাকি রাজস্ব যেত সুলতানের কাছে। নিজের বেতনের অর্থ থেকে মুক্তি সুলতানের প্রয়োজনের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ও পদাতিক সৈনিক প্রস্তুত রাখতেন। মুক্তির কাজে সাহায্যের জন্যে ছিলেন ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মচারী। এইসব রাজস্ব ছাড়া সুলতানের নিজস্ব 'খালসা' জমি থেকেও রাজস্ব আদায় হতো। সুল-তানের নিজের প্রয়োজনেই এই অর্থ ব্যয় করা হতো এবং এখানকার শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ববিভাগের হাতেই ছিল।

এছাড়াও আরো যা জমি ছিল তা সুলতান তাঁর কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ও পুরস্কার হিসেবে দান করতে পারতেন। সুলতানী যুগের আগে উত্তর-ভারতে যেরকম ব্যবস্থা ছিল সুলতানী আমলের "ইক্তা" বা ভূমিদান ব্যবস্থাও প্রায় একই রকম ছিল। ওই দানের পরিমাণ গ্রামে ও প্রদেশে বিভিন্ন রকম ছিল। বেতনের পরি-বর্তে দানই ছিল সবচেয়ে প্রচলিত প্রথা। তবে, আগের মতো এ যুগেও ভূমির প্রকৃত মালিকানা সুলতানের হাতেই থাকত। জমির করের ওপরই গ্রহীতার অধিকার ছিল। বংশানুক্রমে কেউ এই সুবিধে ভোগ করতে পারবে কিনা, সেটা সুলতানের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত। এছাড়া কখনো কখনো জমির আঞ্চলিক শাসক জমির ইজারা নিতেন, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যত রাজস্বই সংগৃহীত হোক না কেন, তিনি সুলতানকে প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে স্বীকৃত হতেন। কিন্তু এই এই ব্যবস্থায় দুর্নীতির নানা সুযোগ ছিল। আগে থেকেই যেসব গ্রহীতারা দান করা জমির সুবিধে ভোগ করছিল, সুলতানকে কোনোভাবে অসন্তুষ্ট না করলে কেউ তাদের অধিকারের হস্তক্ষেপ করত না। তবে, সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত। ইক্তা পদ্ধতিতে ছোট ছোট গোষ্ঠীপতি ও ভূম্যধিকারীদের

শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে অস্ববিধে হয়নি।

ম্বক্তি ও ইক্তাদারদের স্বলতানের জন্যে কৃষকদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে দিতে হতো। তাই, স্বলতানের সেনাবাহিনীতে নানা ধরনের ও নানা জায়গার লোক থাকত। তাঁর নিজস্ব সেনাবাহিনীতে ছিল ক্রীতদাসের মধ্য থেকে নির্বাচিত দেহরক্ষী-বাহিনী এবং আরো কিছু সংখ্যক সৈনিক। এদের কিছু অংশ থাকত রাজধানীতে এবং অবশিষ্টরা সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বর্গে। সৈনিকরা বেতন পেত, কিংবা তাদের ছোট ছোট ইক্তার অধিকারী করে দেওয়া হতো।

ম্বক্তি ও ইক্তাদারদের সম্মিলিত সেনাবল ছিল স্বলতানের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশি। নিয়মান্বসারে এরা সবাই স্বলতানের অন্বগত হলেও তাদের মধ্যে স্বাধীন হবার বা অনেক সময়ই ম্বক্তির প্রতিই বেশি বিশ্বস্ত হবার প্রবণতা দেখা যেত।

আলাউদ্দীন মসনদে বসার সময় স্বলতানী রাষ্ট্রের কাঠামো ছিল এই ধরনেরই। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আলাউদ্দীনের যে বিশ্বাস ছিল তা বোঝা যায় কৃষিব্যবস্থায় তিনি যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ইক্তাদারদের ক্ষমতা কমিয়ে স্বলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আগেকার স্বলতানী আমলের সমস্ত দান, ধর্মীয় দান, মালিকানা স্বত্ব, মাসোহারা ইত্যাদি তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন। নত্বন করে ভ্বমিরাজস্বের হিসেব হল। (অবশ্য ফসলের উৎপাদন বেড়েছে না কমেছে তা স্থির করার জন্যে কিছুদিন অন্তর ভ্বমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ হওয়ারই কথা) তারপর নত্বন করে কিছু কিছু ভ্বমিদান হল। আগেকার ইক্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে আলাউদ্দীন ব্বঝিয়ে দিলেন যে, ইক্তা চিরস্থায়ী মালিকানা নয়। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের অর্ধাংশ স্থির করা হল এবং এ ব্যাপারে কোনোরকম স্ববিধে দেওয়া হল না। এছাড়াও, গ্রামবাসীরা পশ্বপালন করে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করলে তার ওপরও পশ্বচারণ কর বসানো হল। প্রতি অঞ্চলের গড় উৎপাদন অন্বযায়ী রাজস্ব নির্ধারিত হতো। যে বছর ফসল ভালো হতো সে বছর এ ব্যবস্থায় কারো অস্ববিধে হতো না, কিন্তু অজন্মার বছর কৃষকদের অত্যন্ত কষ্ট পেতে হতো।

আলাউদ্দীন চেয়েছিলেন যে, উদ্বৃত্ত আয় ইক্তা-অধিকারীদের কাছে না গিয়ে যেন রাজকোষেই জমা হয়। আয়বৃদ্ধির জন্যে বাড়তি রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইক্তাদারদের ছিল। আমীর-ওমরাহরা যাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্যে আলাউদ্দীন তাদের মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ, সম্ভবত মদ্যপানের আসরেই সাধারণত ষড়যন্ত্রের শলা-পরামর্শ হতো। ওমরাহদের পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার আগে স্বলতানের অন্বমতি নিতে হতো। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক মতলবে যেন কোনো বিয়ে না হয়। বলাবাহ্বল্য, এই সাবধানতা কার্যকরী করার জন্যে স্বদক্ষ গ্বপ্তচর বাহিনীরও প্রয়োজন হতো।

রাজকোষের বাড়তি অর্থ সেনাদল গড়ে তুলতেই খরচ হয়ে যেত। মঙ্গোল ও রাজপ্বতদের আক্রমণের সমস্যা ও দক্ষিণ-ভারতে য্বদ্ধযাত্রার জন্যে বিরাট সেনা-

বাহিনীর প্রয়োজন হতো এবং তার খরচ নির্বাহের জন্যে বাড়তি রাজস্বও দরকার ছিল। তাঁর ভূমিরাজস্ব নীতি নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তা আলাউদ্দীন বুঝেছিলেন এবং সেজন্যে তিনি ব্যবহারের সমস্ত জিনিষেরই মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। নিয়ন্ত্রিত মূল্য ও নির্ধারিত পরিমাণে শস্য বিক্রী করা হতো। উৎকৃষ্ট সুতীবস্ত্রের কেনাবেচার ওপরও নিয়ন্ত্রণ চালু হল। কিন্তু এইসব নিয়ন্ত্রণ কেবল দিল্লী ও তার কাছাকাছি অঞ্চলেই সফল হয়েছিল। অন্য কোথাও জিনিসের সরবরাহ, মূল্য ইত্যাদির ওপর নজর রাখা সম্ভব ছিল না এবং আইনভঙ্গকারীদের সাজা দেওয়া সম্ভব হতো না।

মঙ্গোলরা ক্রমাগত উত্তর-ভারত আক্রমণের চেষ্টা করত। শেষ পর্যন্ত ১৩০৬ সালে ঘরোয়া বিবাদ শুরু হওয়ায় মঙ্গোলরা আবার মধ্য-এশিয়ায় ফিরে যায়। ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন গুজরাট ও মালোয়ায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন ও রাজপুতদের রণথাম্বোর ও চিতোর দুর্গ দুটি দখল করে নিয়েছিলেন। তবে, দাক্ষিণাত্যে তাঁর সেনাদল বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। আলাউদ্দীনের স্বপ্ন ছিল যে দাক্ষিণাত্যের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি সুলতানীর অন্তর্ভুক্ত করবেন। এরপর তাঁর ধর্মান্তরিত সেনাপতি সুদর্শন যুবক মালিক কাফুরের নেতৃত্বে গুজরাটে আরেকবার সেনাবাহিনী পাঠালেন। গুজরাটী এই যুবকের নেতৃত্বে অভিযান সফল হল। দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চল ক্রমশ উত্তর-ভারতের নতুন রাজনৈতিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মালিক কাফুর নানাদিকে আক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি সন্ধিচুক্তি করেন। এমনকি পাণ্ড্যরাজ্যের মাদুরা শহরের ওপরও কাফুর আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর আগে উত্তরাঞ্চলের কোনো শাসক মাদুরা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। আলাউদ্দীন যখন ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ করছেন, তখনি উত্তরাঞ্চলে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। একে একে গুজরাট, চিতোর ও দেবগিরি সুলতানী শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হতাশ আলাউদ্দীন ১৩০৬ সালে মারা গেলেন।

এরপর চারবছর ধরে ঘন ঘন রাজাবদলের পালা চললো। এঁদের শেষজন ছিলেন এক নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু। তিনি সুলতানের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সুলতানকে হত্যা করে নিজেই মসনদ দখল করে নেন। এঁর নিম্নবর্ণে জন্ম হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তৎকালীন বিবরণগুলিতে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে। অথচ ইসলামে এই ধরনের বর্ণ সচেতনতা থাকার কথা নয়। তাঁর নিম্নবর্ণে জন্ম এবং সর্বোপরি ভারতীয়ত্ব নিয়ে এক তুর্কী পরিবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করল। এদের নেতা গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন দখল করে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন।

আলাউদ্দীনের মতো নতুন সুলতানকেও একই ধরনের রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। বরঙ্গল, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করে তিনি আবার সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। আলাউদ্দীন প্রবর্তিত নিয়মগুলি হয় তুলে নেওয়া হল, নয়তো শিথিল করা হল। ইক্‌তাদাররা তাদের

পুরনো অধিকার ফিরে পেল। কেবল প্রাদেশিক শাসকরাই এদের মাথার ওপর ছিল। কিন্তু শাসক ও ইক্‌তাদাররা একসঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। এইভাবে ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা আবার ওমরাহদের হাতে চলে যেতে লাগল।

গিয়াসুদ্দীনের পর গদিতে বসলেন মহম্মদ-বিন তুঘলক। বহু বিতর্কিত এই রাজার নানারকম অভিনব কার্যকলাপের জন্যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে 'পাগল' আখ্যা দিয়েছেন। অথচ তাঁর রাজনৈতিক রীতিনীতি বিচিত্র ও অভাবনীয় হলেও তার পেছনে কিছু অকাট্য যুক্তিও ছিল।

মহম্মদ সম্ভবত আলাউদ্দীনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এছাড়া মধ্য-এশিয়ার খোরাশানে এক অভিযানের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। এইসব সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করেই তাঁর অর্থনীতি রচিত হয়েছিল। তিনি প্রথমেই দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল) রাজস্ববৃদ্ধি করলেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাজস্বের দাবি মেনে নিলেও এবার কৃষকরা ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করে দিল। বিদ্রোহ দমন করে করনীতি পরিবর্তন করা হল। মহম্মদের দুর্ভাগ্য যে, এরপরই দোয়াবে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

উত্তর-দাক্ষিণাত্য সুলতানীর অধিকারভুক্ত হয়েছিল এবং দক্ষিণদিকের আরো রাজ্য তিনি জয় করতে চাইছিলেন। তাই, এই রাজ্যগুলির কাছাকাছি দক্ষিণে তিনি একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করার পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনা বেশ সংগতই মনে হয়েছিল। ১৩২৭ থেকে ১৩৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাজদরবার দৌলতাবাদ বা যাদবদের রাজধানী পুরনো দেবগিরিতে চলে এলো। মহম্মদ যদি দরবার স্থানান্তরিত করেই ক্ষান্ত হতেন, তাহলে কারো আপত্তির কোনো কারণ থাকত না। কিন্তু তিনি আদেশ দিলেন যে দিল্লীর প্রত্যেক অধিবাসীকেও তাঁর সঙ্গে নতুন রাজধানীতে যেতে হবে। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। শেষ পর্যন্ত দৌলতাবাদকে রাজধানী হিসেবে উপযুক্ত মনে না হাওয়ায় কয়েক বছর পরে রাজধানী আবার দিল্লীতেই ফিরে এলো।

ইতিমধ্যে অন্যান্য গোলযোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিতোর দুর্গ রাজপুতরা আবার দখল করে নিল এবং বাংলাদেশের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মঙ্গোলরা সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করল এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের তুষ্ট করা হল। এইসব সমস্যা মিটে যাবার পর মহম্মদের ইচ্ছে হল যে, মধ্য-এশিয়ায় তিনি অভিযান চালাবেন। এরজন্যে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন ছিল। তাই, মহম্মদ তামা ও পেতলের মুদ্রা বাজারে ছাড়লেন। এই ধরনের মুদ্রাব্যবস্থা চীন ও পারস্যে প্রচলিত ছিল এবং সুলতান সম্ভবত সেকথা জানতেন। কিন্তু এই নতুন মুদ্রা যাতে জাল না করা যায়, সে সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হল না। ব্যবসায়ীরা রাশিরাশি জালমুদ্রা বাজারে ছেড়ে দিল। সব মিলিয়ে এক সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিল। খোরাসান অভিযানও পরিত্যক্ত হল। এর বদলে মহম্মদ হিমালয়ের কাংড়া অঞ্চলে একটা ছোট অভিযান পরিকল্পনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলেন। অবশ্য এই অভিযানেরও প্রয়োজন ছিল, কেননা কাংড়ার উপজাতীয়রা সমতল

অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নিজেদের কাছে আশ্রয় দিত এবং কাংড়া দমন তাদের সামনে একটা উদাহরণ হিসেবে দরকার ছিল।

আলাউদ্দীন বুঝেছিলেন যে, সুদূর দক্ষিণের উপকূল অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা কঠিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হল, দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চেষ্টা না করে কেবল কর আদায় করা। তাতে রাজকোষের অবস্থা ভালো হবে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থাও বেশিদিন চলতে পারে না। মহম্মদও একথাটা বুঝেছিলেন এবং সেজন্যে দাক্ষিণাত্যে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসে সুলতানীর ভীত দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহম্মদকে দিল্লীতে ফিরে যেতে হলেও দাক্ষিণাত্যে মহম্মদ যে এসেছিলেন তার ফলেই কিছুকাল পরে উত্তর-দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্য স্থাপিত হল। মাদুরাই-এর পাণ্ড্যরাজ্য ১৩৩৪ সালে সুলতানীর কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয় এবং তারপর উত্তরদিকে বরঙ্গলেও একই রকম বিদ্রোহ দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যের উপকূল অঞ্চলের রাজ্যগুলি এইভাবে স্বাধীন হয়ে গেল। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হল বিজয়নগর রাজ্য এবং পরবর্তী ২০০ বছর ধরে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরই ছিল প্রধান রাজ্য। সাম্রাজ্যগঠনের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

সুলতানীর ভাঙন যা আলাউদ্দীন কিছুটা মেরামত করেছিলেন, এখন তা আবার প্রকট হয়ে উঠল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। দিল্লী ও সংলগ্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় জাঠ ও রাজপুত চাষীরা বিদ্রোহ করে বসল। রাজদরবারের ধর্মীয় প্রবক্তারাও এবার মহম্মদের নানা নীতির সমালোচনা শুরু করে দিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সাধ্য সুলতানের ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৩৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মহম্মদের মৃত্যু হল।

দরবারের ওমরাহ ও ধর্মীয় প্রবক্তারা মহম্মদের খুল্লতাতপুত্র ফিরোজ শাহকে পরবর্তী সুলতান নির্বাচিত করলেন। তাঁর প্রথম কাজ হলো বিদ্রোহ দমন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বিদ্রোহীদের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। যেমন—বাংলাদেশ। আমীর ওমরাহদের অনুগ্রহে গদি দখল করার জন্যে ফিরোজ শাহ বাধ্য হয়েই তাদের অনেকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ফলে, কৃষি ও ভূমিরাজস্বের ব্যাপারে আগেকার কঠোরতা শিথিল হয়ে গেল। আগেকার আমলের রাজারা যেসব ধর্মীয় দান বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, ফিরোজ শাহের আমলে উত্তরাধিকারীদের হাতে ওইসব দান আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ, বংশানুক্রমিক ভোগদখলের অধিকার মেনে নেওয়া হল। রাজকর্মচারী ও সেনাপতিদের ফিরোজ উদারভাবে প্রচুর জমি চাষ করার জন্যে দিয়ে দিলেন। এইজন্যে সমস্ত চাষের জমির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়েছিল। এর জন্যে সময় লেগেছিল ছয় বছর। সমগ্র জমির রাজস্বের পরিমাণ হিসেব করে দাঁড়াল ৭ কোটি টঙ্কা।*

* প্রতিটি রৌপ্য টঙ্কার মূল্য ছিল ১৭২ গ্রেন রূপা এবং এটি ছিল মোটামুটি এক টাকার সমতুল্য। তবে, তখনকার দিনে টঙ্কার ক্রয়মূল্য ছিল প্রচুর। এক টঙ্কার বিনিময়ে ৭৫ কিলোগ্রাম গম কেনা যেত। সোনার টঙ্কা ও তৈরি হতো, কিন্তু তা কেবল উপহার হিসেবেই ব্যবহার হতো। ৪৮ 'জিতল'-এ এক টঙ্কা হতো।

কোনো কোনো সুলতান মন্দির ও মূর্তিভঙ্গকারী হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তৎকালীন বিবরণীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সম্ভবত সুলতানদের ধর্মে প্রগাঢ় ভক্তির প্রমাণ হিসেবেই এত বিস্তারিতভাবে এইসব কার্যকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মানুরাগ ছাড়া অন্য কারণও ছিল। ফিরোজ শাহ কোনো কোনো সময় মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। উড়িষ্যা অভিযানের সমাপ্তি হিসেবে ফিরোজ, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

সমকালীন বিবরণী লেখকদের এটাই প্রমাণ করা লক্ষ ছিল যে সুলতানের শাসনে বিধর্মীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাহলে গোঁড়া মুসলমানরা খুশি হবে। শুধুমাত্র ধর্মবিদ্বেষ বা মূর্তিপূজা বিরোধ গজনীর মামুদের মতো লোকের মন্দির ধ্বংসের কারণ হয়তো হতে পারে (যদিও সেক্ষেত্রেও লুণ্ঠনের লোভটা কম ছিল না), কিন্তু কোনো সুলতানের পক্ষে নিজের রাজ্যে মন্দির ধ্বংসের আদেশ জারী করে পুণ্যার্জনের চেষ্টা অত্যন্ত বোকামির পরিচয়, তাতে সন্দেহ নেই।

সিন্ধু অঞ্চলের আরবদের সম্পর্কে একটি দলিল পাওয়া যায়, তাতে মূর্তিভাঙ্গার কি উদ্দেশ্য তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সিন্ধু বিজেতা আরবীয় মহম্মদ বিন কাসিম তাঁর ওপরওয়ালার কাছে একটি চিঠি লিখে এই জবাব পেয়েছিলেন :

> "...আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বিন কাসিমের পত্র পেয়েছি এবং বক্তব্যও বুঝতে পেরেছি। বোঝা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রধান অধিবাসীরা বুধ অঞ্চলে তাদের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে নিজেদের ধর্মাচারণের অনুমতি চেয়েছে। অধিবাসীরা যখন খলিফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করার কথা ওঠে না। তারা আমাদের আশ্রয়ে আছে এবং তাদের জীবন ও সম্পত্তির ওপর আমরা হাত দিতে পারি না। তারা তাদের নিজেদের ধর্মাচরণ করুক। নিজের ধর্মপালন সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তারা যেমন খুশি থাকুক...।"[১২]

যদি একথাও বলা যায় যে, তুর্কীদের তুলনায় আরবরা অনেক সুসভ্য ও মানবিক ছিল, মূর্তিভঙ্গের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের এটাই বোঝানো হতো যে, বিদেশীরা অনেক বেশি পরাক্রান্ত।*

তখনো পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায় দেশের সমগ্র জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা তাই নিজেদের খুব নিরাপদ মনে করত না। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ছিল প্রধানত নিম্নবর্ণের হিন্দু। এইসব হিন্দুরা আশা করেছিল যে, ইসলাম ধর্মে তাদের অবস্থা ভালো হবে। এরা অভিজাত মুসলমানদের বিশেষ সাহায্য বা ভরসা দিতে পারেনি। উচ্চবর্ণের যেসব হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা কদাচিৎ ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এরা অধি-

* এভাবে এক সুলতান অন্য সুলতানের কাছেও নিজের পরাক্রম প্রকাশ করতেন। পরবর্তী যুগে সুলতান সিকান্দার লোদী জৌনপুরের সুলতানের মসজিদ ভেঙে দিয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দুই সুলতানই কিন্তু ছিলেন মুসলমান। সুতরাং দুটি পরস্পরবিরোধী ধর্মের কথাই এখানে ওঠে না।

কাংশই ছিল সুযোগ সন্ধানী। তারা ভাবত, ধর্মান্তরের সাহায্যে তারা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। এদের কিছু কিছু উচ্চপদ দেওয়া হলেও তুর্কী ও আফগানরা এদের সন্দেহের চোখেই দেখত।

গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমানরা একে অপরের ধর্মের প্রভাব বরদাস্ত করত না। মুসলমানরা হিন্দুদের শাসন করত বটে, কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের বর্বর বলে অভিহিত করত। হিন্দুদের মন্দির মুসলমানদের কাছে কেবল যে পৌত্তলিকতার প্রতীক ছিল তাই নয়, তারা বুঝত যে এই দেশের শাসক হওয়া সত্বেও এখানকার জীবনযাত্রার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। মন্দির কেবল ধর্মীয় আচার পালনেরই স্থান ছিল না, বহুকাল ধরেই মন্দিরগুলি গ্রামের হিন্দুদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মন্দিরে হিন্দুরা একসঙ্গে এসে জড়ো হতো, আর হিন্দুদের একত্র সমাবেশ শাসকদের ভীতির কারণ ছিল। কেননা, এইসব সমাবেশেই বিদ্রোহের বীজ বপন হতো। (একই কারণে সুলতানরা সুফীদের ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রগুলি সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করতেন।) মন্দির ছিল একাধারে ব্যাঙ্ক, ভূস্বামী, কারিগর ও ভৃত্যদের নিয়োগকর্তা, শিক্ষা ও আলোচনার কেন্দ্র, গ্রামশাসন কেন্দ্র এবং উৎসবেরও কেন্দ্র। মুসলমান শাসকের এসবে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। মন্দির দেখলেই দেশের সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা মুসলমানদের মনে পড়ে যেত। অন্যদিকে আবার, রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর গোঁড়া হিন্দুদের কাছে এই বিচ্ছিন্নতাই একমাত্র অস্ত্র ছিল, যার দ্বারা তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে পারত।

ফিরোজের মূর্তিভাঙার উৎসাহের সঙ্গে ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহের ব্যাপারটার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। একবার কাংড়ার একটি গ্রন্থাগারে গিয়ে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন পুঁথিপত্র যেন আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মীরাট ও তোপরায় গিয়ে অশোকের স্তম্ভগুলি দেখে ফিরোজ এত মুগ্ধ হন যে, সেগুলি তিনি দিল্লীতে আনিয়ে নেবার আদেশ দেন। একটি স্তম্ভ নগরদুর্গের কাছে স্থাপন করা হয়। স্তম্ভগাত্রের লিপিগুলি ফিরোজ পড়তে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু অশোকের যুগের এতকাল পরে লিপি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে কেউই ওই লিপি পড়তে পারেনি। ফিরোজ শুনেছিলেন যে, স্তম্ভগুলির কোনো যাদুকরী প্রভাব আছে এবং কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্তম্ভগুলির যোগ আছে। পৌত্তলিকদের পূজার কোনো জিনিসে ফিরোজের যদি অতই ঘৃণা থাকবে, তাহলে তাঁর পক্ষে স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলাই স্বাভাবিক ছিল। তার বদলে তিনি স্তম্ভগুলি দর্শনীয় বস্তু হিসেবে স্থাপন করেছিলেন।

১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গোল দলপতি তৈমুরের নেতৃত্বে ভারতের ওপর ভয়ংকরতম মঙ্গোল আক্রমণ ঘটল। তৈমুর ছিলেন মধ্য-এশিয়ার তুর্কী। তাঁর বক্তব্য ছিল, তুঘলকরা যথেষ্ট খাঁটি মুসলমান নয় এবং সেজন্য তাঁদের শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। এই আক্রমণের সুযোগে গুজরাট, মালোয়া ও জৌনপুর স্বাধীনতা ঘোষণা করল। দিল্লী আক্রমণ সমাধা করে তৈমুর পাঞ্জাব শাসনের জন্যে এক প্রতিনিধি রেখে মধ্য-এশিয়ায়

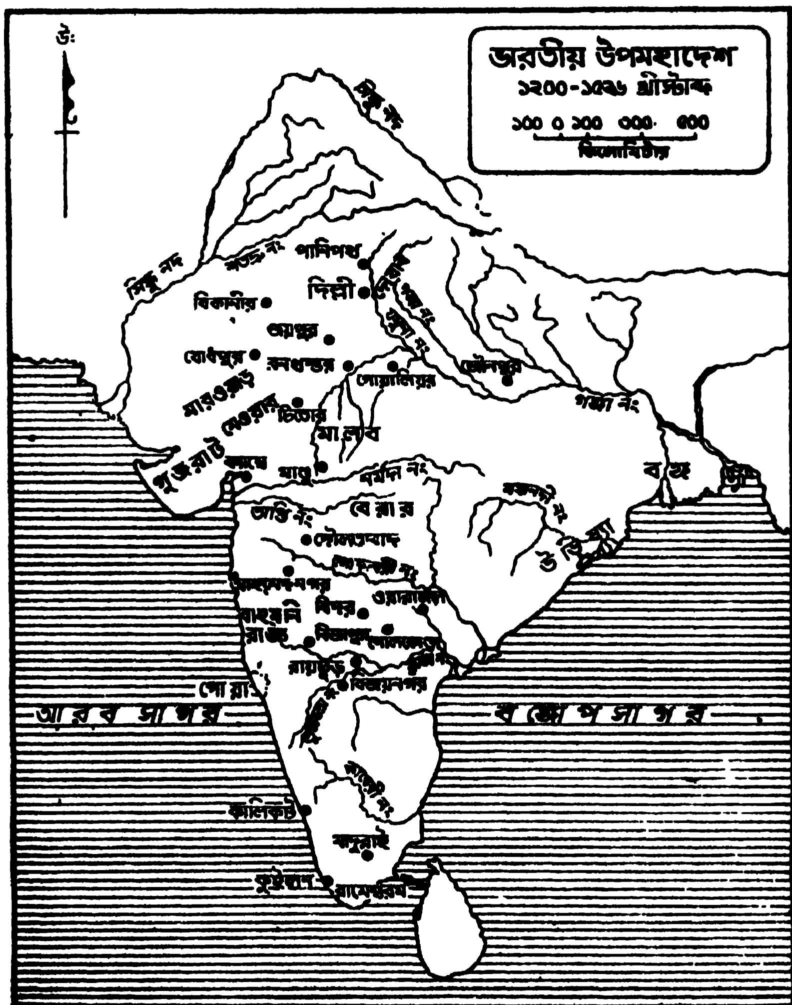
প্রস্থান করলেন। এর অল্পদিন পরেই তুঘলক বংশের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সুলতানী চলতেই থাকল। যদিও আগের গৌরব আর ফিরে এলো না। তৈমুরের প্রতিনিধি দিল্লী দখল করে নিজেকেই সুলতান ঘোষণা করলেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের সূচনা হল এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বংশই রাজ্যশাসন করল। সুলতানী কোনোমতে টিকে গেল।

সৈয়দরা শাসনব্যবস্থা কাজচলা গোছের করে ততদিন চালালেন যতদিন না কোনো প্রবলতর বংশ রাজ্যের ভার নিতে পারল। উত্তর অঞ্চলের এক প্রদেশের শাসনকর্তা বাহলুল লোদী সুযোগ বুঝে সৈয়দদের সরিয়ে দিয়ে নিজেই ১৪৫১ সালে দিল্লীর মসনদ দখল করলেন। লোদীরা ছিল খাঁটি আফগান। অর্থাৎ, এবার তুর্কী ওমরাহদের প্রভাব কমে গেল।

তুর্কীদের তুলনায় আফগানরা বেশি স্বাধীনচেতা ছিল এবং নিজেদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। আফগানরাই ছিল লোদী রাজাদের প্রধান খুঁটি এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে বহু ইক্‌তা বিলি করা হয়েছিল। প্রথম দুই লোদী রাজা সুলতানীর স্বৈরাচারী কর্তৃত্বকে কিছুটা খর্ব করেছিলেন এবং এই-ভাবেই আফগান ওমরাহদের আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়ে আনলেন এবং আফগানদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করলেন না। ফলে, আফগান ওমরাহরা সুলতানের শত্রু হয়ে উঠতে শুরু করল। কেউ কেউ অসন্তোষ মনেই গোপন রাখল, আবার অন্যেরা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করল। ইব্রাহিমের বিরো-ধিতা করার উদ্দেশ্যে আফগানরা নিজেদের বিরোধ সাময়িকভাবে চাপা দিল। শেষ পর্যন্ত বিদেশী শক্তির সাহায্যে ইব্রাহিমকে গদিচ্যুত করে তারা সুলতানী ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের বিশেষ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করল। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তারা বাবরের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করল। বাবর ছিলের তৈমুর চেঙ্গিস খানের বংশধর। তিনি তখন আফগানিস্তানে ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত। বাবর পাঞ্জাব অধিকার করতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই অনুরোধ পেয়ে তখুনি সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তর-ভারতের দিকে যাত্রা করলেন। আফগানরা ছাড়া বাবর একজন রাজপুত রাজারও সমর্থন পেয়েছিলেন। ওই রাজার আশা ছিল, বাবরের সাহায্যে তিনিই দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের সমভূমিতে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিমের যুদ্ধ হল। ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হলেন এবং লোদী বংশেরও অবসান হল। বাবর নতুন রাজবংশ স্থাপন করলেন এবং তার উত্তরাধিকারী মোগলরা অবশেষে দিল্লীর সুলতানদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছিলেন।

সুলতানদের পতনের পর অবধারিতভাবেই প্রদেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করেছিল। মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত কোনো কোনো প্রদেশ দিল্লীর অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের ভাগ্য সুলতানীর সঙ্গে বাঁধা এবং

তারা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। সুলতানীর সীমানার পাশে ছোট বড় অনেক রাজ্য গঠিত হল এবং তাদেরও একই রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। এদের মধ্যে ছিল গুজরাট, মালোয়া, মেবার, মাড়োয়ার, জৌনপুর এবং বাংলাদেশ। এরা সুলতানী আমলের শেষদিকেই স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। সুলতানরা এদের বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ যখন চলত না, তখন এরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ করত। যুদ্ধ বা মিত্রতার মধ্যে কোনো ধর্মীয় জোটবন্দী ছিল না। হিন্দুরাজারা মুসলিম রাজাদের সাহায্যে অন্য হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। মুসলিম রাজাদের ক্ষেত্রেও



তাই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ধর্মের কোনো স্থান ছিল না। সেরকম সুযোগ থাকলে অবশ্য তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হতো।

ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলির উত্থান ও পতনও ঘটেছিল দ্রুততর। ভূমিদানের সুযোগে লাভবান ভূস্বামীরাই প্রধানত এইসব ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই যুগে ছিল সুবিধাবাদের যুগ এবং মিত্রতাচুক্তিরও প্রকৃত কোনো মূল্য ছিল না। আবার সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখলে এইযুগে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত হতে শুরু করেছিল—এইসব রাজনৈতিকভাবে অশান্ত অঞ্চলগুলিতেই। এখানে তুর্কী বা আফগান ওমরাহদের পক্ষে, বিশেষ করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল না। বরং বিদেশী শাসকদের পক্ষে শাসিতদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই ভালো ছিল, কেননা সেভাবেই শাসিতের বেশি আনুগত্য আদায় সম্ভব ছিল।

সুলতানের বিরুদ্ধে গুজরাটের শাসকের বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের জন্ম। আহমেদ শাহের এই রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঘোরী বংশের একজন লোক ১৪০১ খ্রীস্টাব্দে মালোয়া রাজ্য স্থপন করে। এই রাজ্য ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে হুশাঙ শাহের (১৪০৫-১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দ) আমলে। তিনি বিন্ধ্য পর্বতমালার মাণ্ডুতে একটি দুর্গে তাঁর রাজধানী নিয়ে যান। সমস্ত পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে গুজরাট ও মালোয়া ক্রমাগত বিবাদে লিপ্ত ছিল। রাজপুতদের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও মালোয়া শেষপর্যন্ত গুজরাটের কাছে পরাজিত হয়।

ইতিমধ্যে গুজরাট আরেক বিপদের সম্মুখীন হল। সমুদ্রপথে পশ্চিমদিক থেকে পর্তুগীজরা এসে উপস্থিত হল। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পর্তুগীজ পর্যটক ভাস্কো-ডা-গামা এসেছিলেন। পর্তুগীজরা ব্যবসাকেন্দ্র ও ছোট উপনিবেশ স্থাপন করতে চাইছিল। আরো বোঝা গেল, এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে পর্তুগীজরা প্রয়োজন হলে লড়াইয়ের জন্যেও তৈরি। আগেকার আরব ব্যবসায়ীরা কিন্তু ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আগ্রহী ছিল না। পর্তুগীজদের লক্ষ্য ছিল গুজরাটের দুই সমৃদ্ধ বন্দর ব্রোচ ও ক্যাম্বে। আলোচনা চলার সময়েই পর্তুগীজরা গুজরাটের শেষ রাজাকে হত্যা করেছিল। তারপর ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে মুঘলরা গুজরাট অধিকার করে নেয়। এর আগে গুজরাট মিশরীয় নৌবাহিনীর সাহায্য চেয়েছিল পর্তুগীজদের দমন করার জন্যে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরের গোলযোগে এত বেশি জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, উপকূল অঞ্চল রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এইযুগের রাজপুত শাসকরা ছিলেন অধিকাংশই ছোট ছোট গোষ্ঠীর দলপতি। সুলতানরা কোনো কোনো রাজপুত শাসিত অঞ্চল দখল করে নেন এবং রাজপুত শাসকরা সামন্তরাজা হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। কেবল দুটি রাজপুত রাজ্যই নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল—মেবার ও মাড়োয়ার। এদের উচ্চাকাংক্ষা ছিল দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার। আধুনিক কালে এই শাসকরা উদয়পুর ও যোধপুরের রাজা হিসেবে বেশি পরিচিত।

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন যখন চিতোর দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, গুহিলা

বংশভূক্ত হামীর নামে এক রাজপুত দুর্গ থেকে পালিয়ে যান। এরপর তিনি আরাবল্লী পর্বতমালা অঞ্চলে সুলতানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করে দেন। হামীর চিতোরদুর্গ পুনরুদ্ধার করেন এবং মেবার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হামীরের জয়লাভে সুলতানের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং একে একে আরো রাজপুত রাজ্য স্হাপনের সূচনা হয়। রাঠোর বংশীয় রাওয়াল-এর চেষ্টায় মাড়োয়ার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। ইনি নিজেকে কনৌজের গাহড়বাল বংশজাত বলে দাবি করতেন। মাড়োয়ার ছিল মেবারের পশ্চিমদিকে এবং বর্তমানের যোধপুর শহর অঞ্চলে। রাওয়ালের প্রপৌত্র যোধা যোধপুর শহরটি নির্মাণ করেন। মেবার রাজ্যে রৌপ্য ও সীসার খনি আবিষ্কৃত হবার পর রাজ্যে নতুন সমৃদ্ধি এলো। মনে হল, এবার রাজপুতরা উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে আবার বৃহৎ শক্তির ভূমিকা নেবে। দুই রাজ্যের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার জন্যে দুই রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপিত হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক জটিল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠল।

তখন মেবারের শাসক ছিলেন স্বনামধন্য রাণা কুম্ভ। তাঁর জন্যে এই দ্বন্দ্বে মেবারের জয় হল। রাণা একাধারে ছিলেন—নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, সঙ্গীত-প্রেমিক এবং দুর্গ নির্মাণে দক্ষ। কুম্ভ জয়দেবের গীতগোবিন্দের ওপর যে টীকা রচনা করে গেছেন, তা শ্রেষ্ঠ টীকাগুলির অন্যতম। তাঁর শেষজীবন অবশ্য সুখের হয়নি। তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে ও তাঁর পুত্র তাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু এখানেই মেবারের গৌরবের দিন শেষ নয়। এরপর আবার একসময় উত্তর-ভারতে রাজপুত আধিপত্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে রাণাসঙ্গ মেবারের রাজা হন এবং দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করতে শুরু করেন। তখন দিল্লীর লোদী সুলতানরা নিজেদের সমস্যা নিয়েই এত বিব্রত ছিলেন যে, মেবার নিয়ে চিন্তা করার অবসর ছিল না। এরপর রাণাসঙ্গ দিল্লী আক্রমণের পরিকল্পা করলেন। বাবরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল যে, সঙ্গ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে দিল্লী আক্রমণ করবেন এবং বাবর আক্রমণ চালাবেন উত্তরদিক থেকে। রাণা ভাবলেন, এই ভাবেই তিনি দিল্লী দখল করে নেবেন। তারপর বাবরকে বিদায় করে নিজেই দিল্লীর সিংহাসনে বসে যাবেন। কিন্তু গুজরাটে গণ্ডগোলের ফলে রাণা তাঁর চুক্তিমতো যুদ্ধযাত্রা করতে পারলেন না। এদিকে পানিপথের যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করলেন। এবার রাণা বুঝলেন যে, বাবর নিজেই দিল্লীর সিংহাসন দখলে আগ্রহী। দুজনের চুক্তি ভেঙে গেল এবং ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে সঙ্গ বাবরকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধে রাণার পরাজয় হল এবং এরপর মেবার ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হল।

এর কয়েক বছর আগেই মাড়োয়ার রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হতে শুরু করেছিল। রাজপরিবারের বিভিন্ন রাজকুমাররা সংলগ্ন অঞ্চলে গিয়ে সাত্তালমীর, বিকানীর ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করলেন। এসব রাজ্যের কিছু কিছু আবার বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিঁকে ছিল। রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে গোষ্ঠী সচেতনতা ছিল খুব

বেশি। শাসকরা এক গোষ্ঠীভুক্ত হলে আনুগত্য অটল থাকত। কিন্তু শাসক অন্য গোষ্ঠীভুক্ত হলেই অবধারিতভাবে ভাঙন দেখা দিত। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থাকায় পার্থক্য দেখা দিত সহজেই। তবে এইযুগে রাজপুতদের যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তার পরিবর্তন হয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে জৌনপুরে শারকী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আগে সুলতানের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। গোড়ার দিকে জৌনপুরের অবস্থা ছিল সঙ্গীন ; একদিকে সুলতানী, অন্যদিকে বাংলাদেশ। দুই রাজ্যের সঙ্গেই জৌনপুরের সম্পর্ক ছিল খুব অনিশ্চিত। সুলতানী যখন হৃতশক্তি, শারকী রাজারা প্রায়ই দিল্লী জয়ের পরিকল্পনা করতেন। কিন্তু পরিকল্পনা কখনো কাজে রূপায়িত হয়নি। শারকী রাজারা ক্রমাগত লোদী সুলতানদের উত্যক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত সুলতানের হাতে শারকী রাজার পরাজয় হয় এবং তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে যান। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ দিল্লীর সঙ্গে দূরত্বের সুযোগে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছিল। দিল্লী এবং বাংলাদেশের পথ সুগম ছিল না। মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি সুলতানের কর্মচারীদের প্রতি সবসময় অনুকূল মনোভাবাপন্ন হতো না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্থানীয় প্রদেশ শাসকের বিদ্রোহের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সুলতানরা বারবার নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন, না পারলে অন্তত বাংলাদেশের সীমানা বৃদ্ধিতে বাধা দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এতে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতেন না। বাংলাদেশের সুলতানদের বংশধারায় ছেদ পড়ল, যখন উত্তরবঙ্গের জমিদার রাজা গণেশ দরবারের প্রভাবশালী মন্ত্রী হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। গণেশের পুত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পিতার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ১৪১৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান হয়ে বসলেন। তিনি ১৬ বছর রাজ্যশাসন করেন। শাসনকালের ব্যাপ্তি দেখে মনে হয় যে, রাজ্যের মুসলমান ওমরাহরা তাঁর পক্ষেই ছিলেন। ইনি তাঁর মন্ত্রীসভায় ব্রাহ্মণ নিয়োগ করেছিলেন এবং রাজসভায় একজন পুরোহিতও ছিল। মনে হয়, ইসলামধর্ম গ্রহণ করা নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোনো অসন্তোষ ছিল না। তা থাকলে কোনো ধর্মত্যাগীর অধীনে ব্রাহ্মণরা কাজ করত না।

এইযুগের বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে চীনদেশের মিঙ্ সম্রাটদের ঐতিহাসিক বিবরণীতে। চীন সম্রাটরা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদল পাঠাতেন ভারতের নানা অঞ্চলে। ওই বিবরণী অনুসারে পর্যটক চোঙ্-হো ১৪২১ ও ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দে দুবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলাদেশে নানাধরনের শাসকের আবির্ভাব হয়েছিল। একবার আবিসিনীয় প্রাসাদরক্ষীর দল বিদ্রোহ করে ও তাদের সেনানায়ক সিংহাসন দখল করে নেয়। আবিসিনীয়দের হাত থেকে আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চল কেড়ে নিল আরব বংশোদ্ভূত এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পর তাঁর সমর্থক আফগানরা পূর্বদিকে পালিয়ে আসে। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে এক আফগান ওমরাহ শেরখান বাংলা-

দেশের সুলতানকে পরাস্ত করে এখানকার শাসক হয়ে বসলেন।

কাশ্মীর রাজ্য কখনো সুলতানীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হবার আগে পর্যন্ত দিল্লীর সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ ছিল সামান্যই। সিন্ধুও মোটামুটিভাবে স্বাধীনই ছিল। থর মরুভূমির জন্যে রাজস্থানের সঙ্গেও দিল্লীর নিয়মিত সংযোগ ছিল না। আরবরা অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু জয় করে নেয়। কিন্তু এরপর নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে তারা ভারতে নতুন অঞ্চল জয় করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। সুলতানী আমলের সময়ে সিন্ধু শাসন করত উপজাতিরা। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা সিন্ধু জয় করে নেয়।

এই সময়ে ভারতবর্ষে অধিকাংশ অঞ্চল তুর্কী ও আফগান বংশের শাসকদের শাসনাধীনে ছিল। এরা যেমন সহজে ক্ষমতাদখল করেছিল তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল কেবল দুইদল শাসকের মধ্যে ক্ষমতার হস্তান্তর। গজনীর মামুদের আক্রমণ ও পরবর্তীকালের সুলতানী প্রতিষ্ঠার মধ্যে ২০০ বছর কেটে যায়। এই দুই শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারত তুর্কী ও আফগানদের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই, শেষপর্যন্ত যখন তারা ভারতে বসবাস শুরু করল, অপরিচয়ের সমস্যা তাদের আসেনি।

উত্তর-ভারতের সুলতানীর ওমরাহদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করা। কেন্দ্রীয় সরকার এদের বশে রাখার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো নীতি অনুসরণ করেনি। রাজবংশের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কোনোরকম রাজনৈতিক স্থায়িত্বের বালাই ছিল না।

দ্রুত রাজবংশ বদলের প্রভাব পড়ত সমাজের উচ্চশ্রেণীর ওপর এবং তারা এ নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করত। রাজনীতি ও শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বড় পরিবর্তন দেখা যেত না। অনেক সময়েই স্থানীয় দলপতি ও শাসকের কোনো বদল হতো না। ভূমিব্যবস্থাও মূলত অপরিবর্তিতই থাকত, যদিও তাদের আয় হয়তো কমে যেত। চাষীরা আগের মতোই চাষ করে, হয় রাজকর্মচারীদের হাতে, নয় স্থানীয় ভূস্বামীর কাছে রাজস্ব জমা দিত। সুলতান বদল নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হতো না। হুণদের আক্রমণের সময় স্থানীয় অধিবাসীদের যেমন দলে দলে অন্য বাসস্থানের জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল, এসময়ে তেমন ঘটেনি। তুর্কী ও আফগানদের সংখ্যাল্পতার জন্যে নিম্নপদের রাজকর্মচারীদের পরিবর্তন হতো না। যদিও একথাও সত্য যে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সভ্যতার ধারায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হয়েছিল।

১৩

সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রয়াস

আনুমানিক ১২০০—১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ

উত্তর-ভারতে বিদেশী আক্রমণ বারবার ঘটেছে। আমরা দেখেছি কিভাবে গ্রীক, সিথিয়ান, পার্থিয়ান ও হূণরা উত্তর-ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু বৎসর ধরে ক্ষমতা অধিকার করেছিল। বিদেশী হিসেবে শাসন করতে এলেও শেষ পর্যন্ত তারা ভারতীয়দের মধ্যে মিলে গেল। যতদিন পর্যন্ত এদেশের সমাজের মধ্যে ম্লেচ্ছদের অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব ছিল. বিদেশীরা যে বিধর্মী তা অনায়াসে ভুলে যাওয়া যেত। একথাও সত্য যে, বিদেশীরা ভারতের যেসব অঞ্চলে বসবাস শুরু করল, সেখানে গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল না। তাই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে বিদেশীদের প্রবেশ করতে অসুবিধে হয়নি। প্রাচীনপন্থীরা আগন্তুকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার তেমন কোনো চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধরা বরং তাদের মধ্যে অনেককেই ধর্মান্তর গ্রহণ করানোতে সফল হয়।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, গ্রীক, সিথিয়ান ও হূণরা তাদের সঙ্গে নিজেদের কোনো ধর্মতত্ত্ববিদকে নিয়ে না আসায় হিন্দু ও বিদেশী ধর্মের মধ্যে কোনো সংঘাত উপস্থিত হয়নি। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর এই সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো। ইসলামের সঙ্গে এলো এক নতুন জীবনধারা। আগেকার বিদেশীদের প্রভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের যেটুকু পরিবর্তন হয়েছিল তা দুই ধর্মের বিধানদাতারা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে তা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণের কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। বাহ্যিকভাবে দেখতে গেলে তুর্কীরা স্থানীয় খাদ্য ও পোশাক গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ইসলামের কোনো কোনো সামাজিক চিন্তা ভারতীয় জীবনের অংশ হয়ে যাওয়া।

পরোক্ষভাবে দেখতে গেলে, একদিক দিয়ে এ ব্যাপারে মঙ্গোলদের দান আছে। তারা আফগানিস্তান ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ব্যাপকহারে জনগণের ভারতবর্ষে আসার সম্ভাবনা বন্ধ করে দেয়। সমুদ্রপথে প্রতি বছর অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ীই আসত এবং তারা পশ্চিম উপকূলের বন্দর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করত। এইসব কারণে ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই ইসলামের প্রধান ভরসা হয়ে উঠল। কিন্তু ধর্মান্তরকরণ চলছিল খুব ধীর গতিতে। মুসলমানরা ভারতবর্ষে সবসময়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, অধিকাংশ হিন্দুই এমন কিছু দুরবস্থার মধ্যে বাস করত না যার জন্যে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের পক্ষেও ইসলামধর্ম গ্রহণের ফলে তেমন কিছু সুযোগ-সুবিধে হয়নি। মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষই প্রাক্তন হিন্দু হওয়ার ফলে দেশের মূল জনসমাজের জীবনধারণের পদ্ধতির সঙ্গে মুসলিমদের তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি।

এইভাবে অঙ্গীভূতকরণ সহজ হয়ে গিয়েছিল। দুইদল কারিগর যদি বহু বছর ধরে একই সমবায় সংঘ বা একই উপবর্ণের অঙ্গ হিসেবে পাশাপাশি থেকে একই কাজ করে, তবে তাদের মধ্যে একদল ধর্মান্তরিত হলেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। তবে, শাসকশ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে দুইধর্মের মিলন সম্পর্কে এত সহজে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। উভয় ধর্মের বিধান প্রস্তুতকারীরা এবং কখনো কখনো রাজনীতিকরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ জীইয়ে রাখতে আগ্রহী ছিলেন কারণ ধর্মের নামে তাদের একত্র করা সহজ ছিল, এবং ধর্মীয় আনুগত্যকে দরকার মতো ধর্মছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেত।

হিন্দু তাত্ত্বিকরা বোঝেন নি যে, রাজনৈতিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানদের একীকরণের একটা সচেতন চেষ্টা থাকা উচিত। সমাজে যেন কোনো বিধর্মীয় প্রভাব না পড়ে, তাঁদের সেইদিকেই কেবল দৃষ্টি ছিল। সমাজকে এঁরা রাজনৈতিক কাজকর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সুলতানী আমলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি আগের যুগের চেয়ে এমন কিছু পৃথকও ছিল না। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী এইসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একেবারে খাঁটি ইসলামী আখ্যা দেওয়া অসম্ভব ছিল। যেমন, দৈবশক্তির সঙ্গে রাজার কোনো সম্পর্কের কথা কোরাণে বলা হয়নি। কিন্তু পারস্যের স্যাসানীয় রাজাদের কাছ থেকে তুর্কীরা এই ধারণাটা পেয়েছিল। ভারতে এসেও তারা একই ধারণা দেখতে পেল। এরপর কেবল ধর্মতাত্ত্বিকদের সম্মতি নিয়ে রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস নিজেদের রাজনৈতিক ধারণার অন্তর্ভুক্ত করে নিল।

মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের বলা হয় 'উলেমা'। এঁরা সুলতানের সুবিধার্থে কোরাণের উদ্ধৃতির সাহায্যে এইসব নতুন ধারণায় সায় দিতেন। শর্ত থাকত যে, রাজ্যের ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে উলেমাদের মতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ধর্ম ও রাজনীতির এই মিলনের ফলে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। ক্রমশ মুসলমান আমলেও এই ধারণাই প্রচারিত হল যে, রাজ্যের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্যে সুলতান অপরিহার্য এবং তাঁর অবর্তমানে চরম বিশৃংখলা দেখা দেবে। উল্লেখযোগ্য যে, আগেকার হিন্দু ধারণাতেও রাজা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে একই কথা বলা হয়েছিল। ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও উলেমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুলতানের পক্ষে আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ালো। ফলে, সুলতানরা উলেমাদের ভূমিদান করতেন, মসজিদ নির্মাণ করতেন এবং উলেমাদের সন্তুষ্টির জন্যে মাঝে মাঝে হিন্দুদের দেবমূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করে বিধর্মবিরোধী মনোভাব দেখাতেন। তবে, সব সুলতানই সমান সুযোগ-সুবিধা দিতেন না এবং সেসব ক্ষেত্রে উলেমাদের খুব বিচার-বিবেচনা করে কাজ করতে হতো। কেননা, বিধর্মীদের দেশে নিজেদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া বাইরে প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। সুলতানরা সাধারণত রাজনীতি বা ধর্মনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামরিক ভাগ্যান্বেষী। বিলাসব্যসনের মধ্যে যত বেশিদিন সম্ভব রাজত্ব করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রাজদরবারে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও লেখকরা সমাদর পেতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা খুব গভীরভাবে ওসব নিয়ে চর্চা

করুন, এটাও সুলতানরা পছন্দ করতেন না। বরনি অভিযোগ করেছেন যে. সুলতানরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতেন না। সুলতানরা তো ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি, সেজন্যে তাঁদের কর্তব্যও মহান। এইকথা বলার অপরাধে বরনিকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এইসব অভিযোগ উলেমাদের কাছ থেকেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁরা কখনো এসব ব্যাপারে মুখ খুলতেন না।

সুলতানের রাজদরবার ছিল ধনসম্পদের রীতিমতো প্রদর্শনী। প্রতিদিন আচার-অনুষ্ঠান নিয়মকানুন অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে পালন করা হতো। এত জাঁকজমক ও অনুষ্ঠানের আতিশয্য ছিল প্রধানত শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্যটা প্রকট করে দেখাবার উদ্দেশ্যে। খাসজমি থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো, তা খরচ হতো হারেম, দাস, প্রাসাদ ও দরবারের কর্মচারীর জন্যে। প্রাসাদে সুলতানের নিজস্ব দেহরক্ষীদল থাকত, যাতে বাইরের কেউ হঠাৎ সুলতানকে হত্যা করতে না পারে। রাজকীয় কারখানায় সুলতানের নিজস্ব জিনিসপত্র ও উপহার সামগ্রী তৈরি হতো। সুলতান তাঁর কর্মচারীদের কর্মকুশলতার জন্যে যে বিশেষ সম্মানবস্ত্র উপহার দিতেন, সেরকম কয়েক হাজার পোশাক প্রতিবছর এই কারখানাতেই তৈরি হতো।

মূল ইসলামী আইন শরিয়ত ব্যাখ্যা করতেন উলেমারা এবং সুলতানরা তাই মেনে চলতেন। প্রধান কাজীর পরামর্শ নিয়ে সুলতান প্রধান বিচারপতির ভূমিকা নিতেন। মৃত্যুদণ্ড দিতে হলে সুলতানের অনুমতি প্রয়োজন হতো। নতুন আইন প্রবর্তনের সময় তা প্রথমে রাজধানী ও মুসলমান প্রধান শহরেই প্রয়োগ করা হতো। গ্রামাঞ্চলে পুরণো আইন চলত। অ-মুসলমানরা তাদের নিজস্ব আইন বজায় রাখতে পারত। এর ফলে নানারকম আইন সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে, রাষ্ট্রের বিপদের কারণ না হলে অ-মুসলনমানরা নিজস্ব আইন মেনে চলতে পারবে। আইনের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ছিল না বলে প্রয়োজন অনুসারে আইনের ব্যাখ্যা অদল-বদল হতে পারত। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের সতী হওয়া নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল। শরিয়া অনুসারে আত্মহত্যা ছিল বে-আইনী এবং সতী হওয়ার অর্থই আত্মহত্যা করা। কিন্তু হিন্দুনারীর ক্ষেত্রে এই প্রথা মেনে নেওয়া হয়েছিল।

আইন অনুযায়ী সুলতান ছিলেন খলিফার প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু সুলতানের পক্ষে একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইসলামের নাম করেই আনুগত্য লাভ করতে হতো। এই কারণে তাঁকে অন্তত প্রকাশ্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও শরিয়ার অনুশাসন মেনে চলতে হতো। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর যে তাঁর নিজস্ব ধর্মমত 'দীন ইলাহী' প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তা দেখে মনে হয় যে, ততদিন রাজনীতির ওপর ধর্মের প্রভাব কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। উলেমা, ওমরাহ ও স্থায়ী সেনা-বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখা প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল। এছাড়া কোনো কোনো সময়ে দ্রুত সুলতান বদল থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা সর্বশক্তিমান ছিলেন না।

সেনাবাহিনীর মধ্যে তুর্কী, আফগান, মঙ্গোল, পারসী ও ভারতীয় সৈনিক ছিল। প্রত্যেক ইকৃতাদারের পক্ষে সৈন্য জোগানো আবশ্যকীয় ছিল বলে মনে হয় যে,

সেনাবাহিনীতে ভারতীয়রাই সংখ্যাগুরু ছিল। হিন্দু সৈনিক গ্রহণে কোনো নিষেধ ছিল না। সেনাবাহিনী মঙ্গোলদের রীতি অনুযায়ী ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১ হাজার জন সৈনিকের ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকত।

অসামরিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ছিলেন উজীর বা প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাজস্ব আদায়, জমাখরচের হিসেব ও অর্থব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করতেন। রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য ব্যাপারে সুলতান তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিনা তা সুলতান ও উজীরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করত। উজীর এবং আরো ৩জন মন্ত্রীকে রাজ্যের স্তম্ভ বলে ধরা হতো। অন্যান্য মন্ত্রীরা কেউ ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান। তাঁর কাজ ছিল সেনাবাহিনীর সৈনিক ও অস্ত্রের হিসেব রাখা। আরেকজন মন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল দরবারের সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের যোগাযোগ বজায় রাখা ; এঁর অধীনে কিছু লোক ছিল, যারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁকে সবরকম খবরাখবর সরবরাহ করত।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার দুটি উপায় ছিল। রাজধানীর কাছাকাছি প্রদেশ হলে সোজাসুজি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ, তা না হলে কেন্দ্র থেকে পাঠানো প্রতিনিধির প্রদেশে উপস্থিতি। এছাড়াও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ক্ষমতার পরিমাণ নির্ভর করত। দরবারের বিভিন্ন শাসনবিভাগীয় দপ্তরগুলির শাখাদপ্তর থাকত প্রদেশগুলিতে। প্রদেশের মধ্যে আরো ছোট শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ছিল 'পরগণা'। এই পরগণাতেই সরকারী কর্মচারীরা কৃষকদের সংস্পর্শে আসত। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে ছিল—প্রধান শাসক, রাজস্ব হিসাব ও আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, হিসাবরক্ষক এবং ২জন নথিলেখক। নথি পারসী ও হিন্দী ভাষায় লেখা হতো। খাজনার হিসেব ও আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলা হতো 'মুনসেফ'। ভূমি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব ছিল মুনসেফের ওপর। এর সঙ্গে মৌর্য আমলের রাজুকদের তুলনা করা চলে। শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক ছিল গ্রাম। গ্রামের জন্যে ৩জন কর্মচারী ছিল—গ্রামপ্রধান, হিসাবরক্ষক বা 'পাটোয়ারী', ও নথিলেখক বা 'চৌধুরী'। শহরগুলি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক অঞ্চল শাসন করত ২জন রাজকর্মচারী। তারা আবার শহরের প্রধান প্রশাসকের অধীনস্থ ছিল।

অর্থাৎ, সুলতানী আমলের অসামরিক শাসনব্যবস্থা ছিল আগের শাসনব্যবস্থারই অনুসরণ। কোথাও কোনো মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টা হয়নি, কেবল কর্মচারীদের পদের নাম পাল্টে নিয়েছিল। গ্রাম ও পরগণার অধিকাংশ কর্মচারীই ছিল হিন্দু। এইসব কর্মচারীরা সাধারণত বংশানুক্রমেই এই কাজ করে আসছিল। সুলতানী যুগের শাসনরীতি এবং কর্মচারীদের পদের নাম আধুনিক যুগেও কিছু কিছু বজায় আছে।

শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভরশীল ছিল যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর। ইবন বতুতা, তুঘলকী আমলের যাতায়াত ব্যবস্থা ও ডাকবিভাগের কর্মকুশলতার উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। তিনি নিয়মিত এইসব রাস্তা দিয়ে নিজেও আসাযাওয়া

করেছেন। রাস্তা সাধারণত পাথর দিয়ে তৈরী হতো। ষাঁড়ে-টানা গাড়িই ছিল বেশি। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করত। দ্রুত ভ্রমণের প্রয়োজন না থাকলে পালকির ব্যবহার হতো। রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে সরাইখানা ছিল। তাছাড়া সেখানে দোকান, কুলি ও বদলি ঘোড়ারও ব্যবস্থা ছিল। ডাক বিলির জন্যে ঘোড়ার ব্যবহার হতো, আবার পায়ে হেঁটেও ডাকহরকরা চিঠিপত্র নিয়ে যেত। প্রায় সমস্ত গ্রামেই ঘোড়া বা ডাকহরকরা বদল হতো। তবে ডাক-ব্যবস্থার খরচ কম ছিল না। রাজদরবারের লোকেরা ও সম্পন্ন লোকেরাই ডাকে চিঠি পাঠাতো। ডাকহরকরার হাতে একটি ঘণ্টা লাগানো লাঠি থাকত। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ঘণ্টার শব্দে জন্তু-জানোয়ার দূরে সরে যেত। আবার, ঘণ্টা শব্দ শুনেই গ্রামের লোক রাণার বা ডাকহরকরার আগমন বুঝতে পারত। গত শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে ডাকহরকরার ব্যবস্থা চালু ছিল।

বিদেশী তুর্কী আফগানরা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বসবাস শুরু করায় শহর-সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। গ্রামাঞ্চল কিছুটা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারত। অবশ্য তাদের রাজস্ব দিতে হতো নিয়মিত। গ্রামই ছিল প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র এবং গ্রামের উৎপাদনে সাধারণত স্থানীয় প্রয়োজন মেটানো হতো। প্রতি গ্রামের নিজস্ব শিল্পী ও কারিগররা কাপড় বুনত, হাল ও জোয়াল তৈরী করত, গরুর গাড়ির চাকা তৈরী করত এবং দাঁড়, বাসনপত্র, ঝুড়ি, ঘোড়ার নাল, ছুরি, ছোরা, তরোয়াল ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই তৈরী করত। নির্মাণ পদ্ধতি খুব সাবেকী ধরনের হলেও স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। কারিগররা একেকটি পেশা অনুসারে নানাবর্ণে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে যারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হল, তাদের মধ্যেও বর্ণপ্রথা বজায় রইল। মনে হয়, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তখনো মুসলমানদের আরেকটি উপবর্ণ হিসেবেই গণ্য করত। কিন্তু শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য হওয়ায় ক্রমশ মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মনোভাব আরো সহনশীল হয়ে উঠল। কারিগররা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বংশানুক্রমে একই কারিগরি বিদ্যার চর্চা করত।

কিন্তু ক্রমশ একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। শহরগুলি আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে শুরু করল। শহরের জন্যে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ল। তুর্কী আফগান আক্রমণের পর উত্তর-ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হল। মঙ্গোলদের মাধ্যমে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে বিনষ্ট সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হল। সুলতানের সেনাবাহিনী যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিল—ব্যবসায়ীরা সেই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল। অভিজাত শ্রেণীর উচ্চমানের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় শুরু হল। নিকটবর্তী শহরের প্রয়োজন অনুসারে গ্রামগুলি তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে দিল। উপকূলবর্তী অঞ্চলে আগে থেকেই বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন হচ্ছিল, পণ্য বিনিময়ের জন্যে উৎপাদন বৃদ্ধি খুব আকস্মিকভাবে ঘটেনি, তবে আগেকার যুগের তুলনায় এখন উৎপাদন যথেষ্ট বেশি দেখা যায়।

শহরের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে শহরেও কারিগররা এসে কাজ শুরু করল।

সেসব অঞ্চলে রপ্তানির জন্যে বিশেষ পণ্য উৎপাদন হতো, সেখানে নির্মাণ কৌশল উচ্চশ্রেণীর ছিল। গুজরাট ও বাংলাদেশের শহরগুলিতে নানারকম বস্ত্র উৎপাদন হতো। যেমন—শুভ্র সুতীবস্ত্র, রেশম, মখমল, সাটিন, তুলোভরা কাপড় ইত্যাদি। ক্যাম্বে অঞ্চলের বস্ত্রের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল, সেগুলির উচ্চমান ও নিম্নমূল্যের জন্যে। শহরগুলি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল। দরবারের প্রয়োজনে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেল। দরবারের অনুকরণে প্রদেশগুলিতেও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ওই ধরনের বিলাসদ্রব্য ব্যবহার শুরু করল।

প্রত্যেক শহরেই একটি বড়বাজার ছিল যেখানে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এসে জমা হতো। এখানে নিয়মিত মেলা বসত। কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠী ব্যবসায়ের জন্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করল। যেমন, গুজরাটী বেনেরা,—যাদের সুদূর দক্ষিণের মালাবার পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। এছাড়া ছিল মুলতানী ও রাজস্থানের মাড়োয়ারীরা। এছাড়া ছিল বাঞ্জারা নামক যাযাবর ব্যবসায়ী জাতি, এরা পণ্য সামগ্রী নিয়ে নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো। অনেক সময় অন্য ব্যবসায়ীরাও এদের মাধ্যমে পণ্য পাঠাতো। যেসব বছরে ব্যবসা ভালো জমত না এদের বিরুদ্ধে ছিঁচকে চুরিরও অভিযোগ উঠত। এরা অনেকটা ইউরোপের জিপসীদের মতো ছিল। কোনো কোনো ব্যবসায়ী পশুর পিঠে মাল চাপিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে জিনিস বিক্রয় করত। এরা যদি নিজেদের শহর থেকে দূরে কোথাও যেত, পথের সরাইখানায় সাময়িকভাবে দোকান খুলত। ব্যবসায়ীদের নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সরাইখানাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল।

স্থানীয় শাসনের কেন্দ্র হিসেবে প্রাদেশিক রাজধানীগুলিও ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। শোনা যায়, বিশেষ করে দিল্লীর বাজার জমজমাট ছিল। দেশবিদেশের পণ্যসামগ্রী এখানে পাওয়া যেত। ইবন-বতুতা দিল্লীকে মুসলিম জগতের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শহর বলে বর্ণনা করেছেন। এর মূলে ব্যবসায়ীদেরও দান ছিল। অনেক রাষ্ট্রীয় কারখানা দিল্লীতেই অবস্থিত ছিল এবং এগুলিতে যথেষ্ট উৎপাদন হতো। যেমন, একটি রেশম বস্ত্রের কারখানায় প্রায় ৪ হাজার লোক কাজ করত। কিন্তু ব্যবসায়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি ছিল উপকূল অঞ্চলে। এখানে বিদেশী বণিকরাও বসবাস করত বলে শহরগুলিতে একটা আন্তর্জাতিক পরিবেশ ছিল। রপ্তানি বাণিজ্য এত লাভজনক দেখে কোনো কোনো বিদেশী স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেত। এখানকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির বৈদেশিক শাখাও ছিল। সম্পন্ন মহাজনরা ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিত এবং অনেকে কেবল মহাজনী কারবার করেই দিন চালাতো। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নানা অনিশ্চয়তা দেখে মনে হতে পারে সেযুগের ব্যবসা অসাধুতা ও শঠতায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু বিদেশী পর্যটকদের এবং বিদেশী বণিকদের লেখা থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সততার মান ছিল খুব উন্নত।

বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারত এশিয়া ও ইউরোপের সংস্পর্শে এলো। এইযুগে

চীনারা ভারত ও পূর্ব-আফ্রিকায় বাণিজ্যের মুনাফার জন্যে প্রতিযোগিতা করছিল এবং অন্যদিকে ইউরোপীয়েরা তখন আরবদের বাদ দিয়ে সোজাসুজি এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহী। ভারত ধীরে ধীরে পূর্ব ও পশ্চিমী জগতে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ হারাচ্ছিল। ধীরে ধীরে ঘটলেও এ ঘটনা অনিবার্য ছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা কিনত। আগে ভারতীয় জাহাজে করে মশলা যেত পশ্চিম এশিয়ায়। কিন্তু এবার আরবরাই মশলা নিয়ে যাবার কাজটা হাতে নিয়ে নিল। লোকসান হল ভারতের। এই লোকসান অবশ্য কিছুটা পূরণ হল ভারতীয় কারিগরি দ্রব্যের রপ্তানির ফলে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়েই ব্যবসায়ীরা এবার বেশি মনোযোগ দিল। তুর্কী ও আফগানরা সামরিক ও শাসন-তান্ত্রিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ব্যবসার কাজে হিন্দুরাই বেশি এগিয়ে এলো। তবে বড় ব্যবসায়ী ও শাসনকর্তাদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে নিশ্চয়ই ঐক্যমত ছিল। কিছু আরব ব্যবসায়ী ভারতে বসবাস করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য লাভের খানিকটা অংশ এদেশেই থেকে যাচ্ছিল।

সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর দিয়ে ইরাকের মধ্য দিয়েও ভূমধ্যসাগরে যাওয়া যেত। অথবা লোহিতসাগর এবং মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে যাওয়া যেত। তবে, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কয়েকটি নতুন বন্দর (মালিন্দে, মোমবাসা ও কিলোয়া) গড়ে ওঠায় একটি নতুন পথ খুলে যায়। ভারতীয় জাহাজগুলি ওরমুজ, এডেন ও জিড্ডা বন্দরে মাল খালাস করত। এগুলি ছিল পশ্চিম-এশিয়ার বড়বাজার। কোনো কোনো জাহাজ সোজা পূর্ব-আফ্রিকায় গিয়ে ক্যাম্বের বস্ত্রের বিনিময়ে সোনা নিয়ে ফিরত।

ভারতে আমদানির মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিস ছিল ঘোড়া। তুর্কীস্তানে তখনো পর্যন্ত ভালো জাতের ঘোড়া পাওয়া যেত, সেগুলি প্রায় খাঁটি আরবী ঘোড়ার সমতুল্য ছিল। কিছু কিছু আরবী ঘোড়া মঙ্গোল আক্রমণের ফাঁকে ফাঁকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ দিয়েও ভারতে এসে পড়ত। কিন্তু সাধারণত জাহাজে চাপিয়েই ঘোড়া আমদানির রীতি ছিল। ঘোড়া ছাড়া, এডেন থেকে জাহাজে করে সুগন্ধি, প্রবাল, সিঁদুর, সীসা, সোনা, রূপা, পারদ, কর্পূর, ফটকিরি, একরকম লাল রঙ্ ও জাফরান আসত। গুজরাট থেকে ভারত রপ্তানি করত চাল, বস্ত্র, দামী পাথর ও নীল।

ওদিকে বাঙ্লাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য চলছিল। মালাক্কা এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন দেশীয় বণিকরা ওখানে বসবাসও করত। ভারতীয় জাহাজগুলি মালাকার বন্দরে যেত প্রায়ই এবং সেখান থেকে মরিচ, ধূপ, বস্ত্র, জাফরান ও পারদ নিয়ে আসত। এইসব জিনিস এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো জাভা, সুমাত্রা, তিমোর, বোর্ণিও ও মালাক্কা ইত্যাদি জায়গায়। ফেরার সময় জাহাজগুলি নিয়ে আসত সোনা, লবঙ্গ, শাদা চন্দন-কাঠ, জৈত্রী, জায়ফল, কর্পূর ও ঘৃতকুমারী। এর অধিকাংশই পশ্চিম উপকূলে পাঠানো হতো। তবে বাঙ্লাদেশেও কিছু কিছু জিনিস আসত।

চীনারাও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের চেষ্টা চালাচ্ছিল। পূর্ব-আফ্রিকার সঙ্গে চীনের ব্যবসা শুরু হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আরো সহজ হয়, কারণ পথেই পড়ত ভারত। চীনা জাহাজগুলি বাঙলাদেশে ও মালাবারের বন্দরে আসত। চেঙ্-লো দক্ষিণ-এশিয়া ও পূর্ব-আফ্রিকায় ৭টি বাণিজ্য অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তিনি দুবার বাঙলাদেশে থেমেছিলেন, চীনা জাহাজে থাকত চীনাংশুক, তাফতা কাপড়, সাটিন, লবঙ্গ, নীল ও শাদা চীনামাটির বাসন, সোনা ও রূপো। এর সবকিছুতেই ভারতীয় বণিকদের আগ্রহ ছিল।

বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মুদ্রার ব্যবহার বেড়ে গেল। উত্তর-ভারতের সমস্ত শহরেই মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন হল। আগেকার চৌহান ও গাহড়বাল রাজাদের মুদ্রার অনুকরণে দিল্লীর মুদ্রাগুলি তৈরী করা হল। পরিচিত মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যে লোকেরা সহজেই মুদ্রাগুলি মেনে নিতে পেরেছিল। এমনকি মুদ্রার ওপর শৈবধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ষাঁড়ের ছবি খোদিত হল। সুলতানের নামও লেখা হল দেবনাগরী লিপিতে। মুদ্রার মধ্যে 'জিতল' ও 'টঙ্কা'র কথা বেশি শোনা যায়। প্রথমটি ছিল তাম্রমুদ্রা ও দ্বিতীয়টি রৌপ্যমুদ্রা (১৭২.৮ গ্রেণ)। রূপোর টাকা প্রচলন করেন ইলতুতমিস। সুলতানী আমলে 'টঙ্কা'ই হল প্রধান মুদ্রামান এবং আধুনিক ভারতীয় টাকার উৎপত্তি এর থেকেই হয়েছে।

স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর প্রধানত ব্যবসার কাজে বা বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার হতো। সুলতানদের অনেকগুলি টাঁকশাল ছিল। প্রাদেশিক রাজ্যগুলির নিজস্ব মুদ্রা ছিল এবং সেগুলির সুলতানীর মুদ্রার চেয়ে ভিন্ন ওজন ছিল, নামও থাকত অন্য। দিল্লী অঞ্চলের প্রচলিত ওজনের মাপ (যেমন মন, সের, ছটাক) উত্তর-ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল এবং সম্প্রতি ভারতে দশমিক পদ্ধতি চালু হবার আগে পর্যন্ত ওই মাপই চলছিল। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্যে মুদ্রার প্রচলন ছড়িয়ে পড়ছিল। তার ওপর ছিল নগরগুলির ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মব্যস্ততা। তুর্কী ও আফগানরা ভারতে যে ধনসম্পদ পেয়েছিল, তা এখানেই ব্যয় করতে চাইত। রাজ-দরবার ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সচেতনভাবেই প্রচুর অর্থব্যয় করত।

ভারতীয় মুসলমান সমাজ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল—ধর্মীয় ও তার বাইরের অভিজাতশ্রেণী, কারিগর ও কৃষক। অভিজাতদের মধ্যে ছিল অনেক গোষ্ঠীর লোক— তুর্কী, আফগান, পারসী ও আরবী। এদের মধ্যে তুর্কী ও আফগানরাই ছিল প্রধান, কারণ এরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। প্রথমদিকে অভিজাত-দের মধ্যে গোষ্ঠী অনুযায়ী একটা পার্থক্য বজায় ছিল। কিন্তু, পরে এরা যখন ভারতবর্ষকেই স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হল, তখন পরস্পরের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার মধ্য দিয়ে ক্রমশ নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠল। দেশে সংখ্যা-লঘু হবার ফলে এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দেরি হয়নি।

যেকোনো লোকই অভিজাতশ্রেণীতে আসতে পারত। অভিজাত সমাজের অনেক মুসলমানই আদিতে সুলতানের বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিল। পদমর্যাদা বংশানুক্রমিক ছিল না। সুলতানের খেয়ালের ওপরই এগুলি নির্ভর করত। কিন্তু পরবর্তীকালে

যখন সরকারী পদগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে উঠল, কর্মচারীরা নিজেদের অভিজাত বংশীয় বলে দাবি করতে লাগল। এইভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানরাও নিজেদের বিদেশী বংশজাত বলে দাবি করল। এর কারণ হল, তুর্কী ও আফগানরাই ছিল প্রতিপত্তিশালী। অতএব, জাতিগত মর্যাদার একটা আলাদা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পরে ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে বিদেশীদের নিয়মিত বিয়ে হওয়া শুরু হলে জাতিগত মর্যাদার প্রশ্নটি গুরুত্ব হারায়।

অভিজাতশ্রেণীর আয়ের উৎস ছিল ইক্তার রাজস্ব। এছাড়া অনেকে ছিল উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী। সুলতানের জন্যে কিছু সংখ্যক সৈনিকের খরচ নির্বাহ করেও যতটা রাজস্ব পড়ে থাকত, তার সাহায্যে রীতিমতো বিলাসেই অভিজাতশ্রেণীর দিন কাটত। সুলতান হয়তো সন্দেহ করতেন যে, আমীর-ওমরাহরা রাজস্ব থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। কিন্তু জানলেও তাঁর কিছু করার উপায় ছিল না। রাজ-পরিদর্শকদের ওপর নির্ভর করা যেত না, কেননা তারা সহজেই উৎকোচের বশীভূত হতো। আলাউদ্দীন ওমরাহদের অতিরিক্ত অর্থোপার্জন কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার আগের অবস্থা ফিরে এলো। সুলতান ও ওমরাহদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করত তাদের নিজস্ব শক্তি সামর্থ্যের ওপর। রাজপুত গোষ্ঠীপতি ও অন্যান্য স্থানীয় শাসকদের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার পরিমাণ এইভাবেই নিরূপিত হতো। যখন দেখা যেত এদের আর অবজ্ঞা করা যাবে না, তখন ধীরে ধীরে তাদের অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত করে নেওয়া হতো।

কাজের দিক থেকে অভিজাত সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত ছিল; এদের বলা হতো অহল্-ই-সৈফ ও অহল্-ই-কলম। যাঁরা সেনানায়ক বা যাঁদের ক্ষমতা সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করত, তাঁরা ছিলেন প্রথম দলে। দ্বিতীয় দলে ছিলেন ধর্মনেতা ও শাসকেরা। দুই দলের মধ্যে যোদ্ধা ও সেনাপতিরাই বেশি শক্তিমান ছিল। দ্বিতীয় দলের মধ্যে অনেকে ছিল উলেমা। এরা কেউ কেউ ছিল বিচারপতি ও কেউ কেউ ছিল সুলতানের পরামর্শদাতা। এরা ইসলামের গোঁড়া 'সুন্নী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ এরা উদারপন্থী 'শিয়া'দের বিরোধী ছিল।

তত্ত্বগতভাবে দেখলে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদী বা সন্ত। এঁরা পার্থিব ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা সত্ত্বেও রাজনীতিতে প্রভাব-শালী হতে পারতেন। যেমন, দিল্লীর নিকটস্থ অঞ্চলের অধিবাসী নিজামুদ্দীন আউলিয়া ছিলেন প্রভাবশালী পুরুষ। সুলতান এঁর কথা অমান্য করতে পারতেন না। সুলতানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করে তিনি সুলতান সম্পর্কে তাঁর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন; তবুও সুলতান তাঁকে মেনে চলতেন। আরেকজন সন্ন্যাসী সিদি মৌলা দিল্লীর কাছে একটি ধর্মশালা চালাতেন এবং এটি পরে খল-জিদের বিরুদ্ধে তুর্কীদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সন্দেহ করা হয়, ইনি প্রকৃত-পক্ষে ভণ্ড সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষের ভক্তিকে নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন। তবে ভণ্ড হলেও ইনি যে সাধুর ছদ্মবেশে রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন, এই ঘটনা থেকেই আমরা সমসাময়িক আবহাওয়া খানিকটা বুঝতে পারি।

ভারতবর্ষে প্রাক্-ইসলাম যুগে গুরু ও সন্ন্যাসীদের ঐতিহ্যের ফলে তাঁদের তুলনীয় মুসলিম পীর ও শেখদের সমাদৃত হবার রাস্তা তৈরীই হয়েছিল। এ'রা অপেক্ষাকৃত নির্জনে বাস করতেন। সকলের ধারণা ছিল, এ'রা প্রভূত আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই, প্রয়োজন হলে এ'রা সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে রাষ্ট্রও অবহিত ছিল। সুলতান যে এইসব সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা দেখাতেন, তার মধ্যে সুলতানের একটা অনুচ্চারিত অনুরোধ থাকত যে, সন্ন্যাসী যেন তাঁর ভক্তদের সুলতানের আনুগত্য দেখানোতে উৎসাহ দেন। কোনো কোনো সন্ন্যাসী নিয়মিত বৃত্তি পেতেন এবং এই অর্থের সাহায্যে তাঁদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের জীবন নিশ্চিন্তভাবেই কেটে যেত।

শহরের মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল কারিগর। এছাড়া ব্যবসায়ীরা আসাযাওয়া করত। ব্যবসায়ীরা ছিল আরব ও পারস্যদেশীয়। তাছাড়াও ছিল সুলতানের ক্রীতদাসের দল। তারা রাজদরবারে বা রাষ্ট্রীয় কারখানায় কাজ করত। এদের সংখ্যা কম ছিল না। এই যুগের শেষদিকে মুসলমান কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দু মুসলমান কৃষকদের জীবনযাত্রার ধারা মূলত অবশ্য একই রকম ছিল।

ভারতীয় ও ইসলাম সংস্কৃতির মিলনের সবচেয়ে সুষ্ঠু প্রকাশ দেখা যায় শহরের কারিগর ও গ্রামের কৃষকদের মধ্যে। এই যুগের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তায় এই মিলনের প্রমাণ আছে। এযুগের স্থাপত্যের মধ্যেও পারস্পরিক প্রভাবের পরিচয় আছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে দুই ধর্মের পারস্পরিক প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান যেমন, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর আচারে দুই ধর্মের সামাজিক প্রথার মিলন লক্ষ্য করা যায়। কোনো হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করার পরও তার হিন্দু পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী হিসেবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারত। পবিত্র ইসলামী অনুষ্ঠানের কোনো কোনোটি হিন্দু অনুষ্ঠানের ওপর তাদের ছাপ ফেললো।

ইসলামে বর্ণপ্রথায় কোনো স্থান না থাকলেও মুসলিম সমাজজীবনে বর্ণপ্রথাকে একেবারে বাদও দেওয়া হয়নি। মুসলিম বর্ণপ্রথার ভিত্তি হল জাতিগত পার্থক্য। বিদেশী বংশোদ্ভূত যেমন, তুর্কী, আফগান বা পারস্যদেশীয় পরিবারগুলি সমাজে উচ্চতম বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত হল। এদের বলা হতো 'আশরফ' (আরবী ভাষায় এই শব্দের অর্থ হল 'সম্মানীয়'), এর পরের বর্ণ হল ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের হিন্দু। যেমন মুসলিম রাজপুত। বৃত্তিজাত বর্ণগুলিকে নিয়ে আরো দুটি শ্রেণীভেদ আছে। তাদের মধ্যে একটি হল 'পরিচ্ছন্ন' বর্ণ এবং অন্যটি হল 'অপরিচ্ছন্ন' বর্ণ। প্রথমটির মধ্যে আছে কারিগর ও অন্যান্য পেশার লোক। আর, অন্য বর্ণভুক্ত মানুষ হল ঝাড়ুদার ও মেথর শ্রেণীর লোক,—যারা নোংরা কাজ করে।* হিন্দু উপবর্ণগুলির মতো মুসলমান সমাজেও কোনো উপবর্ণভুক্ত লোক বর্ণপ্রথার ওপরদিকে উঠতে পারত, যদি ওই উপবর্ণের (জাতের) সমস্ত লোক একসঙ্গে এই উন্নতির সুযোগ পেত।

* অল্প কয়েক বছর আগে পর্যন্ত উত্তর-প্রদেশের মুসলমান সমাজের বর্ণবিভেদের কাঠামো একই রকম ছিল। এই কাঠামোর গোড়াপত্তন হয়েছিল সুলতানী আমলে।

বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একত্র আহারের বাধানিষেধ হিন্দুদের তুলনায় কম হলেও সমষ্টিভোজনের প্রথা কেবল 'পরিচ্ছন্ন' বর্ণগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিবাহের ব্যাপারে কিন্তু বর্ণপ্রথার বাইরে কেউ যেত না। প্রতিটি পেশার সঙ্গেই একটি করে উপবর্ণ স্থির করে দেওয়া হতো এবং কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে তার বাইরে বেরিয়ে আসা কঠিন ছিল। এটিই ছিল সামাজিক সম্পর্কের মূলভিত্তি। তবে মুসলমান, জৈন, সিরীয়, খ্রীস্টান এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর চেয়ে হিন্দুরাই বেশী বর্ণসচেতন ছিল।

অভিজাতদের অধিকাংশই ছিল বিদেশী বংশোদ্ভূত। তাদের পক্ষে এদেশের জনমণ্ডলীর মধ্যে মিশে যাওয়া ছিল অনেকটা কৃত্রিম। তুর্কী ও আফগানরা একদিকে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টাও করত। কিন্তু অন্যদিকে আবার, খাদ্য ও পোষাকের ব্যাপারে ভারতীয় রীতি গ্রহণ করার ফলে এরা নিজেদের স্বতন্ত্রতা কিছুটা হারিয়ে ফেলছিল। স্থানীয় পরিবারে বিয়ে করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠায় সামাজিক মিশ্রণ ঘটছিল আরো দ্রুত গতিতে। আচার-ব্যবহারে এরকম কিছু পরিবর্তন মুসলমানরা স্বীকার করল, যা গোঁড়া ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না। উত্তর-ভারতীয় সংগীতের অনেকগুলি যা বিশিষ্টরূপ, তার মধ্যে এই যুগের মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর যথেষ্ট দান আছে। পোলো, অবসর বিনোদনের জন্যে মুসলমানদের প্রিয় খেলা ছিল। ঘোড়দৌড়, জুয়া, শিকার ইত্যাদি যা অনেক সময়ই ছিল ইসলাম-বিরোধী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে উলেমারা ইসলামী আইনের চতুর ব্যাখ্যার সাহায্যে খানিকটা আপোস করতে রাজী ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই পুত্র সন্তানের জন্ম ছিল শ্রেয়। এর থেকে প্রমাণ হয়, সমাজে মেয়েদের স্থান নিচু ছিল। উচ্চবর্ণের নারী মীরাবাঈ বা রাজিয়া তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রথমজন হয়েছিলেন সন্ন্যাসিনী, আর দ্বিতীয়জন পুরুষ শাসকদের অনুকরণ করেছিলেন। হিন্দু রাজকুমারী দেবলরাণী ও মুসলমান সুলতানী রাজকুমার খিজির খানের প্রেম এবং রূপমতী ও বজ বাহাদুরের প্রণয় নিয়ে রোমান্টিক কাহিনী রচিত হয়েছিল। সাহিত্যে নারীপ্রশস্তি ও স্ত্রীপুরুষের প্রণয় নিয়ে অনেক রোমান্টিক রচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবজীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, মেয়েদের একেবারে পর্দার আড়ালেই বাস করতে হতো এবং বাড়ীর একটা পৃথক অংশ তাদের জন্যে নির্ধারিত থাকত। বাইরে যেতে হলে মেয়েদের আবৃত হয়ে বেরোতে হতো।

হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতশ্রেণীরা বাড়ীর মেয়েদের জীবনের অপ্রিয় ও আদিম ব্যাপারগুলি থেকে বাঁচিয়ে আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। তা থেকেই হয়তো পর্দাপ্রথার শুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েরা বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাদের তাৎপর্যহীন জীবনকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্যে মেয়েরা প্রণয়-মূলক জটিলতা এবং কখনো বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নিয়ে মেতে থাকত। অর্থনৈতিক কারণে কৃষক ও কারিগরদের পরিবারে মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা ছিল। বর্ণ মিলিয়ে, রাশিচক্র বিচার করে, সম্পত্তির হিসেব নিয়ে তবে উভয়পক্ষ বিয়ের

আয়োজন করত ; বিবাহকে প্রায় পুরোপুরি সামাজিক দায়িত্ব মনে করা হতো। পরিবারের মধ্যেই সম্পত্তি রেখে দেবার জন্যে মুসলমানরা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ইত্যাদি অতি নিকট সম্পর্কের ভাই-বোনের বিয়েতে উৎসাহ দিত।

মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে উলেমারা কিন্তু এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে যে কোনো রকম মিশ্রণ পরিহার করে চলত। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাও বর্ণ বা ধর্মের লোক সম্পর্কে একই মনোভাব পোষণ করত। হিন্দুধর্মের ওপর মুসলমান শাসনের যাই প্রভাব পড়ে থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের অবসান হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান কমে গিয়েছিল, কেননা মুসলমান শাসকদের নিজেদের ধর্মপ্রবক্তাদের প্রয়োজনও মেটাতে হতো। আগে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোনো কর দিতে হতো না। কিন্তু মুসলমান শাসনে ওই বিশেষ সুবিধের অবসান হল। রাজসভাতেও ব্রাহ্মণদের আগের মতো প্রতিপত্তি ছিল না। উলেমারা বুঝেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে ভোগ করতে হলে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মন্দির ও মসজিদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কিন্তু কোনো পারস্পরিক প্রভাব পড়েনি। দুই ধর্মের পুরোহিতরাই সযত্নে এই পার্থক্যকে লালন করে এসেছেন।

এই বিচ্ছিন্নতার জন্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল শিক্ষাব্যবস্থা। মন্দির ও মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয়ে প্রধানত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে ধর্মতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় শেখানো হতো না। অধিকাংশ মুসলিম স্কুল (বা মাদ্রাসা) রাষ্ট্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। সুলতানরা শিক্ষার জন্যে সাহায্যের ব্যাপারে দরাজহস্ত ছিলেন। হিসেব করে দেখা গেছে, তুঘলকী যুগে কেবল দিল্লীতেই প্রায় ১,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষার এই বিপুল আয়োজন কেবল ধর্মশিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তা সত্ত্বেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরে অন্যান্য মানুষের মধ্যে ভারতীয় ও আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে পারস্পরিক আগ্রহের উদাহরণ আছে। কিছুটা সাংস্কৃতিক জ্ঞানবিনিময় অনিবার্য ছিল। চিকিৎসা বিদ্যার ব্যাপারে এই বিনিময় ফলপ্রসূ হয়েছিল। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি পশ্চিম-এশিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং অন্যদিকে আরবদের ইউনানী চিকিৎসারীতি ভারতে প্রসারলাভ করল। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কারিগরি শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। কারিগরি শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল সরকারী কারখানার কারিগরদের। জ্ঞানের বিনিময় কেবল দুই ধর্মের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার কোনো লাভ হয়নি। তৈমুরের দিল্লী আক্রমণের ফলে পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদরা দেশের নানা অঞ্চলে পালিয়ে যাওয়ায় বিদ্যাচর্চার খানিকটা ভৌগোলিক ব্যাপ্তি হয়।*

*তুর্কীদের বদলে যদি এসময়ে ভারতে আরবরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করত তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের কি বিকাশ হতে পারত তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা যায়। হয়তো সেক্ষেত্রে উভয়জাতির জ্ঞানচর্চার ঘাত-প্রতিঘাতের ফল অনেক শুভ হতো এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার প্রতি সেযুগে আরবদের যে পরীক্ষা নিরীক্ষার মনোভাব ও বিশ্লেষণমূলক আগ্রহ ছিল, হয়তো তার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় পণ্ডিতরা তাঁদের সাবেকী পুঁথিগত বিদ্যার সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারতেন।

ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ এদেশের জীবনযাত্রার মধ্যে বিদেশী প্রভাব খানিকটা অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, যদিও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আগের মতোই স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা তখনো বজায় ছিল। হিন্দুরা দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনো অসুবিধে ভোগ না করলেও প্রকৃতপক্ষে নাগরিক মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে তারা মুসলমানদের সমতুল্য ছিল না। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আগে নিম্নবর্ণের হিন্দু হলেও ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হতো, এতে বর্ণ হিন্দুরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ছিল। যদি মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশী জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আলাদা থাকতো, তাহলে হয়তো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ইসলামী আদর্শ স্বীকার করতে আপত্তি থাকত না।*

স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টায় ব্রাহ্মণরা প্রাচীন সাহিত্যের ওপর নির্ভর করেছিল। এর ফলে প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থ সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হল। নতুন করে ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্তসার রচিত হল। যখন নতুন শাসকরা হিন্দুধর্মের আইনগত ভিত্তি জানতে চাইতেন, ব্রাহ্মণরা প্রাচীন শাস্ত্রগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিত। ও শাস্ত্রগ্রন্থে সমাজের মধ্যে কোনো বিভেদ ও সংঘর্ষের উল্লেখ ছিল না। বর্ণাশ্রমের কাঠামোর বাইরেও যে কোনো শক্তিশালী ধর্মীয় গোষ্ঠী থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কি করা উচিত, সে বিষয়ে শাস্ত্রে কোনো বিধান ছিল না।

শৈব ও বৈষ্ণব, গোঁড়া হিন্দুদের এই প্রধান দুই গোষ্ঠী। কিন্তু এই গোষ্ঠী দুটির মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠী ছিল এবং তাদের বিশ্বাসের কিছু কিছু তারতম্য ছিল। উত্তর-ভারতে বৈষ্ণবরাই প্রধান গোষ্ঠী ছিল, যদিও বৈষ্ণদের দুই প্রধান প্রচারক, রামানন্দ ও বল্লভ ছিলেন দক্ষিণ-ভারতের লোক। উত্তর-ভারতের বৈষ্ণব-ধর্মসংস্কারকদের ওপর তাঁদের যথেষ্ঠ প্রভাব পড়েছিল। কোনো কোনো ধর্মপ্রচারক ভক্তি মতবাদের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। কিন্তু যেসব প্রচারকের চিন্তা ও শিক্ষা ইসলামিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাঁদের আলাদা করে ধরা যায়। হিন্দুদের গোষ্ঠীর মধ্যে নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মূল ধর্মীয় বক্তব্য একই ছিল। বৈষ্ণবরা হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যক্তিগত উপাসনারীতি প্রচলন করার চেষ্টা করেছিল। রামানন্দ লিখেছেন!

> "আমার পূর্বে অভ্যাস ছিল চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধিদ্রব্য নিয়ে ব্রহ্মকে (ঈশ্বরকে) নিবেদন করা। কিন্তু গুরু শেখালেন যে, আমার নিজের হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজমান। যেখানেই আমি যাই সেইখানেই জল ও পাথরের পূজা হতে দেখি। কিন্তু প্রভু, তুমিই তো তোমার অস্তিত্ব দিয়ে তাদের পূর্ণ করে রেখেছ। সকলে বৃথাই বেদের মধ্যে তোমাকে খুঁজে বেড়ায়। হে আমার গুরু, তুমি আমার সমস্ত ব্যর্থতা ও মোহের অবসান ঘটিয়েছ। রামানন্দ তার প্রভু ব্রহ্মের মধ্যে আত্মহারা। গুরুর কথায় কর্মের অসংখ্য বন্ধন ছিন্ন হয়।[১]"

বাংলাদেশের এক শিক্ষক চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে) এক ভাবসমাধির পর কৃষ্ণভক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি এরপর ভক্তির আসরের আয়োজন করে সেখানে

* জেসুইটরা সাধারণ মানুষের বদলে এশিয়ার নানা দেশের সম্রাট ও রাজাদেরই ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে গেলে উচ্চবর্ণের এশীয়রা তাতে অসন্তুষ্ট হতো। এশিয়ায় পরবর্তী খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের এই অসন্তোষের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

গান গেয়ে বৈষ্ণব ধারণার ব্যাখ্যা করেন। সারাদেশে ঘুরে বেড়িয়ে চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়ে দিয়ে বহুলোকের কাছে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন। চৈতন্য শুধু ভক্তি-ভাবে আপ্লুত হয়ে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, বিশুদ্ধ ধর্মানুভূতিই ছিল তাঁর প্রেরণা।

অন্য একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী আত্মক্লেশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করছিল। এদের কাছে অন্যসব লক্ষ্য এই এক উদ্দেশ্যের অধীন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত রাণী মীরাবাঈ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সারাদেশে স্বরচিত গান গেয়ে বেড়াতেন। আরো ছিলেন আগ্রা শহরের অন্ধকবি সুরদাস। এছাড়া ছিলেন কাশ্মীরের লাল্লা। ইনি শিবকে উদ্দেশ্য করে অতীন্দ্রিয়ধর্মী গান রচনা করেছিলেন।

ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারা, যাঁরা ধর্মীয় চিন্তার চেয়ে সামাজিক ধারণার ওপরই বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন, তাঁরা সকলেই ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষত, সূফীদের শিক্ষার প্রভাব তাঁদের ওপর বিশেষভাবে পড়েছিল।

প্রধানত অমুসলমান দেশে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করলেও সে চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুলতানরা যখন রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করতে ব্যস্ত, তখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। এর একটি সুলতানীর অস্তিত্বই বিপন্ন করেছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল সুলতানা রিজিয়ার শাসনকালে। মুসলমানদের প্রধান দুটি গোষ্ঠী — শিয়া ও সুন্নী।* সুলতানরা সুন্নী গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় তাঁরা সুন্নী ধর্মপ্রচারক-দেরই সমর্থন করতেন এবং শিয়াদের অপছন্দ করতেন। কিন্তু শিয়া মুসলিমরা আরবদের সিন্ধুজয়ের সময় ভারতে এসেছিল এবং সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে ক্ষমতাশালী ছিল। গজনীর মামুদ মুলতানে শিয়া মুসলিমদের ধ্বংস করার-চেষ্টা করেও বিফল হন। ওদিকে তুর্কীদের ক্ষমতালাভের ফলে ভারতে শিয়া মুসলিমদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেল। শিয়ারা অন্য কোনো কোনো গোষ্ঠীর সহায়তায় সুলতানা রাজিয়ার আমলে সুলতানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যর্থ হয়। এর-পর সুলতানী আমলে শিয়ারা আর সুন্নী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু এছাড়া সুন্নীদের আরো একদল মুসলমান এর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। এদের প্রভাব পরোক্ষ হলেও এদের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। এরা হল সূফী। তুর্কীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর সূফীরা ভারতে এসেছিল। এরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করত। ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্ছিন্নতার একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ছিল। দশম শতাব্দীতে পারস্যে সূফীরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের মতে ভগবানকে ভালোবেসেই তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়।

গোঁড়া মুসলিমরা এই মতবাদকে আক্রমণ করল ও সূফীদের আখ্যা দেওয়া হল ধর্মবিরোধী বলে। এই কারণেই সূফীরা সমাজ থেকে দূরে বাস করত। এদের ভাষা ক্রমশ প্রতীকধর্মী ও রহস্যময় হয়ে উঠল। কখনো কখনো এরা হিন্দুগুরুর মতো

* ইসলামের এই বিভেদ শুরু হয়েছিল একেবারে প্রথম যুগেই। খলিফার পদের উত্তরাধিকার নিয়েই এই বিরোধ। শিয়ারা এই পদ আলিকে দিয়ে এটি বংশানুক্রমিক করতে চেয়েছিল। সুন্নীরা নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিল। এভাবেই নানা বিরোধের শুরু। শিয়াদের মধ্য থেকেই সূফী ইত্যাদি গোষ্ঠীর উদ্ভব। সুন্নীরা আরো গোঁড়া বলে মনে করা হল।

কোনো পীর বা শেখের নেতৃত্বে গোষ্ঠী গঠন করত। গোষ্ঠীর সদস্যদের বলা হতো ফকির বা দরবেশ। কোনো কোনো গোষ্ঠী বিশেষ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান করত। যেমন, নাচের মধ্য দিয়ে সম্মোহিত অবস্থায় পৌঁছনো। ভারতবর্ষে এর আগে তপশ্চর্যা, উপনিষদ ও ভক্তিবাদের যুগ গেছে। অতএব, সুফীদের মতবাদ প্রচারেও অসুবিধে হল না। ভারতীয় সুফীদের প্রধান তিনটি ভাগ ছিল—চিশ্‌তী, সোরাবর্দী ও ফিরদৌসী। চিশ্‌তী গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক বরণি ও কবি আমীর খসরু। এই গোষ্ঠী দিল্লী ও দোয়াব অঞ্চলে বেশি জনপ্রিয় ছিল। সোরাবর্দী গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল সিন্ধু অঞ্চলে। ফিরদৌসী গোষ্ঠী জনপ্রিয় ছিল বিহারে।

ভারতীয় সুফীরা গোঁড়া ধর্মকেন্দ্রগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। তাদের মতে, উলেমারা কোরাণের অপব্যাখ্যাকারী। সুফীরা বলত, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগসাধন করে ও সুলতানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উলেমারা কোরাণের আদি গণতান্ত্রিক নীতিকে বিকৃত করেছে। উলেমারা সুফীদের উদার চিন্তার নিন্দা করত এবং সুফীরা উলেমাদের বিরুদ্ধে পার্থিব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ করত। যেসব সুফী সমাজকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি, তাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ লুকিয়ে আছে বলে প্রায়ই সন্দেহ করা হতো। কিন্তু সুফীরা কখনোই বিদ্রোহের কথা ভাবত না। কারণ, যা নিয়ে তাদের আপত্তি, তা থেকে তাত্ত্বিকভাবে এবং কার্যতও দূরে সরে থাকাই সুফীদের রীতি ছিল। এই সময়ে সুফীরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, পৃথিবীতে একযুগ আসন্ন যখন এক ইসলামী 'মাহদী' (উদ্ধারকর্তা) এসে ইসলামের আদিম বাণী আবার প্রচার করবেন। ভারতবর্ষে নির্জনবাসী ব্যক্তির অভাব ছিল না এবং সুফীদের বৈরাগী জীবনযাত্রাও এখানে কারো কাছে অদ্ভুত মনে হয়নি। এইভাবে হিন্দু গুরুদের মতো সুফী পীররাও হিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতেন। হিন্দুদের কাছে গুরু ও পীর একই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন।*

ইসলামে যে সামাজিক সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা উলেমাদের চেয়ে সুফীরা অনেক বেশি মেনে চলত। এর ফলে সুফীদের সঙ্গে কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর লোকের সম্পর্ক নিকটতর হয়েছিল। সুফীদের সঙ্গে যেসব মানুষের ঘনিষ্ঠতা বেশি, তাদের মধ্যে ছিল প্রচলিত সামাজিক রীতিবিরোধী ব্যক্তিরা এবং যুক্তিবাদী মানুষেরা। সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদ কিন্তু সবসময় ধর্মীয় পলায়নী পদ্ধতি ছিল না। অনেকে সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না, কারণ তারা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে বিশ্বাসী ছিল। এরা মনে করত, ধর্মের নিয়মকানুনে আটকে পড়ে যুক্তিবাদী চিন্তা ব্যাহত হয়েছে। একজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ ছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া। সাধারণ মানুষ সুফীদের সঙ্গে যাদুবিদ্যার নিকট সম্পর্ক

*এখনো পর্যন্ত হিন্দুধর্মের পবিত্রস্থান কুরুক্ষেত্রে এক অখ্যাত পীরের সমাধিক্ষেত্রে প্রতি বছর মেলা বসে। হাজার হাজার হিন্দু গ্রামবাসী সমাধিটি পুজো করে। ওই একই গ্রামবাসীরা আধমাইল দূরে একটি পুকুরের মধ্যে একটি ভাঙা মন্দির দেখিয়ে বলে কাহিনী আছে, এক মুসলিম শাসকের হাতে মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছিল।

আছে বলে ভাবত। সিদি মৌলার কোনো আয়ের উৎস ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি দরিদ্র মানুষকে প্রচুর অর্থসাহায্য করতেন। এই দেখে মানুষের সন্দেহ হতো যে, তিনি সোনা তৈরী করতে পারেন। মনে হয়, অসন্তুষ্ট ওমরাহরা তাঁকে সাহায্য করত এবং তাঁর অতিথিশালা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রকৃতপক্ষে সুফীদের আগেও ভারতবর্ষে এই ধরনের মানুষ ছিল এবং তাদের কার্যকলাপও একই রকম ছিল।

দর্ভাগ্যের কথা এই যে, প্রথমদিকে সুফীরাই রাজনীতি ও ধর্মনীতির ব্যাপারে নতুন চিন্তার জন্ম দিলেও এরা ক্রমশঃ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল। সমাজের মধ্যে থেকে গেলে সুফীদের প্রভাব হতো অনেক বেশি এবং ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও তারা মানুষকে সংগঠিত করতে পারত। সেক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলনের নতুন সামাজিক এবং ধর্মীয় চিন্তাও জোরদার হয়ে উঠত। যদিও সুফী মতবাদ আগেকার ভক্তি মতবাদেরই আরেক রূপ ছিল, ভক্তি মতবাদকে সুফীরা নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিছু কিছু প্রকৃত ইসলামী ধারণাও এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, বিশেষত সামাজিক সুবিচার সম্পর্কিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে।

সুফী ও ভক্তিবাদের মধ্যে অনেকাংশে মিল ছিল। দুই মতবাদেই বিশ্বাস করা হতো যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন প্রয়োজন। এছাড়া, দুপক্ষই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের প্রেমময় সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিত। দুই মতবাদই গুরু বা পীরের ওপর জোর দিত। কিন্তু সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে ভক্তি মতবাদের বিরোধ ছিল।* কারণ, ভক্তিমতবাদ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পক্ষপাতী ছিল না। বরং সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় নতুন চিন্তার কথা বুঝিয়ে বলাই ভক্তি প্রচারকদের উদ্দেশ্য ছিল।

ভক্তিমতবাদ প্রচারক 'সন্ত'রা ভক্তিমার্গী উপাসকদের মতোই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন কারিগর এবং অনেকে ছিলেন দরিদ্র কৃষক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা ভক্তি আন্দোলনে যোগ দিলেও অধিকাংশ ভক্তিমতবাদের অনুগামী ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ। ভক্তি মতবাদে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনার বস্তু ও বর্ণপ্রথাকে আক্রমণ করা হল। মেয়েদের ধর্মসভায় আসতে উৎসাহ দেওয়া হল এবং ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ভাষায়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এযুগের ভক্তি আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি দান এসেছিল নানক ও কবীরের কাছ থেকে। এঁরা শহরের মানুষ ও গ্রামের যেসব কারিগরের শহরের সঙ্গে সংযোগ ছিল, তাদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কবীর ও নানকের ধারণা, ইসলামিক ও প্রচলিত চিন্তাধারা উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। ইসলামী চিন্তার প্রভাবের জন্যে তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তি-প্রচারকদের চিন্তার কিছুটা প্রভেদ আছে। তবে তাঁদের শিক্ষা প্রধানত শহরভিত্তিক ছিল।

*ভক্তিমতবাদ প্রচারকদের বলা হতো 'সন্ত' অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু ইংরেজীতে তাঁদের আজকাল সুবিধের জন্তে 'সেন্ট' বলে উল্লেখ করা হয়।

অথচ আগের যুগে শহরে তেমন প্রচার না হবার ফলে ভক্তি আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অতীন্দ্রিয়বাদী গোষ্ঠীগুলি অবশ্য সবসময় শহরভিত্তিক ছিল না।

বলা হয়, কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ) ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বিধবার অবৈধ সন্তান। কবীরের পালকপিতা ছিলেন তন্তুবায় এবং কবীরও এই নিম্নবর্ণের পেশাতেই শিক্ষিত হয়েছিলেন। কবীর যখন কবিতায় তাঁর উপদেশগুলি সংকলন করেন, তার মধ্যে কাপড়বোনা সংক্রান্ত বহু উপমা এসে পড়েছিল। কবীর প্রথমে বৈষ্ণব প্রচারক রামানন্দের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নিজস্ব ধারণা প্রচার করা শুরু করলেন। কবীর কেবল ধর্মীয় পরিবর্তন নিয়েই চিন্তা করেন নি। সমাজ-ব্যবস্থারই পরিবর্তন চাইতেন। দুই লাইনের একেকটি শ্লোকের (দোহা) মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর চিন্তা লিপিবদ্ধ করতেন। ওই শ্লোকগুলি মনে রাখতেও সুবিধে হতো এবং শ্লোকের বক্তব্যও অত্যন্ত সহজবোধ্য ছিল। কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর রচিত শ্লোকগুলি নিয়ে দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রীঃ) এসেছিলেন গ্রামাঞ্চল থেকে, তাঁর পিতা ছিলেন গ্রামের এক হিসাবরক্ষক। এক মুসলমান বন্ধুর উদারতায় তিনি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান এবং পরে এক আফগান শাসকের অধীনে গুদাম রক্ষকের চাকরি পান। নানক তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান থাকা সত্ত্বেও সব ছেড়ে সুফীদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সুফীদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নানক দেশের নানা জায়গায় ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লেন। শোনা যায়, তিনি মক্কাতেও গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে পরিবারের সকলকে নিয়ে পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করলেন। এখানেই নানক তাঁর বাণী প্রচার করেন ও পরে মারা যান। নানকের বাণী 'আদিগ্রন্থ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা আছে।

কবীর ও নানকের প্রভাবে ভক্তি আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নিল। তাঁরা কিন্তু হিন্দুধর্মের উপাসনারীতিকে আক্রমণও করেননি, কিংবা ভক্তিভাবে নিমজ্জিত হয়ে কোনো পলায়নী উপদেশও দেননি। নানক ও কবীর ঈশ্বরকে যেভাবে দেখেছিলেন, তা থেকেই তাঁদের চিন্তার স্বতন্ত্রতা বোঝা যাবে। কবীর হিন্দু ও মুসলিমদের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাকে অস্বীকার করতেন, কিংবা দুই ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাকেই সমগোত্রীয় বলে বর্ণনা করতেন। ওঁর ভাষায়—

"হে আমার ভৃত্য, তুমি আমাকে কোথায় খুঁজছ ; দেখ আমি তোমার পাশেই আছি। আমি মন্দিরেও নেই, মসজিদেও নেই, আমি কাবা*তেও নেই, কৈলাসেও নেই ; আমি আচারেও নেই, অনুষ্ঠানেও নেই, যোগেও নেই, ত্যাগেও নেই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে খোঁজ, আমাকে তুমি এইক্ষণেই দেখতে পাবে ; তুমি মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে। কবীর বলেন : হে সাধু, ঈশ্বরই হলেন সকল প্রাণের প্রাণ।"

*'কাবা' হল মক্কায়। এখানেই মুসলমানদের পবিত্র কালো পাথরটি রাখা আছে। আর, কৈলাস পর্বত হল শিবের আবাস।

আরেকটি শ্লোক হল—

"ঈশ্বর যদি মসজিদেই আছেন, এই জগত তবে কার? তীর্থস্থানের পাথরের মূর্তির মধ্যেই যদি রাম † থাকেন, বাইরের জগতের খবর তবে কে রাখবেন? হরি আছেন পূর্বে, আল্লা আছেন পশ্চিমে, তুমি তোমার হৃদয় খুঁজে দেখ—করিম* ও রাম উভয়েই আছেন হৃদয়ে; এ জগতের সমস্ত মানব-মানবীই তাঁর অংশ। কবীর আল্লা ও রামের সন্তান: তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।"[২]

নানক আরো এগিয়ে গেলেন এবং হিন্দু বা মুসলমান চিন্তাধারণার উল্লেখ না করেই বর্ণনা করলেন ঈশ্বরের—

"যিনি পরম সত্য তিনি ছিলেন সূচনায়, তিনি ছিলেন আদিমযুগে, সেই পরমসত্য এখনো আছেন। হে নানক, ওই পরমসত্য ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাঁর আদেশেই মানবদেহের জন্ম। তাঁর আদেশ বর্ণনা করা যায় না।

তাঁর আদেশেই মানবদেহে আত্মার আগমন, তাঁর আদেশেই মহত্ব অর্জিত হয়।

তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষ উচ্চ বা নীচ; তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষ পূর্বনির্ধারিত সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। তাঁর ইচ্ছাতেই কেউ কেউ পুরস্কার পায়। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই অন্যেরা জন্মান্তরের ফেরে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেকেই তাঁর অধীন; কেউ এর বাইরে নয়।

হে নানক, যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারে, সে কখনো অহঙ্কার দোষে দুষ্ট নয়।"[৩]

দুই ধর্মের ভাবধারা স্বেচ্ছায় যুক্ত করে গ্রহণ করে হিন্দু ও মুসলিমের পার্থক্য দূর করার উদ্দেশ্য কবীর ও নানকের ছিল না। তেমন ধারণা পরে আকবরের দীন-ই-ইলাহীতে খানিকটা আসে। কবীর ও নানক এক নতুন ধর্মগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং এঁদের কাছে ঈশ্বর কেবল রাম বা আল্লার নতুন সংস্করণ ছিলেন না। ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নতুন ধারণার নানা অংশ দুই ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু এঁরা সচেতনভাবে দুই ধর্মীয় ধারণার মিলনের চেষ্টা করেননি। এই কারণেই উলেমা ও ব্রাহ্মণরা ভক্তি আন্দোলনের এই দুই নেতার ওপর বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের ভয় হয়েছিল, কবীর ও নানক বোধ হয় নতুন কোনো ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করছেন।

কবীর ও নানকের অনুগামীরা স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— কবীরপন্থী ও শিখ সম্প্রদায়। কারিগর ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দুই প্রচারকই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কারণ, নতুন মতবাদে সরল জীবনযাত্রা ও সহজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। দুই প্রচারকের লেখাই সহজবোধ্য ও বাস্তব জীবনোচিত ছিল। কোনোরকম উগ্র বা চরম জীবনযাত্রার পরিবর্তে এঁরা সহজ সরলভাবে দিন কাটাতে উপদেশ দিয়েছিলেন। যেমন, যে যোগী জীবন থেকে

† রামায়ণের নায়ক রাম বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পূজিত।
* ইসলামে আল্লার অন্য নাম 'করিম'।

অত্যধিক দূরে সরে থাকতে চাইতেন, কবীর তাঁকে ব্যঙ্গ করেছেন।

এই দুই মতবাদের জনপ্রিয়তার পেছনে কেবল ধর্মীয় কারণই ছিল না। কবীর ও নানক ভারতীয় সমাজের সমস্যার কথা বুঝেছিলেন। বর্ণের পার্থক্য, সংগঠিত ধর্মের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। এঁরা জোর দিতে চেয়েছিলেন যার ওপর তা হল বিভিন্ন আদর্শের সহাবস্থানই যথেষ্ট নয়, সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে। সামাজিক সাম্যের আহ্বান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং কবীর ও নানক দুজনেই বর্ণপ্রথাকে অস্বীকার করেছিলেন। বর্ণপ্রথা থেকে মুক্তি পাবার অন্যতম উপায় ছিল কোনো বর্ণহীন গোষ্ঠীতে যোগদান। এর আগেও কিছু কিছু ধর্মগোষ্ঠীতে নিম্নবর্ণের মানুষ যোগ দিয়ে নিজেদের বর্ণকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। বর্ণ সম্পর্কে কবীর ও নানক যা বললেন, তাতে কারিগর শ্রেণীর মানুষ— যারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিমদের কাছে চিরকাল অবজ্ঞাভাজন ছিল, তারা নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল।

কবীরপন্থীরা এখন আর স্বতন্ত্র কোনো সম্প্রদায় নয়। কিন্তু শিখরা এখনো পৃথক ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে টিঁকে আছে। এই প্রভেদের মূলে রয়েছে দুই ধর্মগোষ্ঠীর শিক্ষার পার্থক্য। কবীর হিন্দু বা মুসলমান ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন হলেও দুই ধর্মেরই ঈশ্বরের কথা শিক্ষার মধ্যে বারবার উল্লেখ করেছিলেন। তাই, দুই ধর্মেরই কম গোঁড়া মানুষরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমশ কবীরপন্থীরা হিন্দুধর্মেরই একটি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হল। তবে, কবীর নামটি এখনো মুসলমানদের একটি প্রচলিত নাম। কিন্তু নানকের ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দিতে হলে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বাইরের বৈশিষ্ট্যগুলি আরো বেশি করে ত্যাগ করে আসতে হতো। এইজন্যে শিখদের মধ্যে গোষ্ঠী মনোভাব দৃঢ় ছিল। নানক বলতেন, নতুন ধর্মগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকে সমাজের মধ্যেই সক্রিয় থাকতে হবে। নানকের মৃত্যুর পর শিখরা স্বতন্ত্র একটি ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হল। পরের দিকে শিখরা নিজস্ব কিছু প্রতীক গ্রহণ করায় এই পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।*

সমস্ত ভারতের ভক্তি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল : তাঁরা সকলেই কবিতা রচনা করেছেন আঞ্চলিক ভাষায়। সাধারণ মানুষের মাতৃভাষায় তাঁরা ধর্মের সরলবাণী প্রচার করেছেন। এতে শুধু যে ভক্তিসাহিত্য সম্পর্কে জনগণের উৎসাহ হল তা নয়, শাস্ত্র ও পুরাণ, যা সংস্কৃতে লেখা বলে এতদিন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল, আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা শুরু হল। এরমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীগুলি। সহজ ভাষায় জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে গীতা ইত্যাদি পবিত্রগ্রন্থের আঞ্চলিক ভাষায় টীকারচনা আরম্ভ হয়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতস্ফূর্ত প্রাণের আবেগ, যা তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যের জীবনবিচ্ছিন্ন

* এর মধ্যে আছে পাঁচটি 'ক' বহন করা—কেশ (চুলকাটা চলবে না), কাঙ্গা (ছোট চিরুণী) কড়া (হাতে লোহার বালা), কৃপাণ (ছোট ছোরা), ও কচ্ছ (অন্তর্বাস)।

কৃত্রিমতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। যে বিষয়বস্তু নিয়ে এই নূতন সাহিত্য রচিত হয় তা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের কাছে সমভাবে আকর্ষনীয় ছিল, ফলে একভাষার রচনা সহজেই আঞ্চলিক সীমানা ছাড়িয়ে অন্য ভাষায় এবং ধীরে ধীরে সারা উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ত।

পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা শ্রীচৈতন্য কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। কবি চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু বাংলা কাব্য রচনা করেছেন। জনপ্রিয় চারণকবিরা সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে রচিত গাথা স্থানে স্থানে গেয়ে বেড়াতো। দিল্লীর সুলতানের তুলনায় বঙ্গদেশের তুর্কী শাসকদের তুরস্ক থেকে দূরত্ব বেশি ছিল— ফলে তারা অনেক তাড়াতাড়ি আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলে। শাসকদের বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত আগ্রহ থাকার ফলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ হয়।

শঙ্করদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া ভাষাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নতুন পন্থা নিয়েছিলেন। তিনি পুরাণগুলি থেকে নানা কাহিনী নিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট একাঙ্ক নাটক রচনা করলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কিছু পুঁথিপত্র রয়েছে— যাদের রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু। এগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছে, সেটিই পরে আধুনিক ওড়িয়া ভাষার রূপ নেয়। চৈতন্য তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি পুরীতে কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের সংস্কৃতের পরিবর্তে ওড়িয়া ভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহ দিতেন। বিহার অঞ্চলের মৈথিলী ভাষাও বৈষ্ণব ও ভক্তি আন্দোলনের সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

পশ্চিম ভারতের জৈন প্রচারকরা গুজরাটী ভাষা ব্যবহার করতেন। গুজরাটী ও রাজস্থানী ভাষার একটা নিকট সম্পর্ক ছিল। মাড়োয়ারের ভাষা ডিংগল রাজস্থানের নানাস্থানে ব্যবহৃত হতো এবং এই ভাষা থেকেই আধুনিক গুজরাটী ভাষার জন্ম। মীরাবাঈ রাজস্থানী ভাষাতেই তাঁর গানগুলি রচনা করলেও হিন্দী-ভাষার অন্যান্য ভক্তিবাদী লেখকেরা তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন।

দিল্লী ও বর্তমান উত্তর-প্রদেশ অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল হিন্দী। তবে, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দীর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। প্রথমে রাজপুত রাজাদের রাজসভায় কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে হিন্দীভাষার উন্নতি হতে শুরু করে। যেমন, 'পৃথ্বীরাজ রসো,' 'বিশালদেব রসো' ইত্যাদি। এই অঞ্চলের সূফীরা বক্তৃতা করার সময় 'হিন্দী' ভাষা ব্যবহার করত, এটিই ছিল হিন্দীর প্রাচীন রূপ। এইভাবে হিন্দীভাষার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। পরে কবীর, নানক, সুরদাস ও মীরাবাঈ হিন্দীভাষা ব্যবহার করে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন।

সুলতানী আমলের কবি আমীর খসরু সাধারণত ফারসী ভাষায় কাব্যরচনা করলেও সময়ে সময়ে হিন্দীভাষাও ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া, উর্দুভাষার অন্যতম জনক ছিল হিন্দীভাষা। উর্দু প্রথমে ছিল সৈন্যশিবিরের ভাষা। কিন্তু ক্রমশ এটিই সুলতানী যুগের প্রধান ভাষা হয়ে উঠল। হিন্দী বাক্যগঠন পদ্ধতি এবং পারসী

ও আরবী ভাষার শব্দসম্ভারের মিলনে উর্দুভাষার জন্ম। স্বভাবতই যারা উর্দু ব্যবহার করত, তারা হিন্দীও জানত।

শাসকরা ফারসী ভাষাভাষী হওয়ায় ভারতে ফারসী ভাষার ব্যবহার শুরু হল সরকারী ভাষা হিসেবে। এছাড়া, সাহিত্যের ওপরও ফারসী ভাষার প্রভাব পড়েছিল। সরকারী ভাষা হিসেবে সংস্কৃত যখন ফারসীভাষার দ্বারা স্থানচ্যুত হল তখন অনেক উত্তর-ভারতীয় রাজ্যে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার বেড়ে গেল। কারণ ফারসী ছিল অপরিচিত ভাষা। আরবী ভাষার ব্যবহার কিছুটা সীমিত ছিল। ভারতে প্রথম-দিকের ফারসী সাহিত্য প্রধানত পারস্যদেশীয় সাহিত্যেরই অনুকরণ ছিল, তার গঠন ও চিত্রকল্প ছিল পারসিক ঘেঁষা। পরে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়েও সাহিত্যরচনা হতে শুরু করল, এর পেছনে ছিল মূল বা অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়তর পরিচিতি। এ ব্যাপারে আমীর খসরুর লেখা উল্লেখযোগ্য। তিনিই ভারত-ভিত্তিক ফারসী ও ইসলামী সাহিত্যের সূচনা করেন।

ভারতবর্ষে জন্ম হলেও আমীর খসরু ছিলেন তুর্কীবংশজাত। তিনি সুফী প্রচারক নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। নিজামুদ্দীন থাকতেন দিল্লীর কাছে। খসরুও শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন। তাঁর মতো প্রতিভাধর যুবকের কাছে দিল্লী তখন উত্তেজনায় ভরা শহর। প্রতিভাধর আমীর খসরু ক্রমশ রাজ-দরবারে নিজের স্থান করে নিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনা নিয়ে কাব্যরচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন। দরবারের বিলাসের প্রভাবে তাঁর সংবেদনশীলতা ব্যাহত হয়নি এবং নিজামুদ্দীনের শিক্ষা তিনি জীবনে কখনো বিস্মৃত হননি। তিনি গীতিকবিতা, মহাকাব্য, শোককাব্য ইত্যাদি সব ধরনের কাব্যই রচনা করেছিলেন। তাছাড়াও ছিল কিছু ঐতিহাসিক রচনা। তার সমস্ত লেখাই ফারসীভাষায় লিখে-ছিলেন। রচনারীতি ফারসী হলেও বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয়। চারিদিকে যা দেখতেন, আমীর খসরু তা নিয়েই লিখতেন। বিদেশী বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলে লেখককে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হতো। কিন্তু আমীর খসরু ওই মর্যাদাকে গুরুত্ব দেননি। বরং তাঁর লেখা খোদ পারস্যদেশে উচ্চ প্রশংসিত হতে দেখে ভারতবর্ষে ফারসীভাষায় সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহ এল।

সবকাজেই আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার শুরু হলেও সংস্কৃতভাষায় রচনা মোটেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বহু রাজাই সংস্কৃতভাষার কবিদেরই বেশি মর্যাদা দিতেন। যে রাজারা তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস রচনার ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার প্রশস্তিধর্মী রচনা পছন্দ করতেন, তাঁদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার কবিদের বেশি গুরুত্ব দেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এইযুগে একের পর এক রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে এবং একই রীতিতে রাজবংশগুলির প্রশস্তিমূলক ইতিহাস রচিত হয়েছে। এক জৈনপণ্ডিত নয়নচন্দ্র সুরি শেষ চৌহান রাজা হামীরের জীবন নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত-ভাষার ঐতিহাসিক কবিতাগুলি কেবল হিন্দুরাজদের প্রশস্তি রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আঞ্চলিক ইতিহাস ও স্থানীয় ব্যক্তিত্বে স্থানীয় মানুষের গর্ব স্বাভাবিক ছিল। বিরাট ভূখণ্ডের ইতিহাস রচনার তুলনায় ছোট রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে কাব্যরচনা

সহজও ছিল। গুজরাটের সুলতান মামুদ বেগারহারে দরবারে রাজকবি ছিলেন উদয়রাজ। তিনি সুলতানের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে 'রাজবিনোদ'* কাব্য রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক রচনা ছাড়া অর্ধ-ঐতিহাসিক রচনাও লেখা হতো। সেগুলিকে বলা হতো 'প্রবন্ধ'। ওইযুগে প্রচুর 'প্রবন্ধ' রচিত হয়েছিল। এর সবগুলি অবশ্য ইতিহাস-নির্ভর নয়। কিন্তু, কয়েকটি যেমন মেরুতুঙ্গর 'প্রবন্ধচিন্তামণি' ও রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোষ' ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উত্তর-বিহারের মিথিলায় সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তুর্কী-আক্রমণের ঢেউ এখানে এসেছিল অনেক পরে। বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ এখানে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গুজরাটের জৈন পণ্ডিতরা সংস্কৃত রচনার ধারা বজায় রেখেছিলেন। তবে, সংস্কৃত-ভাষায় নতুন চিন্তাভাবনার চর্চা হয়েছিল কেবল দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি জায়গাতেই। ব্রাহ্মণরাই সংস্কৃতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে অনেক সময় অর্থবান ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতেন। তবে, এসব সত্ত্বেও যুগধর্মের প্রধান চিন্তাধারা সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

গুজরাটের জৈনরা তালপাতার ওপর লিখত এবং পাতার ধারে ধারে ছোট ছোট চিত্র আঁকা থাকত অলংকরণ হিসেবে। এই অঙ্কনরীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। মানুষের মূর্তিগুলিই ছবিতে প্রাধান্য পেত। মানুষের মুখ আঁকার সময় কেবল এক-পাশ থেকেই আঁকা হতো এবং ছবির বিভিন্ন মুখগুলির মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেত। উজ্জ্বল রঙের পটভূমিতে কালো রঙ্ দিয়ে মুখের রেখা আঁকা হতো। দূরের চোখগুলি এগিয়ে থাকত— এটাই এই অংকনশৈলীর আরেকটা বৈশিষ্ট্য, যার ফলে এতে লোকশিল্পের একটা ছাপ আছে।

জৈনদের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রগুলির মতো চিত্র এর আগেও দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের দেওয়ালে দেখা গেছে। আধুনিক যুগে এইসব দেওয়ালচিত্র যথেষ্ট অবশিষ্ট না থাকলেও চিত্রগুলির ওপর মন্দির চিত্রগুলির প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। বোধহয় দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্মের ক্রমবিলুপ্তির সময় কিছু জৈন সন্ন্যাসী পশ্চিম-ভারতে চলে আসেন। অংকনশিল্পে তাঁদের স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল এবং মন্দিরগাত্রের পরিবর্তে তালপাতার পুঁথির ওপরই অলংকরণ শুরু হল। বিহার ও বাংলাদেশে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতেও অনুরূপ অলংকরণ দেখা যায়। তবে, এগুলির অংকনশৈলী কিছুটা অন্য ধরনের ; এদের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের চেয়ে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ালচিত্রের সাদৃশ্যই বেশি দেখা যায়। তুর্কী আক্রমণে নালন্দার গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলির সঙ্গেও পশ্চিম-ভারতের জৈন চিত্রগুলির বিশেষ মিল নেই। পুঁথির ওপর অলংকরণ দেখে মনে হয়, যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জৈনধর্মের গোঁড়া নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল হয়েছিল।

জৈন ধর্মশাস্ত্রখানি সংরক্ষণের জন্যে প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রভূত সংখ্যায় অনুলিপি

* বর্তমান যুগেও রাজাদের জীবনী লেখার রীতি প্রচলিত আছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবৎকালেও তাঁর জীবনী 'ভিক্টোরিয়া চরিত' সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল।

ও পুরনো গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে একেবারে নতুন গ্রন্থ রচনাও হয়েছিল। সরু ও লম্বা তালপাতার উপর আলংকারিক চিত্র অাঁকবার জন্যে সামান্যই জায়গা পাওয়া যেত। লেখা অক্ষরগুলির আকৃতি ছিল বেঁটে ও মোটা। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে অঙ্কনরীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। আরব ব্যবসায়ীরা পশ্চিম-ভারতে কাগজের ব্যবহার প্রচলন করায় জৈন পুঁথিগুলি তখন থেকে কাগজেই লেখা শুরু হল। সরু ও লম্বা তালপাতার বদলে কাগজের আকৃতি হল চওড়া আয়তক্ষেত্রাকার। অাঁকার জায়গা পাওয়া গেল অনেক বেশি। অক্ষরগুলিও আর আগের মতো বেঁটে ও মোটা হওয়ার প্রয়োজন হতো না। পুঁথিলেখকদের ওপর আর অলংকরণের দায়িত্ব রইল না। সে ভার পড়ল দক্ষ শিল্পীদের ওপর।

দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটল তুর্কীদের মাধ্যমে। উত্তর-ভারতে ফারসী সংস্কৃতি প্রবর্তনের পর পারস্য থেকে অলংকরণ করা অনেক গ্রন্থ ভারতে এল। পারসীক শিল্পীদের রঙের ব্যবহারের খ্যাতি ছিল। এতদিন জৈন শিল্পীরা পশ্চাদভূমির রঙের জন্যে কেবল ইটলাল ও নীল ব্যবহার করতেন। এবার রঙের বৈচিত্র্য বাড়ল। অজন্তার প্রাচীন দেওয়াল চিত্রেও রঙের চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়। জৈন চিত্রাংকনের নতুন রীতি ষোড়শ শতাব্দীর রাজস্থানী চিত্রাংকন রীতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

তুর্কীদের প্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। এর নিদর্শন হল মসজিদ ও সমাধিসৌধ। মসজিদে অনেক মুসলিমের একত্র প্রার্থনার জন্যে একটি বড় ঘেরা জায়গার প্রয়োজন হতো। চৌকো কিংবা আয়তক্ষেত্রাকার করে এই উপাসনাস্থানটি নির্মিত হতো। ওপরে কোনো ছাদ থাকত না। তিনদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। কেবল পশ্চিম দিকের প্রাচীরে, যেদিকে তাকিয়ে উপাসনা করা হয়, ছোট ছোট কুলুঙ্গী থাকত। ইমাম যেখান থেকে উপাসনা পরিচালনা করতেন, সেখানে কয়েকটি গম্বুজ থাকত। মসজিদে প্রথমদিকে একটি মিনার ও পরের দিকে চারকোনে চারটি মিনার থাকত। এই মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন দিনে পাঁচ-বার মুসলিম ভক্তদের উপাসনার জন্যে আহ্বান জানাতেন। একমাত্র গম্বুজগুলির সঙ্গেই উপাসনার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সেগুলি মসজিদের স্থাপত্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো। এই স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পারস্যে পাওয়া যায়। এযুগে সমাধিসৌধও অত্যন্ত সরলভাবে নির্মিত হতো একটি চারকোনা বা আটকোনা ঘরে কবর থাকত এবং তার উপর একটি গম্বুজ।

তুর্কীদের সঙ্গে আরবী ও পারসী স্থাপত্যরীতি ভারতে এল, বিশেষ করে দ্বিতীয় রীতিটি। পারসী স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান, তির্যক খিলান, গম্বুজ ও গম্বুজের নিচে আটকোন বিশিষ্ট গৃহ। ভারতীয় স্থাপত্যে এসব আগে ছিল না। ভারতীয় রীতিতে খিলানের উপর দরজার চৌকাঠের মতো একটি জিনিস থাকত, কিংবা খিলানটি হতো গোলাকার। মন্দিরের শিখরগুলি নির্মিত হতো থাকে থাকে পাথর সাজিয়ে। খিলান ও গম্বুজের সম্মিলনে মুসলিম স্থাপত্য একটি বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে এ জিনিস দেখা যায়নি। কংক্রীটের অধিকতর ব্যবহারের ফলে অনেক বেশি জায়গা আচ্ছাদন করাও সম্ভব হতো। হিন্দু ও বৌদ্ধ

স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ইসলামী রীতির যে মিলন হল, তার একটা কারণ ছিল : নির্মাণকাজে ভারতীয় কারিগর নিয়োগ। ভারতীয় কারিগররা পারসী পদ্ধতির কিছুর পরিবর্তন করে নিল। এছাড়া বাড়ীগুলির অলংকরণের জন্যে প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিই ব্যবহার হল। ভারতীয় প্রতীক যেমন, বিভিন্ন আকৃতির পদ্মফুল, নতুন গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হল। ভারতীয় প্রতীকের সঙ্গে যোগ হল ইসলামী অলংকরণের নকশা, যেমন জ্যামিতিক আকৃতি, লতাপাতায় জড়ানো নকশা ও অক্ষর সংবলিত নকশা।

ভারতে ইসলামী স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হল, দিল্লীর কুয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ। উল্লেখযোগ্য যে, এটি আগে ছিল মন্দির এবং তার ওপর নানা পরিবর্তন করে মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। এখানকার মন্দিরটি ছিল দশম শতাব্দীর চৌহান আমলের। মন্দিরের গর্ভগৃহটি সরিয়ে দেওয়া হল, তবে চারদিকের আবেষ্টনীটি রেখে দেওয়া হল। মন্দিরের পশ্চিমদিকে উপাসনাস্থলটি নির্মিত হল। এইভাবে মন্দিরটি মসজিদের উপযোগী করে তৈরী করে নেওয়া হল। এর পরেও অনেক মন্দিরকে একই পদ্ধতিতে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তুর্কীরা অবশ্য মন্দিরের গায়ের হিন্দুরীতির ভাস্কর্য অপছন্দ করত। উপাসনারত মুসলমানদের সুবিধের জন্যে মন্দিরের পশ্চিমদিকে পাঁচটি খিলান তৈরী করে হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন আড়াল করে রাখা হতো। খিলানগুলির নির্মাণকৌশল যে ভারতীয় তা বোঝা যায় করবেলিঙ্গ পদ্ধতির ব্যবহার থেকে আর অলংকরণের নমুনা থেকে— অলংকরণে 'পদ্ম' ও আরবিক ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় ঘটেছে। এই মসজিদটি সুলতানী আমলের প্রথমযুগে ক্রমাগত বড় করা হচ্ছিল। ভারতীয় ও ইসলামী রীতির মিলনে যে পাঠান স্থাপত্যরীতির জন্ম, তার সূচনা এইখান থেকে।

তুঘলকী আমলে সুলতানী স্থাপত্যের কিছু পরিবর্তন হল। রেখার বাহুল্য বর্জিত হল, অলংকরণ কমে গেল, বড় বড় পাথরের টুকরোর ব্যবহার ইত্যাদির ফলে মসজিদগুলি নিরলংকার হল। সমস্ত মিলিয়ে প্রকাশ পেল শক্তি ও কাঠিন্য। গিয়াসুদ্দীনের সমাধিসৌধে ভারতীয় ও ইসলামী রীতির মিলনের অদ্ভুত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। এর খিলানগুলি তীক্ষ্ণ, প্রকৃত খিলান (অর্থাৎ corbelled নয়), অথচ খিলানের পাদদেশে আড়াআড়ি ভাবে একটি চৌকাঠও আছে, যদিও সে চৌকাঠের কোনো ব্যবহারিক যৌক্তিকতা নেই। মনে হয়, চৌকাঠটি হিন্দু খিলানের গঠনরীতির স্মারক।

লোদী আমলে আবার সুচারু আড়ম্বরের প্রবণতা ফিরে আসে। এই সময় মসজিদের বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক সৌন্দর্য নিয়ে অনেক চিন্তা হয়। ফলে, এযুগের স্থাপত্যে দুটি গম্বুজ ব্যবহৃত হতো। মসজিদের দেওয়াল অত্যন্ত পুরু করে তৈরী করা হতো বলে গম্বুজগুলির ভারসাম্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিল— দেওয়ালের ভিতরদিকে ভার পড়বে, না বাহিরের দিকে পড়বে। দুটি গম্বুজ নির্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান করা হল ; এতে বাইরের গম্বুজটি স্থাপত্যের বাইরের অংশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখত। পারস্য থেকে আরো একটি নতুন অলংকরণ রীতি গ্রহণ করা হল— এনামেল

করা টালি। ধূসর বেলে পাথরের স্থাপত্যের উপর এই টালিগুলি অতি সুন্দর দেখাতো।

দিল্লীর স্থাপত্যরীতি যেভাবে বিকাশলাভ করেছিল, আঞ্চলিক স্থাপত্যের বিকাশও ঘটল সেই পথেই। তবে, বাড়ী তৈরীর মাল-মশলার সুবিধে-অসুবিধে অনুযায়ী কিছু কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তনও হয়েছিল। বাংলাদেশে পাথর সহজলভ্য ছিল না বলে ইটের ব্যবহার হতো বেশি এবং সেজন্যে বাড়ীগুলির উচ্চতাও হতো কম। বৌদ্ধ স্থাপত্যের পোড়ামাটির অলংকরণ মসজিদ ও প্রাসাদেও ব্যবহৃত হতো। গুজরাট ও মালোয়ায় স্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। কেননা, সেখানে স্থানীয় স্থাপত্যরীতি অত্যন্ত সজীব ছিল অন্য অঞ্চলের তুলনায় এবং বিত্তবানরা নতুন স্থাপত্যশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেও উৎসাহী ছিলেন। রাজস্থানেও নতুন স্থাপত্যরীতির প্রভাব দেখা গিয়েছিল। এখানে বাস্তুস্থাপত্যে ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি কম। এনামেল করা টালির ব্যবহার প্রভৃতি কতকগুলো অলংকরণ বৈশিষ্ট্য থেকেও মনে হয়, নতুন পাঠান স্থাপত্যরীতির কাছে রাজস্থানী স্থাপত্য ঋণী।

মসজিদ ও সমাধিস্তম্ভের স্থাপত্যরীতিতে মুসলমান ও ভারতীয় স্থাপত্যরীতির মিলনে যে নতুন রীতির জন্ম হল, তার সঙ্গে উভয় প্রথাগত স্থাপত্যরীতিরই যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। হিন্দু প্রতীক, যেমন পদ্মফুল, নতুন রীতির অঙ্গীভূত হয়ে গেল। এই মিলন অনেকদিক দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের চরিত্র-নির্দেশ করে। স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্যে ব্রাহ্মণ, উলেমা ও দরবারের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা সত্ত্বেও মিলনের স্রোত ধীরে ধীরে গতিশীল হয়ে উঠছিল।

গত ৫০ বছরে অনেক ঐতিহাসিক বলার চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে কোনো ধরনের মিলনই হয়নি, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুই ধর্মীয় সমাজ বিচ্ছিন্নভাবেই পাশাপাশি বাস করেছে। এই ধারণা ঠিক নয়। এটা হল এক ধরনের ঐতিহাসিক চিন্তার উদাহরণ, যেখানে সমসাময়িক মনোভাবের যথার্থতা খুঁজে বার করার জন্যে অতীতকে সাক্ষী মানার চেষ্টা হয়। ওইযুগে হিন্দু ও মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ বলে কোনো ধারণা ছিল না। যদি তুর্কী ও আফগানরা নিজেদের বিদেশী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত, তাহলে হয়তো স্বতন্ত্র একটি জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত।

ধর্মতাত্ত্বিকরা ও দরবারের ঐতিহাসিকরাই স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছেন। এ'রা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতাকে বড় করে দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছিলেন। সেজন্যে এ'দের লেখাকে খুব নির্ভরযোগ্য মনে করা চলে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে লেখক নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে উৎসাহী, তাঁর লেখায় দুই সম্প্রদায়ের মিলনের সঠিক বিবরণ পাওয়া কঠিন। সমগ্র সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামো দেখেই সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হবে। সুলতানী যুগের সামাজিক কাঠামো লক্ষ্য করলে এই কথাই মনে হয় যে, দুই ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয় অবশ্য সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে প্রতি-

ফলিত হয়নি। তাছাড়া, এইযুগে সমন্বয়ের যে ধারার জন্ম হল, পরবর্তীকালেই তা পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল।

ইসলামের আগমনের ফলে রাজনৈতিক সংগঠনগুলিতে কোনো বড় পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ভক্তি আন্দোলন থেকে বোঝা যায় যে, প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সরব হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আনুগত্যের চেয়ে বর্ণভিত্তিক আনুগত্য বেশি শক্তিশালী ছিল বলে ইসলামের প্রকৃত প্রভাব পড়েছিল সামাজিক কাঠামোর ওপর। বর্ণভিত্তিক ভারতীয় সমাজে আরো অনেক নতুন উপবর্ণ ও গোষ্ঠীকে গ্রহণ করা হল এবং এদের অনেকেই ইসলামী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর আগের যুগেও ভারতীয় সমাজে বিদেশীদের এইভাবেই অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছিল। ইসলামের সাম্যমূলক মতবাদের প্রচার সত্ত্বেও বর্ণপ্রথা লুপ্ত হয়নি। ভারতবর্ষে এসে ইসলাম্ বর্ণভিত্তিক সমাজকে মেনে নিয়েছিল্ এবং এই কারণেই ইসলামের সামাজিক প্রগতিশীলতা দুর্বল হয়ে পড়ল। মুসলিম সমাজেও শেখ ও সৈয়দদের (এরা ছিল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আশরফ গোষ্ঠীভূক্ত) একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। ঠিক যেমন, হিন্দুসমাজে দ্বিজর পৃথক মর্যাদা। অতএব এরপর ইসলামের কাছ থেকে হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথার ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। যে বর্ণের হাতে শাসনক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদাও চিরকাল তারই বেশি ছিল। বর্ণপ্রথায় কোনো বর্ণের পক্ষে উপরে ওঠার সুযোগ ছিল না। তার ফলে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে চিন্তার বিনিময়ও হতো না। সেজন্যে এইযুগে ভক্তি আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে নানকের শিষ্যরা একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। তবে, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই প্রাচীন ধারা চলেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত। তারপর বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এক নতুন ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ফলে নতুন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসের সূচনা হল।

১৪

দাক্ষিণাত্যের অনুক্রমণ

আনুমানিক ১৩০০—১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ

দিল্লীর সুলতানরা সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ জানি বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে সুলতানী আক্রমণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সারা উপদ্বীপে। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতানদের দক্ষিণ-ভারত জয় করার চেষ্টা ও ব্যর্থতা, উভয়ের যৌথ ফলস্বরূপ দক্ষিণ-ভারতে কতকগুলি রাজ্যের উত্থান হল। উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া এযুগে আগের চেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিক্রিয়া যে কেবল রাজনৈতিক ঘটনাবলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়। দুই অঞ্চলেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল এবং তাদের মধ্যে কিছুটা অভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দিল্লীর সুলতানরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কয়েকটি সামরিক অভিযান করেছিলেন। এর ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিবারই তাদের আশংকা হয় যে, তুর্কীরা তাদের গ্রাস করবে। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে এই ভয়ের মনোভাব কেটে গেল। কেননা, ততদিনে সুলতানী শাসনের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছে। এই সময় দাক্ষিণাত্যের তুর্কী প্রশাসক বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাহমনী বংশের সূচনা করলেন। এই বংশ পরবর্তী ২০০ বছর ধরে দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল শাসন করেছিল। এর কয়েক বছর আগে আরো দক্ষিণে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই রাজ্যেই আগে হোয়সল বংশ রাজত্ব করেছিল। দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চলে সুলতানী আক্রমণের ব্যর্থতা বিজয়নগর রাজ্য স্থাপনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।

বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যের সীমানা ছিল কৃষ্ণানদী, দাক্ষিণাত্যের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। চতুর্দশ শতাব্দীতে আবার সংঘর্ষ শুরু হল; কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী দুটির মধ্যবর্তী উর্বরা রায়চুর দোয়াব অঞ্চল নিয়ে। এই অঞ্চলটি খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ ছিল। এছাড়াও ছিল গোলকুণ্ডার হীরকখনি। দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত দেখা যায় এই দ্বন্দ্ব; আর দেখা যায় যে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি ক্রমাগত আনুগত্য বদল করে গেছে।

এইসব শতাব্দীতেই ভারতে একটা নতুন ঘটনার সূত্রপাত হয়—বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয়দের ভারত আক্রমণ। আরবরা পশ্চিম এশিয়ায় যেসব বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল, শুধু তার বাণিজ্যই তারা একচেটিয়া করে নেয়নি, তাদের বাণিজ্য

প্রসারিত ছিল আরো পূর্বদিকে, সেখানেও ছিল তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। আরবদের এই একচেটিয়া অধিকার ইয়োরোপীয় বণিকদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন ইয়োরোপীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ী (যেমন, মার্কোপোলো, নিকলো কন্টি, অ্যাথানেসিয়াস, নিকিতিন ও ডুয়ার্তে বারবেসা) এশিয়া ভ্রমণ করে গিয়ে এখানকার নানা কাহিনী প্রচার করেছিলেন, সেসব কাহিনী ইয়োরোপীয় বণিকদের লোভ জাগিয়ে তুলেছিল। এরপর ইয়োরোপীয় বণিকরা বুঝল যে, আরব দালালদের বাদ দিয়ে যদি তারা সরাসরি এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে তাহলে তাদের লাভ হবে অনেক বেশি। এরপর এদের ব্যবসায়ী এবং প্রধানত রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম-প্রচারকরা ভারতে আসতে শুরু করল। ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে পর্তুগাল এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল। ব্যবসা ও ধর্মান্তকরণ দুই ব্যাপারেই পর্তুগীজরা আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। পর্তুগীজ নাবিকরা এশিয়ায় পৌঁছানোর নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করল উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগীজরা মালাবার উপকূলে এসে পৌঁছলো এবং এখানে যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তা পর্তুগীজরা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। এখানে আসবার কয়েক বছরের মধ্যেই পর্তুগীজরা এশিয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরবদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

এই যুগের প্রথম থেকেই দক্ষিণ-ভারত ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। অষ্টম শতাব্দী থেকেই আরব ব্যবসায়ীরা পশ্চিম উপকূলে বসবাস শুরু করে এবং ক্রমশ ব্যবসার প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়েছিল। তবে তখনো উপকূল অঞ্চলে আরবদের ঘনবসতি ছিল এবং তাদের বলা হতো 'মোপলা' বা মালাবার মুসলিম। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের বেশ পছন্দ ও সম্মান করত। ঘোড়া আমদানির ব্যাপারে আরবদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল এবং তারা এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভও করত। একেকটি ঘোড়ার দাম ছিল ২২০ দীনার, এবং বছরে ১০ হাজার ঘোড়া আমদানি হবার ফলে এদের অবস্থা ছিল বেশ সমৃদ্ধ। ইবনবতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে মালাবারে এসে সেখানকার উপকূল অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ ও এক সমৃদ্ধিশালী মুসলিম সম্প্র-দায়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন। উত্তর-ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল অনেক নিরুপদ্রবভাবে। কেননা, এখানকার আরবরা কেবল ব্যবসায় নিয়েই মাথা ঘামাতো, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে তাদের আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা নিয়েও তাদের কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি।

মালিক কাফুরের নেতৃত্বে তুর্কী সেনাবাহিনী ১৩১১ খ্রীস্টাব্দে মাদুরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এর ফলে দক্ষিণ-ভারতে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মাদুরা থেকে সুলতানের সেনাবাহিনী চলে যাবার পর কুইলনের (মালাবার) শাসক পূর্ব-উপকূল পর্যন্ত সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং কাঞ্চীপুরম পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জয় করে নিলেন। এর ফলে সুলতানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ভারতের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে গেল। কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে, দাক্ষিণাত্যের রাজাদের এই একতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যেই জন্ম নিয়েছিল।

কুইলনের শাসক আরব বাণিজ্যের ওপর এত নির্ভরশীল ছিলেন যে এধরনের সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করা যায় না। বরং বলা যায়, দাক্ষিণাত্যের রাজাদের ঐক্য ছিল তুর্কী-বিরোধী। তুর্কীরা দক্ষিণ-ভারতে এসেছিল বিদেশী হিসেবে, এবং এই আশংকার সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা উপকূল বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করবে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ-ভারতের সবকটি উপকূলবর্তী রাজ্যই বিপদগ্রস্ত হতো। কাণ্ডীর উত্তরাঞ্চলে সুলতানী সেনাবাহিনীর প্রস্থানের পর নতুন রাজ্যগঠনের সুযোগ ছিল এবং বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও পুরনো রীতিরই পুনরাবৃত্তি হল। এখানেও প্রদেশ-শাসক বিদ্রোহী হয়ে সুলতানীর থেকে স্বাধীন হয়ে গেলেন। সুলতান দাক্ষিণাত্য শাসনের জন্যে জাফর খাঁকে দৌলাতাবাদে প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। জাফর খাঁ কিছুদিন পরই স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'বাহমন শাহ' উপাধি গ্রহণ করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে মাদুরা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। কিন্তু অন্ধ্রে বরঙ্গল রাজ্য ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর রাজ্যদুটির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ওই উচ্চাশা সফল হয়নি।

বরঙ্গলের বিরুদ্ধে বাহমনী সুলতান এক সামরিক অভিযান পাঠানোর পর বরঙ্গল রাজ্য বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হয়। কিন্তু পরে এই কর আদায় নিয়ে ক্রমাগত সংঘর্ষের সৃষ্টি হল। বরঙ্গল রাজ্য কর আদায় দিতে অসম্মত হলে বাহমনী সুলতান সৈন্য পাঠাতেন। এছাড়া বিজয়নগর রাজ্যকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে গিয়েও বাহমনী রাজারা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়তেন। এই যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হতো পাশাপাশি ছোট ছোট রাজ্যগুলিও, যারা নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী বড় রাজ্যগুলির প্রতি আনুগত্য বদল করে চলত। সুলতানীর চেয়ে উপকূল অঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের সংঘর্ষ হয়েছিল বেশি।

বরঙ্গলে সামরিক অভিযান আগে পাঠানোর সময় সুলতানী সেনাবাহিনী দুই স্থানীয় রাজপুত্র হরিহর ও বুক্কাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে রাজপুত্রদেব ইসলামে রূপান্তরিত করা হল। তারপর তাদের দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে সুলতানীর কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্যে। একাজে রাজপুত্ররা সফল হলেও তাঁদের লোভ হল নিজেদেরই স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করার। এরপর ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে হরিহর হস্তিনাবতী (আধুনিক হাম্পি) রাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন। এই রাজ্য থেকেই বিজয়নগর রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। এরপর দুইভাই একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন। তা হল, তাঁরা আবার হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন। রাজ্যজয়ের চেয়েও একাজটা বেশি কঠিন ছিল। কেননা, ইসলামে ধর্মান্তরের পর তাঁরা জাতিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দুধর্মের নিয়মে এরপর আর হিন্দুধর্মের মধ্যে ফিরে আসার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ওই অঞ্চলের এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতা বিদ্যারণ্য দুইভাইকে আবার হিন্দুধর্মে গ্রহণ করলেন। উপরন্তু তিনি একথাও বললেন যে, হরিহর স্থানীয় দেবতা বিরূপাক্ষের প্রতিনিধি। দৈবসম্মতির ওপর আর কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। হরিহর কার্যত যে কোনো হিন্দুরাজার

মতোই রাজত্ব করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে তাঁর মর্যাদা নিয়ে কেউ কোনো কথা তুলতে সাহস পায়নি।

বিজয়নগরের রাজারা প্রথমদিকের এই ধর্মীয় সমস্যার কথা জানতেন এবং এই কারণেই হয়তো ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে এ'রা ধর্মীয় নেতাদের সন্তুষ্ট রাখতে চাইছিলেন। বলা হয়, বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান হল দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের পুনরুত্থান। কিন্তু রাজারা পুরনো মন্দিরের সংস্কার ও নতুন মন্দির নির্মাণ করলেও সাধারণভাবে কোনো মুসলমান বিরোধী মনোভাব প্রচার করেন নি। হিন্দু রাজ্যগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কোনো মৈত্রী চুক্তি করেনি এবং বিজয়নগরের রাজারা নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করতেও কোনো দ্বিধা করেন নি। ছোট ছোট হিন্দু রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য প্রায়ই যুদ্ধযাত্রা করেছে। যেমন, ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে হোয়সল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরই বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যের প্রধান রাজ্য হয়ে দাঁড়ায়।

হাম্পির কাছে হরিহর বিজয়নগর শহরটি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। ১৩৪৩ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরই রাজ্যের রাজধানী হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের নামও হয় রাজধানীর নামানুসারে। হরিহরের রাজ্য ছিল শত্রুবেষ্টিত: অন্ধ্ররাজাদের রাজ্য, উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি এবং পরে উত্তরদিকের বাহমনী রাজ্য। উত্তরে বাহমনীদের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে স্থায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সেজন্য প্রচুর অর্থেরও দরকার ছিল। রাজস্ব আদায় বাড়াতে হল। সেজন্যে জঙ্গল কেটে নতুন নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে হল। এছাড়া ভূমিরাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি করা হল। সেচের জন্যে বড়ো বড়ো পুকুর ও নদীর ওপর বাঁধ তৈরী করা হল। একাজে যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞানেরও প্রয়োজন ছিল। বাড়তি রাজস্ব ব্যয় করে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হল। বিদেশ থেকে ঘোড়া আমদানি করা হল এবং পেশাদার তুর্কী সৈনিকদের বিজয়নগরের সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহ দেওয়া হল। রাজকীয় নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল এবং 'ফিউডাল' ধরনের খাজনা আদায়েয় ওপর তীক্ষ্ণতর নজর রাখা হল।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিরোধের উপলক্ষ ছিল রায়চুর দোয়াব। প্রতিবারের যুদ্ধের ফলাফল অনুযায়ী রাজ্যের সীমানাও পরিবর্তিত হতে লাগল। বিজয়নগর ১৩৭০ খ্রীস্টাব্দে মাদুরা জয় করে রাজ্যের দক্ষিণ-সীমান্ত সুদৃঢ় করল। কিন্তু পূর্বদিকের উড়িষ্যা ও বরঙ্গল রাজ্য দুটিকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। গোয়া জয় করে সামরিক দিক থেকে বিজয়নগরের সুবিধে হল এবং গোয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে রাজস্ব আদায়ও বেড়ে গেল। বিজয়নগর পূর্ব উপকূল অঞ্চল জয় করতে পারলে রাজ্যের সীমানা দুই-দিকে উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেত এবং কেবল উত্তরদিকের সীমানা রক্ষা করলেই প্রতিরক্ষা সমস্যা মিটে যেত। বাহমনীরাও আর দক্ষিণের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে উৎপাত করতে পারত না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাহমনীরা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক

সম্পর্কের ব্যাপারে একটি নতুন নীতি স্থির করল। অনেকটা রাজ্যের মন্ত্রী মামুদ গবনের চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হল। এতদিন রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে মালোয়া থেকে আক্রমণের যে আশঙ্কা ছিল, গুজরাটের সহায়তায় সেই আশংকার নিরসন হল। এর ঠিক পরেই গবন বিজয়নগরের হাত থেকে গোয়া কেড়ে নিলেন এবং সেখানকার বাণিজ্যের রাজস্বও বাহমনী রাজকোষে আসতে লাগল। পূর্ব-উপকূলে উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধেও বিজয়নগর সুবিধে করে উঠতে পারল না। কিছুকালের জন্যে উড়িষ্যা কাবেরী বদ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করে ফেলেছিল। এরপর সিংহাসন দখল নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেল। শেষ পর্যন্ত ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে সালুব বংশ সিংহাসন অধিকার করল।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যে বাহমনী রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক বিশৃংখলা চলছিল। গবন তা দূর করার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারালেন এবং বাহমনী রাজ্যেরও পতন ঘনিয়ে এল। বাহমনী রাজ্যের মুসলমান ওমরাহরা দুইদলে বিভক্ত ছিলেন। একদিকে ছিল 'দাক্ষিণী' অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলিম ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিদেশীরা এবং অন্যদিকে ছিল 'পরদেশী' অর্থাৎ নবাগত বিদেশী ও অস্থায়ী চাকুরীরত বিদেশীরা। দ্বিতীয় দল অনেক বেশি করিৎকর্মা ছিল এবং নানাকাজে সাফল্য অর্জন করছিল। এর ফলে প্রথম দল দ্বিতীয় দলের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। এরপর প্রথম দলের লোকেরা দ্বিতীয় দলের লোকেদের অহেতুকভাবে হত্যা করতে শুরু করল। গবনকেও 'পরদেশী' মনে করা হতো এবং তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার একমাত্র উপায় হিসেবে তাঁকেও হত্যা করা হল। ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করে প্রথম দল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করল। পরের বছর সুলতানের মৃত্যু ঘটল এবং এক নাবালক সুলতানকে ক্ষমতায় বসিয়ে প্রথম দল রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ় করে ফেলল।

দাক্ষিণী ও পরদেশী দলের এই ঝগড়া সামান্য গোষ্ঠীগত বিরোধ ছিল না, এরপর বাহমনী রাজ্যে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হল, তার ফলে রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেল। বিজয়নগরের সেনাবাহিনীর বারংবার আক্রমণের ফলে বাহমনীদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠল। এরপর ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্য ভেঙে পাঁচটি নতুন রাজ্য গঠিত হল—বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমেদনগর, বিদর ও বেরার।

বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে দিল্লীর সুলতানীর নানা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। দুই রাজ্যেরই প্রধান আয় ছিল ভূমিরাজস্ব। রাজস্বের হিসাব ও আদায় নিয়েই শাসনবিভাগ ব্যস্ত থাকত। রাজ্যটি চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা রাজস্ব আদায় করতেন ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈনিক রাজাকে সরবরাহ করতেন। শাসকর্তারা সামরিক ও অসামরিক পদে লোক নিয়োগ করারও অধিকারী ছিলেন। এর ফলে শাসনকর্তারা প্রদেশগুলিকে প্রায় নিজস্ব এলাকা বলেই মনে করতেন। ক্রমাগত যুদ্ধের জন্যে সৈনিক সরবরাহের জন্যে রাজা এইসব শাসনকর্তার ওপর নির্ভর করতেন এবং প্রাদেশিক শাসন নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। যুদ্ধের সময় চাকুরির

বদলী বা কেন্দ্রীয় পরিদর্শন ইত্যাদি বন্ধ থাকত। এইভাবেই বাহমনী রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসছিল।

মন্ত্রী গবনের মৃত্যুর পরই বাহমনী রাজ্যের পতন শুরু হল। কিন্তু বিজয়নগরের পক্ষে ওই সময়ই ছিল সবচেয়ে গৌরবের কাল। বিজয়নগরে তখন রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯—১৫৩০)। রায়চুর দোয়াব দখলের জন্যে বাহমনীরা ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে শেষবার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় তাদের তাড়িয়ে নিয়ে একেবারে বাহমনী রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। এরপরই বাহমনী বংশের রাজত্বকাল শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু কৃষ্ণদেব সুলতানকে আবার মসনদে বসিয়ে এলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সুলতান থাকলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সহজে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে না। দুর্বল বাহমনী রাজ্যের চেয়ে চারটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের সম্ভাবনা বিজয়নগরের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। বাহমনী সুলতানও বুঝলেন যে, তাঁর প্রধান খুঁটি কৃষ্ণদেব রায়। অতএব বিজয়নগর আক্রমণের আর প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে এই স্থিতাবস্থা বজায় রইল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নীতির পরিণাম ভালো হয়নি। বাহমনী রাজ্যের জায়গায় যে পাঁচটি নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তারা বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

উড়িষ্যার বিরুদ্ধে এক চমকপ্রদ সামরিক অভিযান করে কৃষ্ণদেব রায় পূর্বউপকূল জয় করে নেন, পশ্চিম-উপকূলে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুযায়ী তিনি পতুর্গীজদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখেছিলেন। ঘোড়ার ব্যবসায় পর্তুগীজদের হাতে এসে যাবার ফলে কৃষ্ণদেব রায় ঘোড়ার জন্যে পতুর্গীজ ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন; আবার বিজয়নগরের সমৃদ্ধির ওপরই দক্ষিণ-ভারতের পতুর্গীজ বাণিজ্য নির্ভরশীল ছিল। পর্তুগীজরা বারংবার গুজরাট ও বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়কেও টেনে আনবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই এতে রাজী হননি। তাঁর কাছে পতুর্গীজরা ছিল ঘোড়ার জোগানদার, তিনি তাদের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে চাননি।

উত্তর-দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য বিজয়নগর আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ এল ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে, তাদের সম্মিলিত আক্রমণে বিজয়নগর পরাজিত হল। কিন্তু এই ঘটনা তাদের অজ্ঞাতসারে পরে তাদের নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। যুদ্ধবিগ্রহে দক্ষিণ-ভারত তখন পরিশ্রান্ত। উত্তর-ভারতে নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। মোগল সম্রাটরা তখন দক্ষিণ-ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করছেন।

এইসব রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের রাজ্যগুলি নিজেদের অনিশ্চয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। মালাবার উপকূলে হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের অধীনে এরকম কয়েকটি রাজ্য ছিল। এরা বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এদের মধ্যে কালিকট রাজ্যের জামোরিন ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। তাঁরা নিজেদের কেরালার প্রাচীন পেরুমল বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন। কালিকটে বাণিজ্যপণ্য এসে জমা হতো পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া থেকে। যেমন— ইয়েমেন, পারস্য, মালদ্বীপ, সিংহল জাভা ও চীন।

পর্তুগীজরা আসবার পর উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটল। বিপরীত উপকূলের পাণ্ড্যরাজ্য তখন একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে চলছিল। অন্য রাজ্য বারবার পাণ্ড্যরাজ্য জয় করে নিত এবং আবার কিছুকাল পরে রাজ্যটি স্বাধীন হয়ে যেত। পুরনো পাণ্ড্যরাজ্যের মাদুরা অঞ্চলটির স্থানীয় শাসনকর্তা ১৩৩৪ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ১৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে মাদুরা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি প্রধানত বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বৃহৎ রাজ্যগুলি নির্ভর করত ভূমিরাজস্বের ওপর। বিজয়নগরের অর্থনীতি চলত চোলদের ধাঁচে। বাণিজ্য ও কৃষি থেকে রাজস্ব আদায় হতো। শাসনব্যবস্থার স্তরবিভাগ বেড়ে গিয়েছিল এবং চোলযুগ থেকেই অর্থনীতির সঙ্গে শাসনব্যবস্থার একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই নতুন পদ্ধতির সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে মিল ছিল। তবে বাণিজ্যের সুবিধের ফলে দক্ষিণ-ভারতে শহরের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বিশেষত উপকূল অঞ্চলে। বিজয়নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফার্নাও নুনিজ লিখেছেন :

"রাজা চিত্রা ও এর যে পদাতিক বাহিনী আছে, তার ব্যয়নির্বাহ করে অভিজাত ব্যক্তিরা। এদের ভরণপোষণ করেন হয় ৬ লক্ষ সেনা, অর্থাৎ ৬ লক্ষ সৈন্য এবং ২৪ হাজার অশ্ব। অভিজাতদের এগুলি থাকা বাধ্যতামূলক। রাজার কাছ থেকে পাওয়া সব জমিতে এঁদের অধিকার ভাড়াটিয়ার মতো; সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ ছাড়াও এঁদের জমির মূল্য দিতে হয়। রাজকীয় রাজস্ব হিসেবে রাজাকে দিতে হয় বছরে ৬০ লক্ষ টাকা। ভূমিরাজস্ব থেকে ১২০ লক্ষ টাকা আয় হয় ও ৬০ লক্ষ টাকা রাজাকে দিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্থ দিয়ে সৈনিক ও হাতির খরচ চালাতে হয়।...বিভিন্ন উৎসব, ভোজ ও মন্দিরগুলিকে রাজার অর্থদান অনুষ্ঠানের সময় ভাড়াটিয়ার মতো এইসব অভিজাত ব্যক্তিকে সবসময় রাজসভায় উপস্থিত থাকতে হয়। সবসময় রাজার পাশাপাশি থাকেন এবং রাজার সঙ্গে রাজসভায় থাকেন এমন অভিজাতের সংখ্যা দু'শোরও বেশি। এঁদের সব সময় রাজার সঙ্গে থাকতে হয়। এঁরা যদি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সৈনিক রাখেন, তাহলে তাঁদের কঠিন শাস্তি হয় ও জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এঁদের কখনো শহরে পাকাপাকিভাবে বাস করতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহলে এঁদের রাজার হাতের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এঁরা শুধু মাঝে মাঝে শহরাঞ্চলে যেতে পারেন। যেসব ছোট রাজা, রাজার অধীনস্থ তাঁরা একটা সুবিধা পান। না ডেকে পাঠালে তাঁদের রাজসভায় হাজিরা দিতে হয় না, তাঁরা তাঁদের নিজেদের শহর থেকেই খাজনা বা ভেট পাঠাতে পারেন।...ভালো কাজ পেয়ে বা ভালো কাজের প্রত্যাশায় রাজা যদি কোনো সেনাধ্যক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে চান, তাহলে তিনি কখনো কখনো তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে বিশেষ উত্তরীয় উপহার দেন। এটা বিশেষ সম্মানের। প্রতিবছর

ভূমিরাজস্ব আদায়ের সময় রাজা এই উপহার দেন। সেপ্টেম্বর মাসে এই রাজস্ব আদায় হয়। তখন নয়দিন ধরে বিরাট ভোজসভা চলে। এবং কৃষকেরা উৎপন্ন ফসলের নয়-দশমাংশ রাজস্ব হিসেবে জমিদারকে দিত। রাজ্যের যত খাজনা এই নয় দিনের মধ্যেই রাজাকে দেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে, সমস্ত জমির মালিক রাজা, তাঁর হাত থেকে পান সেনানায়করা। তাঁরা চাষের জন্য জমি দেন কৃষকদের, বিনিময়ে উৎপন্নের নয়-দশমাংশ পান। কৃষকেদের নিজস্ব কোনো জমি নেই, কারণ সমগ্র রাজ্যটাই রাজার সম্পত্তি। জমির দায়িত্ব সেনানায়কদের দেওয়া হতো, কারণ সৈন্য জোগানোর ভার ছিল তাদের হাতে।...[১]

আরেকটি প্রথা ছিল নীলাম ডেকে জমির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বিলি করা। কেবল কৃষিজমিই নয়, বাণিজ্যিক দিক থেকে মূল্যবান জমি বিলির জন্যেও নীলাম ডাকা হতো। যেমন, বিজয়নগরের নগরদ্বারের কাছে একটি স্থানে ব্যবসায়ীরা এসে জমা হতো। এ সম্পর্কে নুনিজ লিখেছেন—

"...এই নগরদ্বার দিয়েই সমস্ত পণ্য দুটি শহরে প্রবেশ করে। কেননা, বিসনগর শহরে (বিজয়নগর) প্রবেশের আর কোনো পথ নেই। সব পথ এখানে এসেই মিলেছে। এই নগরদ্বারটির বাৎসরিক ভাড়া ১২ হাজার 'পারদাও' এবং যারা ভাড়া নেয়, তাদের অর্থদান না করে কোনো স্থানীয় বা বিদেশী লোক নগরদ্বার দিয়ে ঢুকতে পারে না। শহর দুটির মধ্যে কোনো পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয় না। সমস্ত পণ্যই ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়ে বাইরে থেকে শহরে নিয়ে আসা হয়। ভারবাহী পশুর ব্যবহার এদেশে প্রচলিত। প্রতিদিন নগরদ্বার দিয়ে ২ হাজার ষাঁড় আসে, এবং প্রতিটি ষাঁড়ের জন্যে ৩ 'ভিন্টি" পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। তবে কয়েকটি শৃঙ্গহীন ষাঁড় আছে, যাদের জন্যে সারা রাজ্যে কোথাও অর্থ দিতে হয় না।..."[২]

রাজ্যে নানা ধরনের কর ছিল, সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজস্ব আদায় হতো। বাণিজ্যশুল্ক থাকা সত্বেও ভূমিরাজস্বই আদায়ের প্রধান উৎস ছিল। রাজা কৃষ্ণদেবের সময় ভূমির একটি বিস্তারিত জমি জরিপ ও মূল্যায়ণ করা হয়েছিল এবং রাজস্বের হার নির্ধারিত হয়েছিল এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশ। জমির গুণাগুণ অনুসারে রাজস্ব নির্ধারিত হল। বাণিজ্যিক রাজস্বের মধ্যে ছিল উৎপন্ন পণ্যের ওপর বিভিন্ন আদায়, শুল্ক ও কর। সব মিলিয়ে রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রচুর। এছাড়া সম্পত্তির ওপর কর থেকেও যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হতো। কৃষি ছাড়া যাদের ভিন্ন বৃত্তি ছিল, তাদের বৃত্তিকর দিতে হতো। কারখানার মালিকদের জন্যে বিশেষ কর ছিল। এছাড়া বিবাহের সময় দেয় বিশেষ কর বা মন্দিরের প্রয়োজনে নির্ধারিত কর ছিল সামাজিক কর প্রকল্পের অন্তর্গত। দুর্গ ও সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে সময়ে সময়ে সামরিক কর দিতে হতো। রাষ্ট্রের আয়ের আর একটি উৎস ছিল বিচারে নির্ধারিত জরিমানা। এছাড়া সেচের পুষ্করিণী নির্মাণ বা ওই ধরনের বিশেষ কোনো প্রকল্পের জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে হতো। গ্রামগুলি এই

যুগেও অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। স্থানীয় উৎপাদিত শস্য থেকে কিছু করতে হলে তা করতে হতো ওই অঞ্চলেই। যেমন কোনো গ্রামের উৎপন্ন আখ-মাড়াই করার জন্যে কেবল ওই গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের আখমাড়াই কলেই যেতে হতো। দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া শুধু আইনবিরুদ্ধই ছিল না, সামাজিকভাবেও অসিদ্ধ ছিল। এই মনোভাবের ব্যতিক্রম ছিল গ্রাম্য মেলা। প্রায়ই মেলা বসতো, যেখানে শুধু উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি ছাড়াও শহর ও গ্রামের লোকের মেলামেশার একটা কেন্দ্র ছিল।

তামিল অঞ্চলের গ্রামসভার ঐতিহ্য এই যুগেও 'ব্রহ্মদেয়' গ্রামগুলিতে বজায় ছিল। অন্যান্য গ্রামেও এই পরিষদগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছিল জমির প্রাপকদের কাছে। উত্তর-ভারতের মতো এখানেও রাজনৈতিক আনুগত্যের চেয়ে বর্ণগত আনুগত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল কৃষকের চেয়ে জমিদারদের গুরুত্ব বৃদ্ধি। মন্দির, মঠ ও রাজার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা ছিল জমির মালিক। কৃষিমজুর ও প্রজাস্বত্বভোগী চাষীরা (tenants) জমিচাষ করত। কৃষিমজুররা চাষের মরশুমে মজুরী পেত। তারা নামে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে পারত বটে, কিন্তু প্রতিটি গ্রামসমাজের কাঠামো সুসংবদ্ধ হওয়ায় কার্যত তা সম্ভব ছিল না। প্রজাস্বত্বভোগীরা নির্দিষ্ট হারে জমির মালিককে খাজনা দিত, তার পরিমাণ ছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ। তাদের গতিবিধিও ছিল সীমিত।

গ্রামের ঋণদান ব্যবস্থা প্রধানত মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল। তারা ব্যক্তিবিশেষকে এবং গ্রামকে ঋণ দিত। ঋণের ওপর সুদের হার ছিল ১২ থেকে ৩০ শতাংশ। ঋণের টাকা কেউ শোধ দিতে না পারলে মন্দির কর্তৃপক্ষ তার জমি বাজেয়াপ্ত করে নিত। গ্রামজীবনে মন্দিরের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরগুলি গ্রামের লোককে নানা ধরনের কাজও দিত। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরই গ্রামের অধিকাংশ জমির অধিকারী ছিল। কোনো পতিত জমি কিনে সেখানে কয়েকঘর তাঁতীকে বসিয়ে দেওয়া বা সেচের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া ইত্যাদি গ্রামোন্নয়নের কাজে মন্দির কর্তৃপক্ষ আগ্রহ দেখাতো। এইভাবে মন্দিরেরও আয়বৃদ্ধি হতো। অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে মন্দিরগুলি স্বাভাবিকভাবে একেকটি অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল! এই-ভাবে রাজা ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল।

গ্রাম বা শহরের কারিগরদের মর্যাদা চোলযুগ থেকে এইযুগে মোটামুটি অপরি-বর্তিত ছিল। ছুতোর, স্বর্ণকার ও কামারদের মর্যাদা বেশি ছিল। তাঁতী ও কুমার ইত্যাদি পেশার লোকেরা সমাজের পক্ষে অপরিহার্য হলেও অতটা মর্যাদার অধিকারী ছিল না। কারিগরদের নিজস্ব সমবায় সংঘ ছিল। কিন্তু সংঘগুলি ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘের জন্যেই কাজ করত। চোলযুগের মতো এই যুগেও ব্যবসায়ীদের সংঘ-গুলি কারিগরদের সংঘের চেয়ে অনেক বড় পরিধিতে কাজকর্ম করত। ব্যবসায়ীরা কারিগরদের অর্থসাহায্য করত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিত। এর ফলে কারিগরদের স্বাধীনতা সীমিত ছিল। দেশের মধ্যে বাণিজ্য ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। আরব বণিকরা দেশের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করত। ভারতীয় ব্যবসায়ী-

রাও এইযুগের শেষদিকে দূরে দূরে ব্যবসা করতে শুরু করল। অবশ্য উপকূল অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাই এতটা উদ্যোগী ছিল।

অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্যে ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগুলি দেশে রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রাজসভাতেও তাদের প্রভাব ছিল এবং করনীতি স্থির করার সময় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজকর্মচারীরা পরামর্শ করত। ক্রমশ ব্যবসায়ীরাই জনমতের প্রতিনিধি হয়ে উঠল। রাজসভায় জমিদার ও রাজকর্মচারীদের এতদিন একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। এবার ব্যবসায়ীরা আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী হয়ে উঠল। মহীশূর, অন্ধ্র ও মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'চেট্টিরা' বেশি উল্লেখযোগ্য। চোলযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই 'চেট্টি'রা ব্যবসায়ী হিসেবে সুপরিচিত। এদের কেউ কেউ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে গিয়ে পারিবারিক ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে যে প্রচুর আয়ের সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে রাষ্ট্র ভালোভাবেই অবগত ছিল। কৃষ্ণদেব রায় তাঁর তেলুগু কবিতা 'অমুক্তমাল্যদ'-তে এ সম্পর্ক লিখে গেছেন—

"রাজা রাজ্যের বন্দরগুলির উন্নতিসাধন করবেন। তার ফলে ঘোড়া, হাতি, দামী পাথর, চন্দনকাঠ, মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য তাঁর রাজ্যে অবাধে আমদানি হতে পারবে। ঝড়, অসুস্থতা বা শ্রান্তির জন্যে যেসব বিদেশী নাবিকরা রাজ্যের বন্দরে আশ্রয় নিতে আসে, তাদের প্রতি রাজ্যকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নাবিকরা যেন নিজের দেশের মতোই যত্ন পায়।···যেসব বিদেশী বণিক বিদেশ থেকেও হাতি ও ঘোড়া আমদানি করে, তাদের রোজ দর্শন দিলে তারা খুশি থাকবে। তাদের উপহার দিতে হবে এবং ভালোরকম লাভ করারও সুযোগ দিতে হবে। তাহলে আর এইসব সামগ্রী কখনো শত্রুর রাজ্যে চলে যাবে না।···"[৩]

বাণিজ্য হাতছাড়া হয়ে শত্রুরাজ্যগুলির হাতে চলে যাবার ভয় বিজয়নগর রাজ্যের ছিল। এই কারণেই তারা পর্তুগীজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল। বিদেশী বণিকদের নানারকম সুবিধে দেওয়া হতো এবং আমদানি করা সামগ্রীর ওপর শুল্কের হার চড়া ছিল না। দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্যের ওপর শতকরা আড়াই থেকে ৫ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হতো। বিদেশী কাপড় ও তেলের ওপর শুল্কের হার ছিল বেশি (১০ ও ১৫ শতাংশ), কেননা এই দুটি জিনিসের আমদানিতে রাজ্যের কিছুটা অনিচ্ছা ছিল। মালাবার উপকূলের ছোট ছোট রাজ্যগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশকিছু অর্থ নিজেরাই ভোগ করত। কেননা, তাদের রাজ্যেই সামগ্রীগুলি প্রথম আসত এবং তারাই শুল্ক বসানোর সুযোগ পেত। যখন রাজ্যে সমৃদ্ধি ছিল, বিজয়নগরের পক্ষে এই ক্ষতি মেনে নিতে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু অন্য সময়ে ছোট রাজ্যগুলি বিজয়নগরের বৈদেশিক বাণিজ্যের আয় অনেকটাই কমিয়ে দিত।

বিজয়নগরের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল—স্বর্ণ' রৌপ্যপিণ্ড, পেগু ও সিংহল থেকে হাতি (বাহমনীরা উত্তর-ভারত থেকে হাতি আমদানি করতে বাধা দিত) এবং ঘোড়া। আগে আরব বণিকরাই ঘোড়া সরবরাহ করত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে

পর্তুগীজরা আরব বন্দরগুলি দখল করে নিল। এই বন্দরগুলি থেকে ঘোড়া চালান হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা আসত। ভারি কাপড় যেমন মখমল, সাটিন ও বুটিদার কাপড় আসত জিডা, এডেন ও চীন থেকে। বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করা হতো প্রধানত পারস্য, আফ্রিকা, চীন ও সিংহলে। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে ছিল চাল, চিনি, নারকেল, জোয়ার, ভুট্টা, রং (হেনা, নীল, হিঙ্গুল, আমলকি), মরিচ, আদা, চন্দনকাঠ, সেগুনকাঠ, দারুচিনি, লবঙ্গ, সুতীবস্ত্র ও ছাপা কাপড়।

মালবহনে ভারতীয় জাহাজের ব্যবহার কমে এলেও মালদ্বীপে তখনো দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার জন্যে কিছু বড় বড় জাহাজ তৈরী হতো। কন্টির মতে, ভারতীয় জাহাজ ইটালীর জাহাজের চেয়ে বড় ও চীনা জাহাজের চেয়ে ছোট ছিল। ভারতীয় বন্দরে যত দেশের জাহাজ আসত, তার মধ্যে চীনা জাহাজ ছিল শ্রেষ্ঠ। বিপদসংকুল সমুদ্রে দীর্ঘযাত্রার উপযোগী করে চীনা জাহাজগুলি নির্মিত ছিল। জাহাজভ্রমণ খুব আনন্দদায়ক ছিল না। জাহাজের গতি ছিল দিনে ৪০ মাইল। এবং উপকূল অঞ্চলের বন্দরে ঘন ঘন আসতে হতো। কালিকট থেকে সিংহলে পৌঁছতে ১৫ দিন লেগে যেত। পূর্ব ও পশ্চিমদিক থেকে আসা জাহাজগুলি কালিকট, এলি ও কুইলন বন্দরগুলিতেই বেশি যেত। বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় প্রথার পরিবর্তে মুদ্রার ব্যবহারই বেশি প্রয়োজন হতো। বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতে টাঁকশাল ছিল। মুদ্রাগুলি যত্ন করে নির্মিত হতো এবং তার ওপর কানাড়া ও নাগরী লিপিতে লেখা থাকত। দেশী মুদ্রা ছাড়াও পর্তুগীজদের 'ক্রুজাদো', পারসীদের 'দীনার' এবং ইটালীয়দের 'ফ্লোরিন' ও 'ডুকাট' মুদ্রাও উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

অভিজাত শ্রেণীর আর্থিক সাচ্ছল্য সত্বেও সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো গতিশীলতা আসেনি। সাহিত্য ও শিল্পকলায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন নেই, চিন্তা-ধারাতেও সজীবতার অভাব লক্ষিত হয়। শিল্পীরা রক্ষণশীলমনোভাবে পুরাতন রীতিকে আঁকড়ে ছিল—তার ফলে কল্পনার দৈন্য ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির দিকে অত্যধিক মনোযোগ, সে যুগের শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা স্থাপত্যে সহজেই নজরে পড়ে।

সমগ্র বিজয়নগর শহরটি এইযুগে নির্মিত হয়েছিল। সেখানে মন্দিরের প্রাচুর্য, কিন্তু তার যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে তাতে বোঝা যায় যে, বাহ্যিক অলংকরণের বাহুল্যই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাথরের বদলে ইটের ব্যবহার বাড়ছিল। ইটের ওপর চুণ ও বালির প্রলেপ লাগানোর ফলে অলংকরণের সুবিধে হতো। প্রতিটি স্তম্ভ মূর্তি দিয়ে অলংকৃত হতো। মন্দিরে উপাসনার নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মন্দিরের কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির নির্মাণ করতে হতো। মন্দিরের স্থাপত্যে 'গোপুরম্' বা মন্দির-তোরণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল। বড় বড় মন্দিরগুলির সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দেব-দেবীদের বিবাহ উৎসব ধুমধাম করে পালন করা হতো। এই প্রাঙ্গণকে বলা হতো 'কল্যাণমণ্ডপম্'। এই যুগেই এখান থেকে উত্তরে গোলকোণ্ডার যে গোল গম্বুজটি নির্মিত হয়, সেটি বাস্তুবিদ্যার চূড়ান্ত

নিদর্শন। অথচ এর কোনো প্রভাব বিজয়নগরের ওপর পড়েনি।

বলা হতো যে, বিজয়নগরের রাজারা এক শৈবদেবতা বিরূপাক্ষের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করেন। এইভাবে উপদ্বীপ অঞ্চলে শৈব মতবাদের জনপ্রিয়তা রাজকীয় সমর্থন লাভ করল। এতদিনে ভক্তি মতবাদ হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। তবে, ভক্তি-আন্দোলনের কেন্দ্র দক্ষিণ-ভারত থেকে মহীশূরে এবং আরো উত্তরে ও পশ্চিমে মহারাষ্ট্রে সরে গিয়েছিল। মারাঠী সাধুদের মধ্যে জ্ঞানদেবই প্রথম মারাঠীভাষায় গীতা আবৃত্তি করেছিলেন। এরপর ১৪শ শতকে এলেন নামদেব। তিনি মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অন্যান্য মারাঠী সাধুদের চেয়ে নামদেবের ভক্তদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তাঁর বাণী ছিল বেশি সংস্কারপন্থী এবং নানক ও কবীরের সঙ্গে তাঁর মতামতের মিল আছে। রাজা কৃষ্ণদেব যখন মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদী সাধকদের প্রিয়দেবতা বিঠোবার পূজা করেন, তখন তাঁর রাজ্যে বৈষ্ণবধর্মের দক্ষিণ-ভারতে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আরো দৃঢ় হয়। ততদিনে তামিল, তেলেগু, কানাড়া এবং মারাঠী ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষাগুলি পরিশীলিত ও বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল। তামিল ভিন্ন অন্যান্য ভাষাগুলিতে অবশ্য প্রধান সাহিত্য ছিল সংস্কৃতের অনুবাদ। বিশেষত মহাকাব্য ও পুরাণগুলির অবলম্বনে লিখিত রচনা। ভক্তি-আন্দোলনের প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলি সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠলো। উত্তর-দাক্ষিণাত্যে বাহমনীরা ফারসী ও আরবীভাষা ব্যবহার করার ফলে, অবাধভাবে বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে সুলতানীর সম্পর্ক নিকটতর ছিল। মালাবার-অঞ্চলে মালয়ালম ভাষা বিশেষ মর্যাদা পেলো। তামিলভাষা থেকেই মালয়ালম ভাষার জন্ম। কিন্তু তামিলনাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দূরত্ব ও বিদেশীভাষার প্রভাবে মালয়ালম ভাষার ভিন্নমুখী বিকাশ হয়।

উত্তর-ভারতের মতো দক্ষিণ-ভারতেও সংস্কৃত ছিল সমাজের অল্প সংখ্যক লোকের জ্ঞানচর্চার ভাষা। সংস্কৃতে হোয়সল ও বিজয়নগরের রাজবংশের ইতিহাস ও রাজাদের জীবনচরিত লেখার জন্যে রাজসভা থেকে উৎসাহ দেওয়া হতো। বেদের ওপর সায়ণ যে ভাষ্য লিখেছিলেন, তার মতো আর জ্ঞানীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। হেমাদ্রি 'ধর্মশাস্ত্রের' ওপর ভাষ্যরচনায় জীবনের অধিকাংশ ব্যয় করেছিলেন এবং তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় পণ্ডিতদের রচিত ভাষ্যের মিল আছে। অবশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিবিধানে এসব রচনার কোনো অবদান ছিল না।

সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজয়নগর দক্ষিণ-ভারতে জড়তার যুগ। দেশী ও বিদেশী বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থাগম হয়েছে এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীগুলি বিলাসের না হলেও মোটামুটি সাচ্ছল্যের মধ্যেই দিন কাটিয়েছে। ইসলামী প্রভাব-আত্মীভূত হয়েছে নিঃশব্দে এবং তথাকথিত হিন্দু 'পুনরুত্থানের ফলে' সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্য কোনো নাটকীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়নি। এইযুগে সত্যিই কোনো সচেতন হিন্দু পুনরুত্থান ঘটেছিল কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। বরং বলা যায় যে, এইযুগে বড়ো হিন্দুরাজ্য ছিল কেবল বিজয়নগর এবং তার ফলে ওই রাজ্যের হিন্দু মন্দির ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলি রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল। উত্তরে মেবার ও মাড়োয়ারের হিন্দু রাজপুত রাজ্য

দুটিতেও এই ঘটনা ঘটেছিল কিছুটা ছোট আকারে। সত্যিই যদি কোনো হিন্দু পুনরুত্থান ঘটত, অন্তত ধর্মীয় ক্ষেত্রে, তার কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু বিজয়নগরের সংস্কৃতিতে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

উপদ্বীপ অঞ্চলের ইতিহাসে বিজয়নগরের গুরুত্ব এই যে, উত্তর-ভারতের কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজয়নগরেও একটা কাঠামোর ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। এ ঘটনা পুরো আকস্মিকও নয়, কিংবা ইচ্ছাকৃতও নয়। দুই অঞ্চলের ঘটনায় ক্রমবিকাশের এই যে সাদৃশ্য, তার কারণ হলো উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতিতে একই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক বিন্যাস লক্ষিত হয়।

একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশের ফলে স্থানীয় আনুগত্য গড়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের মনোভাব দেখা দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যসূত্র নিশ্চিতভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলা ভাষাভাষীরা কানাড়া ভাষার কথা বুঝতে পারত না। কিন্তু যে ঘটনাপ্রবাহে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশ হয়েছিল, তা সব জায়গাতেই এক ছিল। ভক্তি আন্দোলনের ফলস্বরূপ যেসব সামাজিক শক্তি উজ্জীবিত হয়েছিল তা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে একইভাবে কাজ করে; যদিও সামাজিক প্রতিবাদ হিসেবে ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব দক্ষিণ-ভারতে উত্তরের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শঙ্কর ও রামানুজের শিক্ষা ও বাণী একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত ভারতকে ঐক্যীভূত করেছিল একই ধরনের বিশ্বাসকে সারাদেশে প্রসারিত করে। সারা ভারতের পুণ্যার্থী হিন্দুরা সাতটি পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করতে যেত। তীর্থগুলির মধ্যে একদিকে ছিল হিমালয়ের বদ্রীনাথ এবং অন্যদিকে ছিল সুদূর দা ক্ষণাত্যের রামেশ্বরম। উপকূল বাণিজ্যের ফলে ব্যবসায়ীরা দেশের নানা অঞ্চলে যেতে পারত। গুজরাটের ব্যবসায়ীরা মালাবারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে গেছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র ভারতে এইসময় একটা সাম্য-সাদৃশ্য দেখা যায়। এ ছিল ভবিষ্যতে ভারতব্যাপী রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছিল। স্থলপথে এলো মুঘলরা। তারা উত্তর-ভারতে রাজ্য গড়ে তুলতে শুরু করল। সমুদ্রপথে এসেছিল পর্তুগীজরা এবং তারা দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতে বসবাস শুরু করল। মুঘল ও পর্তুগীজরা দুইভাবে ভারতের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন ঘটালো। পর্তুগীজরা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে মুঘলদের ছিল ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা। পর্তুগীজরা সফল না হলেও মুঘলরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিল এবং পর্তুগীজ ও মুঘলদের এই ব্যর্থতা ও সাফল্যের নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা হল।

কালানুক্রমিক সারণী

প্রাচীন ভারতের ঘটনাবলীর সঠিক কালক্রম নির্ধারণের অন্যতম অসুবিধে হল, বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন সংবতের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্নতা। প্রথম যুগের বড় বড় রাজবংশগুলি নিজস্ব রীতিতে সময় গণনা করত। বিভিন্ন সংবতের পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর মধ্যে প্রধান সংবতগুলি হল— বিক্রমাব্দ (৫৮-৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), শকাব্দ (৭৮ খ্রীস্টাব্দ), ও গুপ্তাব্দ (৩১৯-২০ খ্রীস্টাব্দ)। বিভিন্ন প্রত্নলেখ ও পুঁথিপত্রের সাহায্যে এই অব্দগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেছে। বৌদ্ধসূত্রে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময় থেকে বছর গোনা হয়। কিন্তু মৃত্যুর তিনটি তারিখ প্রচলিত— ৫৪৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, ৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ও ৪৮৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। অবশ্য শেষের দুটি তারিখই বেশি প্রচলিত। তবুও তিন বছরের পার্থক্য থেকেই যায়। বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে কখনো কখনো সাহায্য পাওয়া গেছে, কেননা তাঁদের উল্লিখিত তারিখের সঙ্গে অন্যসূত্রে পাওয়া তারিখ মিলিয়ে নেওয়া গেছে। দশম শতাব্দীর পর থেকে সময়ের হিসেব রাখা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ এসময় প্রত্যেক আঞ্চলিক রাজ্য নিজস্ব রীতিতে কালগণনা শুরু করে দিয়েছিল। তবে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে তুর্কী শাসকরা এবং তাদের পরবর্তী রাজারা সকলেই নিয়মিতভাবে প্রচলিত ইসলামী সংবৎ (হিজরি— ৬২২ খ্রীস্টাব্দ) ব্যবহার করত।

খ্রীস্টপূর্বাব্দ ॥ প্রায় ২৫০০ — হরপ্পা সভ্যতা।
প্রায় ১৫০০ — ভারতে 'আর্যদের' আগমন।
প্রায় ৮০০ — লোহার ব্যবহার শুরু। আর্য-সংস্কৃতির বিস্তার।
প্রায় ৬০০ — মগধের উত্থান।
প্রায় ৫১৯ — পারস্যের অ্যাকিমিনিড সম্রাট সাইরাসের উত্তর পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অংশ জয়।
৪৯৩ — মগধের রাজা অজাতশত্রুর সিংহাসনারোহণ।
৪৮৬ — বুদ্ধদেবের মৃত্যু।
প্রায় ৪৬৮ — জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের মৃত্যু।
৩৬২-২১— নন্দ রাজবংশ।
৩২৭-৫ — ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।
৩২১ —মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ।
প্রায় ৩১৫ — মেগাস্থিনিসের ভারত আগমন।
২৬৮-৩১— অশোকের রাজত্বকাল।
প্রায় ২৫০ — পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসভার অধিবেশন।

১৮৫ — মৌর্যদের পতন। মগধে শুঙ্গবংশীয় রাজার সিংহাসনারোহণ।

১৮০-৬৫ — উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইন্দো-গ্রীক রাজা দ্বিতীয়-ডিমেট্রিয়াসের রাজত্বকাল।

১৫৫-৩০ — উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইন্দো-গ্রীক রাজা মিনান্দারের রাজত্বকাল।

১২৮-১০ — সাতকর্ণির নেতৃত্বে সাতবাহন বংশের উত্থান।

প্রায় ৮০ — পশ্চিম-ভারতে প্রথম শকরাজা মোয়েস।

প্রায় ৫০ — কলিঙ্গের রাজা খারবেল।

খ্রীস্টাব্দ ॥ প্রায় ৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে

১০০ খ্রীস্টাব্দ — দক্ষিণ-ভারতে রোমক বাণিজ্য।

প্রায় ৫০ — ভারতে সেণ্ট টমাসের আগমন ?

প্রায় ৭৮ — উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণরাজা কণিষ্কের রাজ্যারোহণ।

১৫০ — পশ্চিম-ভারতে শকরাজা রুদ্রদামনের শাসন।

৮৬-১১৪ — সাতবাহন রাজ্যে গৌতমীপুত্রের শাসনকাল।

১১৪-২১ — সাতবাহন রাজ্যে বাশিষ্ঠীপুত্রের রাজত্বকাল।

৩১৯-২০ — প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক ও গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা।

৩৩৫ — সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ।

৩৭৫-৪১৫ — দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

৪০৫-১১ — ফা-হিয়েন-এর ভারত ভ্রমণ।

৪৭৬ — জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের জন্ম।

৫০৫ — জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের জন্ম।

প্রায় ৫০০ — উত্তর-পশ্চিম ভারত হূণ কবলিত।

৬০৬-৪৭ — কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন।

৬৩০-৪৪ — হিউয়েন-সাঙ্-এর ভারত ভ্রমণ।

৬০০-৩০ — প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের নেতৃত্বে পল্লব শক্তির প্রতিষ্ঠা।

৬০৮-৪২ — দ্বিতীয় পুলকেশীর নেতৃত্বে চালুক্য শক্তির প্রতিষ্ঠা।

প্রায় ৬২০ — দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হর্ষবর্ধনের পরাজয়।

৬৪২ — পল্লবরাজা নরসিংহবর্মনের কাছে দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাজয়।

৭১২ — আরবদের সিন্ধু অধিকার।

৭৩৬ — ধিল্লিক শহর (দিল্লীর আদি শহর) প্রতিষ্ঠা।

৭৪০ — চালুক্যদের কাছে পল্লবদের পরাজয়।

প্রায় ৭৫০ —পূর্ব-ভারতে গোপাল-এর পালবংশ প্রতিষ্ঠা।
প্রায় ৭৫৩ —রাষ্ট্রকূটদের কাছে চালুক্যদের পরাজয়।
প্রায় ৮০০ —দার্শনিক শঙ্করাচার্য।
৮১৪-৮০ —রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল।
প্রায় ৮৪০ —রাজা ভোজের নেতৃত্বে প্রতিহারদের উত্থান।
প্রায় ৯০৭ —দক্ষিণ-ভারতে প্রথম পরান্তকের নেতৃত্বে চোল কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা।
৯৮৫-১০১৪ —প্রথম রাজারাজের নেতৃত্বে চোলদের রাজ্যবিস্তার।
৯৯৭-১০৩০ —গজনীর মামুদের উত্তর-ভারত অভিযান।
১০২৩ —রাজেন্দ্র চোলের উত্তর-ভারত অভিযান।
১০৩০ —ভারতে আলবেরুণী।
প্রায় ১০৫০ —দার্শনিক রামানুজ।
১০৭৭ —চীনদেশে চোল বণিক প্রতিনিধিদল।
১১১০ —বিষ্ণুবর্ধন ও হোয়সল শক্তির উত্থান।
১১৯২ —তরাইন-এর যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়।
১২০৬ —কুতুবুদ্দীন আইবকের নেতৃত্বে দাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।
১২১১-২৭ —ইলতুতমিসের রাজত্বকাল।
১২৬৬ —বলবনের রাজত্বকাল।
১২৮৮-১২৯৩ —দক্ষিণ-ভারতে মার্কোপোলোর আগমন।
১২৯৬-১৩১৬ —আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল।
১৩০২-১১ —দক্ষিণ-ভারতে মালিক কাফুরের অভিযান।
১৩২৫-৫১ —মহম্মদ-বিন তুঘলকের রাজত্বকাল; ভারতে ইবন-বতুতা।
১৩৩৬ —বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৪৭ —বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৫৭ —ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসনারোহণ।
১৪১৪-৫০ —দিল্লীতে সৈয়দদের শাসনকাল।
১৪১১-৪১ —গুজরাটের আহমদশাহের শাসনকাল।
১৪২১-১৪৩১ —বাংলাদেশে চেঙ্-হোর আগমন।
১৪৫১ —দিল্লীতে বাহলুল লোদীর সিংহাসনারোহণ।
১৪৪০-১৫১৮ —ভক্তি আন্দোলনের নেতা কবীর।
১৪৬৯-১৫৩৯ —ভক্তি আন্দোলনের নেতা নানক।
১৪৮৫-১৫৩৩ —ভক্তি আন্দোলনের নেতা চৈতন্য।
১৪৮১ —মামুদ গবনের হত্যা।

১৪৯৮ —পোর্তুগীজদের ভারত আগমন।

১৫০৯ —মেবারে রাণা সঙ্গের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান।

১৫০৯-৩০ —বিজয়নগরে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকাল।

১৫২৬ —পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ।

শব্দার্থ

মূল ইংরেজি গ্রন্থের Glossary-র বানান ও উচ্চারণ-সম্পর্কিত ভূমিকা এবং পরিচিত অনেক ভারতীয় শব্দ বাংলা অনুবাদে অপ্রয়োজনীয় বোধে বর্জন করা হয়েছে। শব্দ বর্ণানুক্রমিক ইংরেজি অনুসারী। অনুবাদক।

অদ্বৈত		একটি দার্শনিক মতবাদ
অগ্রহার	—	ব্রাহ্মণদের দত্ত রাজকীয় ভূমি বা গ্রাম।
অগ্নিকুল	—	কোনো কোনো রাজপুত গোষ্ঠী নিজেদের অগ্নিবংশোদ্ভূত বলে দাবি করে।
আজীবিক	—	বুদ্ধদেবের সমকালীন একটি প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী সম্প্রদায়।
আলবার	—	তামিল ভক্তিবাদের অনুসারী বৈষ্ণব কীর্তনীয়া।
অমাত্য	—	গুপ্তযুগের অসামরিক শাসনকর্তার পদের নাম।
আরণ্যক	—	বৈদিক শাস্ত্র, অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদের দ্বারা রচিত।
আয়ুক্ত	—	একটি রাজপদের নাম, মৌর্যযুগে প্রায়শই উল্লিখিত।
বনজারা	—	ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদল।
ভারতনাট্যম		নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা ভারতের নামানুসারে এক প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতি।
ভোগ্‌তা		যে ভোগ করে; যারা বিশেষ বিশেষ জমির ওপর রাজস্ব আদায়ের অধিকার ভোগ করত, তাদের এই আখ্যা দেওয়া হতো।
ভুক্তি		রাজ্যের একটি শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল।
বোধিসত্ত্ব		যিনি জগতের মঙ্গলের জন্যে কাজ করেন ও নিজের ইচ্ছানুসারে পুনর্জন্মের আবর্তন থেকে মুক্তি স্থগিত রাখেন। ইহজীবন লাভের আগে বুদ্ধের অবতাররূপ।
ব্রহ্মদেয়	—	দান করা জমি থেকে বা গ্রামবাসীর কাছে পাওয়া ব্রাহ্মণের রাজস্ব।
ব্রাহ্মী	—	পাঠোদ্ধার করা ভারতের প্রাচীনতম লিপি।
চৈত্য	—	পবিত্র ঘেরা জমি। শব্দটি পরে বৌদ্ধ উপাসনা-স্থল বলতে ব্যবহৃত হতো।
চার্বাক	—	বুদ্ধদেবের সমসাময়িক একটি প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী সম্প্রদায়; জড়বাদী দর্শনের সমর্থক।
চৌধুরী	—	গ্রামপর্যায়ের রাজকর্মচারী।
চেট্টি, চেট্টিয়ার	—	ব্যবসায়ী।
দিগম্বর	—	একটি জৈন সম্প্রদায়।

দেবদান — মন্দিরে দান করা রাজস্ব।
এরিপট্টি — দক্ষিণ-ভারতে সেচের পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিশেষ জমির রাজস্ব।
হীনযান — দুই প্রধান বৌদ্ধগোষ্ঠীর অন্যতম।
ইমাম — মসজিদে যিনি প্রার্থনা পরিচালনা করেন।
ইক্‌তা — কোনো জমি বা গ্রামের রাজস্বদান।
জিজিয়া — মুসলিম শাসকের অধীনস্থ অ-মুসলমান প্রজাদের দেয় কর
জিতল — একটি মাপ।
কাহাপন — সোনা, রূপো বা তামার মুদ্রা। সাধারণত ৫৭.৮ গ্রেন ওজনের রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হতো।
কাকিনী — তাম্রমুদ্রা ২.২৫ গ্রেন ওজন।
কালামুখ — একটি শৈব উপাসক সম্প্রদায়।
খালসা — ('পবিত্র') রাজার নিজস্ব জমি।
খরোষ্ঠী — উত্তর-ভারতীয় একটি লিপি, অ্যারামাইক লিপি থেকে উদ্ভূত।
ক্ষত্রি — মধ্যযুগীয় একটি উপবর্গ।
কোট্টম — একটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগ।
কুমারামাত্য — একটি রাজপদ।
কুর্‌রম — একটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগ।
মহাক্ষত্রপ — খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলিতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসকদের উপাধি।
মহাসম্মত — রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বৌদ্ধ সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব অনুসারে নির্বাচিত শাসক।
মহাযান — বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান গোষ্ঠীর একটি।
মণ্ডল — আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের যে মতবাদ অনুসারে কোনো রাজ্যের একটি প্রতিবেশী বন্ধু ও অপর প্রতিবেশী শত্রু।
মণ্ডলম — শাসনতান্ত্রিক বিভাগ।
মণিগ্রামম — বণিকদের সমবায় সংঘ।
মাৎস্যন্যায় — যে রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে।
মীমাংসা — প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রধান ছয়টি বিভাগের একটি।
মোহর — সুলতানী আমলের মুদ্রা।
মুয়েজ্জিন — মসজিদে দিনে পাঁচবার প্রার্থনার জন্যে যে ব্যক্তি মুসলিম-দের আহ্বান করেন।
মুন্সেফ — সুলতানী আমলের একটি সরকারী পদ।
মুক্তি — রাজস্বের অংশ যিনি ভোগ করেন, বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা

নাড়ু — শাসনতান্ত্রিক বিভাগ।
নাগর — মধ্য ও উত্তর-ভারতের স্থাপত্য রীতির নাম।
নগরম — শহরাঞ্চলের স্থানীয় পরিষদগুলির নাম।
নানাদেশী — একটি ক্ষমতাশালী বণিক সমবায় সংঘ।
নয়নার — তামিল ভক্তি মতবাদের শৈব কীর্তনীয়া।
নিষ্ক — প্রাচীনযুগের মুদ্রামূল্যের নাম ও পরবর্তীযুগের মুদ্রার নাম।
ন্যায় — প্রাচীন ভারতের ছয়টি দার্শনিক মতবাদের একটি।
পণ — একটি মুদ্রা। অনেক সময় 'কার্ষাপণ' মুদ্রাকেও বলা হতো।
পঞ্চকুল — পাঁচটি কুল বা পরিবারের প্রতিনিধিবর্গ।
পাশুপত — একটি শৈব সম্প্রদায়।
পাটোয়ারী — গ্রামপর্যায়ের কর্মচারী।
পীর — বিশেষ ধরনের ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি এবং সূফী মতবাদীদের সমপর্যায়ভুক্ত।
কাজী — মুসলিম আইনজ্ঞ।
কোরান — মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।
রাজগুরু — রাজকীয় পুরোহিত।
রাজসূয় — রাজাদের বিশেষ ধরনের যজ্ঞ।
রাজুক — মৌর্যযুগের এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর নাম।
রাণক — সামন্তপ্রভু।
রাষ্ট্র — দেশ বা শাসনতান্ত্রিক বিভাগ।
রত্নিন — রত্ন; বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট দ্বাদশ ব্যক্তিদের একজন।
সাংখ্য — প্রাচীন ভারতের ছয়টি প্রধান দর্শনের অন্যতম।
সন্ন্যাসী — সংসার-ত্যাগী।
সতী — যে নারী মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেন।
শেখ — অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান বা ধর্মীয় গুরু।
সঙ্গম — প্রাচীন তামিল সাহিত্য।
শরিয়া — ইসলামী আকরগ্রন্থ।
শতমান — এক ধরনের মুদ্রা, যার রৌপ্যমুদ্রার ওজন ১০৮ গ্রেন।
শিখর — মন্দিরের সর্বোচ্চ স্তম্ভ।
শ্রেণী — বণিকদের সমবায় সংঘ।
সোম — যে লতা থেকে মাদক সোমরস তৈরি হতো এবং বৈদিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতো।
স্তূপ — বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধধর্মের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দেহাবশেষের ওপর নির্মিত বিশেষ গৃহ।
টঙ্কা — সুলতানী যুগের মুদ্রা।

তানিয়ুর	—	শাসনতান্ত্রিক বিভাগ।
তান্ত্রিক	—	একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী।
ঠাকুর	—	সামন্তপ্রভু।
থেরবাদ	—	বৌদ্ধ গোষ্ঠী।
উলেমা	—	মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক।
উপনিষদ	—	বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয়বাদী গ্রন্থ।
উর	—	গ্রাম পরিষদ।
বৈশ্য	—	হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণের তৃতীয় বর্ণ।
বর্ণ	—	জাত।
বিহার	—	বৌদ্ধ মঠ।
যবন	—	ভারতীয় সূত্রে পশ্চিম-এশিয়ার লোকদের এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
যোগ	—	প্রাচীন ভারতের ছয়টি প্রধান দর্শনের একটি।
জেনানা	—	বাড়ির যে অংশ মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে।

উদ্‌ধৃতিগুলির উৎস

প্রথম অধ্যায়

১. ভি. স্মিথ, আর্লি হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া (১৯২৪)। পৃ. ৪৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. ঋগ্বেদ, দশম, ৯০। অনুবাদ : এ. এ. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া। পৃ ২৪০-৪১

২. ঋগ্বেদ, দশম, ১২৯। অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া। পৃ. ২৪৭-৪৮

৩. ছান্দোগ্যোপনিষদ, ষষ্ঠ, ১৩। অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া। পৃ. ২৫০-৫১

তৃতীয় অধ্যায়

১. টেসিয়াস-এর উক্তি উদ্‌ধৃত হয়েছে পসেনিয়াস্-এ নবম, ২১। অনুবাদ : জে. ডবলিউ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল, এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড ইন ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচার। ওয়েস্টমিনস্টার, ১৯০১

২. নিয়ারকাস-এর এই উক্তি উদ্‌ধৃত হয়েছে আরিয়ান-এ, ইণ্ডিকা, ১৬। অনুবাদ জে. ডবলিউ. ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল, এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড বাই মেগাস্থিনিস অ্যাণ্ড আরিয়ান। লণ্ডন, ১৮৭৭

৩. স্ট্র্যাবো, জিওগ্রাফি। অনুবাদ : এইচ. এল. জোনস, দি জিওগ্রাফি অব স্ট্র্যাবো। হারভার্ড

৪. দিঘনিকায়, প্রথম, ৫৫। অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া। পৃ. ২৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

১. রক এডিক্‌ট, ত্রয়োদশ। অনুবাদ : আর থাপার : অশোক অ্যাণ্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌর্যস। পৃ. ২৫৫

২. নক্‌শী-ই-রুস্তম ইন্‌সক্রিপশন। অনুবাদ : আর. গিরশম্যান। ইরান, পৃ. ১৫৩

৩. রক এডিক্‌ট, তৃতীয়। অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক অ্যাণ্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌর্যস। পৃ. ২৫৫

৪. উদ্‌ধৃত আছে ডিওডোরাস-এ, দুই, ৪১। অনুবাদ : জে. ডবলিউ ম্যাকক্রিণ্ডল, এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড ইন ক্লাসিক্যাল লিটারেচার। ওয়েস্টমিনস্টার, ১৯০১

৫. রক এডিক্‌ট, দ্বাদশ। অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক অ্যাণ্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌর্যস। পৃ. ২৫৫
৬. পিলার এডিক্‌ট, সপ্তম। অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক অ্যাণ্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌর্যস। পৃ. ২৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

১. রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপি। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, অষ্টম। পৃ. ৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. নাসিকের গুহালিপি, নং ১০। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, অষ্টম। পৃ. ৭৮

সপ্তম অধ্যায়

১. বাণ, হর্ষচরিত। অনুবাদ : কাওয়েল। পৃ. ১০১

অষ্টম অধ্যায়

১. নন্দিবর্মনের কাসাকুদি প্লেট, সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্ক্রিপশনস : দ্বিতীয়, ৩। পৃ. ৩৬০
২. পট্টুপাট্টু, তিরুমুরুগনারুপাডাই, ২৮৫-৯০। অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া। পৃ. ৩৩০
৩. কিংসবেরি অ্যাণ্ড ফিলিপস, হিম্‌স অফ দি তামিল সেন্টস। পৃ. ৮৯, ১২৭
৪. ঐ। পৃ. ৫৪

নবম অধ্যায়

১. উত্তরমেরুর লিপি, আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া রিপোর্ট—(১৯০৪-৫)। পৃ. ১৩৮
২. কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী—দি চোলস। পৃ. ৫৭৭
৩. মার্কো পোলো, ট্রাভেলস। পৃ. ২৩৭ (পেলিক্যান সংস্করণ)
৪. বাসবরাজ। অনুবাদ : সোর্সেস অফ ইণ্ডিয়ান ট্রাডিশন (থ. দ্য ব্যারি)। পৃ. ৩৫৭

দশম অধ্যায়

১. আল কাজউইন। অনুবাদ : এলিয়ট ও ডাউসন, দি হিস্‌ট্রি অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্‌টোরিয়ান্‌স, ১ম খণ্ড। পৃ. ৯৭
২. আলবেরুনি, তাহকিক-ই-হিন্দ। অনুবাদ : সাচাউ, আলবেরুনি।

দ্বাদশ অধ্যায়

১. এলিয়ট ও ডাউসন, দি হিস্‌ট্রি অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস্‌ ওন হিস্‌টোরিয়ান্‌স, ১ম খণ্ড। পৃ. ৩৩২
২. ঐ। পৃ. ১৮৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১. কালচারাল হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড। পৃ. ২৪৯
২. আর. টেগোর (অনুবাদ)—সঙ্গ্‌স অফ কবীর। পৃ. ৮৫, ১১২
৩. এম. এ. মেকলিফ—দি শিখ রিলিজিয়ন, ১ম খণ্ড। পৃ. ১৯৫-৯৬

চতুর্দশ অধ্যায়।

১. ফার্নাও নুনিজ। অনুবাদ: সীওয়েল, এ ফরগটন এম্‌পায়ার। পৃ. ৩৭৩-৭৪
২. ঐ
৩. অমুক্তমাল্যদ, ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৪৫-৫৮

সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী

১. ভি. স্মিথ—অক্সফোর্ড হিসট্রি অফ ইণ্ডিয়া। অক্সফোর্ড, ১৯৫৮

২. এ. এল. ব্যাশাম—দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া। লণ্ডন, ১৯৫৪

৩. ডি. ডি. কোশাম্বী—দি কালচার অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন অফ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া ইন হিস্‌টোরিক্যাল আউটলাইন। লণ্ডন, ১৯৬৫

৪. থ. দ. ব্যারি সম্পাদিত—সোর্সেস অফ ইণ্ডিয়ান ট্রাডিশন। নিউইয়র্ক, ১৯৫৮

৫. এ. বি. এম. হাবিবুল্লা—ফাউণ্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া। লাহোর, ১৯৪৫

৬. পি. ভি. কানে—হিস্‌ট্রি অফ দি ধর্মশাস্ত্র। পুণা, ১৯৩০-৪৬

৭. কে. এম. আশরফ—লাইফ অ্যাণ্ড কণ্ডিশন অফ দি পিপ্‌ল অফ হিন্দুস্তান। দিল্লী।

৮. জে. এন. ফারকুহার—আউটলাইন অফ দি রিলিজিয়াস লিটারেচার অফ ইণ্ডিয়া। অক্সফোর্ড, ১৯২০

৯. তারাচাঁদ—ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইণ্ডিয়ান কালচার ১৯৫৪

১০. জে. ই. চারপেনটিয়ার—থেইস্‌ম্‌ ইন মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া। ১৯১৯

১১. এ. বোস—সোসাল অ্যাণ্ড রুরাল ইকনমি অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া। কলকাতা, ১৯৬১

১২. ইউ. এন ঘোষাল—দি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্‌টেম ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া। কলকাতা, ১৯৩০

১৩. টি. মোরল্যাণ্ড—অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্‌টেম অফ মুসলিম ইণ্ডিয়া। কেমব্রিজ, ১৯২৯

১৪. কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী—এ হিস্‌ট্রি অফ সাউথ ইণ্ডিয়া। লণ্ডন, ১৯৫৮

১৫. এ. কানিংহাম—দি এনসিয়েন্ট জিওগ্রাফী অফ ইণ্ডিয়া। কলকাতা, ১৯২৪

১৬. টি. ফিলিওজা—লা ডকট্রিন ক্লাসিক দ্য লা মেডিসিন ইণ্ডিয়নে। প্যারিস, ১৯৪৯

১৭. এ. কানিংহাম—এ বুক অফ ইণ্ডিয়ান এরাস। কলকাতা, ১৮৮৩

১৮. এ কে. কুমারস্বামী—হিস্‌ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট। লণ্ডন, ১৯২৭

১৯. বি. রোল্যাণ্ড—দি আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিটেকচার অফ ইণ্ডিয়া। লণ্ডন, ১৯৫৩

২০. জি. টি গ্যারাট সম্পাদিত—দি লিগ্যাসি অফ ইণ্ডিয়া। অক্সফোর্ড, ১৯৩৭

২১. কে. এম. পানিক্কার—জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরস ইন ইণ্ডিয়ান হিস্‌ট্রি। বোম্বাই, ১৯৫৯